বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আদর্শ হিন্দু-হোটেল

আদর্শ হিন্দু হোটেল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিমশিম খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের ভিড়।

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বাক্সের ওপর কনুয়ের ভয় দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে–এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী ভাত–হিন্দু-হোটেল বাবু–

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের লোকের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

–এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে এখানে–কোন ক্লাসে খাবেন? ফাস্ট ক্লাস না সেকেন্ ক্লাস–ফাস্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন ক্লাসে তিন আনা–

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট (এক টুকরা সাদা কাগজে-নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের টিকিট লইয়া তাহাকে নিদিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাস্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন, ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু চক্কত্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে– সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্বৃত্ত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে বামুনেরা চুরি করতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল–মোটে চার জন লোক খদ্দের। দু'জন ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল–যাক্ গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা–শান্তিপুর আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকেই। আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেকচিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল–পয়সা দেও বাবু, দই নে

আসি।

বেচু বলিল–দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল–একজন ফাস্টো কেলাসে খাবে। আমায় বলে পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই–

বেচু বলিল–কে বল তো? খদ্দের?

–খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এমনি না। আমার ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

–না–না–তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু-এক দিনের জন্যে আসবে–তার কাছ থেকে পয়সা কিসের? দইয়ের পয়সা নিয়ে যা–

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে স্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল–খদ্দের বেশী করে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবেনা মনে রেখো–আমার খরচা না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ–তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম ঝি বলিল–তোমায় পই-পই করে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনা বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস-টেলাস তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয় ফাস্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট কমিয়েছে–শুনে–

বেচু বলিল–চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল না। কারও কানে কথা গেলে এখুনি —

এমন সময় দু'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল–আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন কেলাসে খাবেন বাবুরা? পাঁচ আনা আর তিন আনা–

একজন বলিল–তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে আর ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

–না বাবু, মাংস তো রান্না নেই–তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল–আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিদ্বেশ্বরীর ইচ্ছেয়–তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে–তা হলে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই–কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল–পোড়ারমুখো মিনসে আবার শুনতে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে–কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল–টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই–আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল–

পদ্ম বলিল–কেন আসাম মেল–

–আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা দশটা খদ্দের ফি দিন পাওয়া যেত–কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা–

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল–শোনো মজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খদ্দের বাবু গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেমন রাঁধো বলে–যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো–

–ডাল কতটা আছে দেখলি?

–লবডঙ্কা। আর মেরেকেটে তিন জনের মত হবে—

–ক’জনের মত ডাল দিইছিলি?

–দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের জন্যে দিইছি- সেকেন কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল–

–হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছে’চল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো। দেখিলে মন হয় লোকটা নিপাট ভালমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল–হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হ’ল কি করে?

হাজারি ঠাকুর বলিল–তা কি করে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হলে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল–তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ–

হাজারি বলিল–বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্মদিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়–আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল–তুমি মুখে-মুখে তককো ক'রো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয় করে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জি কিনে দেয় নি?

–ইস-ভারী গেঞ্জি একটা কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি–

বেচু চক্কত্তি বলিল–যাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

–কেন বাবু আমার কি দোষ হ'ল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন–

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল–আট জনের ডাল মেপে দিইছি–নচ্ছার, বদমাইশ, গাঁজাখোর কোথাকার–দশ

জনের দশের অর্ধেক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের করে?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না–কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেকচিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্ম ঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে–সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ও ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়–রসুয়ে-বামুনদের জন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায় না–তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত,

কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না–ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেকচিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে–অত ভাত খাবে কে? ও তো তিন জনের খোরাক–আমার থালায় আর দুটো বেশী করে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে–আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইশ মাগী-পেট ভরে যে কেউ খায়-তাও তার সহ্যি হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুন একথালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে? বাব্বা, যেমন কর্তা, তেমনি গিন্নি (পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নি বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল–মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)।

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেকচি চাপাইতে হইবে।

.

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমোয়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারের ঠাকুর বাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জনে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তার পর কর্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শুইবার অবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাবতেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন। বলিলেন–কি চাই?

হাজারি বলিল–আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে?

–তোমার নাম কি?

–আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী।

এই ভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

–বাড়ী কোথায়?

–গাংনাপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয় এঁড়োশোলা গ্রামে।

–রাঁধতে জানো?

বাবু একদিন রাঁধিয়ে দেখুন! মাংস মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

–আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাঁধতে হবে–তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজি থাকো আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দের বাবুর সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভালো কথা তো দূরের কথা, পদ্ম ঝি তাহাকে আঁশবঁটি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায়? যাক, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনদিন–তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে–

হাজারি চক্রবর্ত্তীর হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

কর্তার মত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাঁধুনী-বামুন ও ঝি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এ হোটেলের মত ঝিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খদ্দেরদের ভাল জিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে বুঝিয়া দেখিল, লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট দিতেও

আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেসারি ডাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তা মাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্য কিনিবে না।

এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই–যাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়–কিন্তু তাহার মনে হয় বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে সে হোটেলে লোক বেশী আসিবে–অনেকেই খাওয়ার পরে একটু গড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটেলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খদ্দেরদের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকিবে, বালিশ থাকিবে, তামাক খাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেও অনায়াসে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটের কোনো হোটেলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেও না। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইস্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল' বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খদ্দের আসে?

খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোক ঝুঁকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটেলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে

দেখিতে দেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটেলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘর খুলিয়া বসিবে যদি তাহাতে খদ্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারই সুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাথায় আছে, শুধু খদ্দেরের বিশ্রাম ঘর কেন, মোকদ্দমা মামলা যাহারা করিতে আসে, তাহারা সারাদিনের খাটুনির পরে হয়তো খাইয়া-দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়– সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক।

চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহার মনে আসে। কিন্তু কখনো কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বয়স তো হইয়া গেল ছ'চল্লিশের উপর–সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই, সাত টাকা মাহিনার চাকুরি আজও ঘুচিল না–ছাঁ-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা, এই চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া? ভাবিতে বেশ লাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত্র সে নয়। ছেচল্লিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচিবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া

মরিয়া গেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিবে না। পদ্ম ঝি এতক্ষণ উনুনে আঁচ দিয়াছে, দেরি করিয়া গেলে তাহার মুখনাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়–অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিনকালে।

ফিরিবার পথে ছোট বাজারে রাধাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়।

–বাবা রাধাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। পদ্ম ঝির ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ওই কর্তাবাবুর হোটেলের পাশে পদ্ম ঝিকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পদ্ম ঝি উনুনে আঁচ দিয়া কোথায় গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

–শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিষ্টি করবেন, তাঁরা আমায় আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা

করবে। ওঁরা মুর্শিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসে নি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্কত্তি একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনো ইহারা তাহার রান্না ভাল বলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে।

রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এঁড়োশোলা গ্রামে একজন সেকালের প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় তার শুধু সাধারণ ধরণের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামেরও বাহিরেও অনেক জায়গায় লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল–খুড়ীমা, আপনার তো বয়েস হয়েছে, কবে চলে যাবেন–আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন–আচ্ছা তোকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি করে নিরিমিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই

একটি জিনিস রাঁধিবার গুণেই হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস–নিৰিমিষ চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এ-কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে-মাংস, মাছ সবই রাঁধে ভাল–কিন্তু তার হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চক্কত্তির হোটেলে একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে–সে আর কোথাও যাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধিবার ভার তাহারই উপর পড়িল! খদ্দেররা মাংস খাইয়া খুব তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই–খদ্দেরের মুখের প্রশংসা ছাড়া। পদ্ম ঝি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাও বলিল না। বেচু চক্কত্তিও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্য তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, কর্তাবাবু নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পদ্ম ঝি চাটিয়া-পুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মুশকিল ঘটে। তাহার জন্য বিশেষ কিছুই থাকে না, এক একদিন ভাত পর্যন্ত কম পড়িয়া যায়–মাছ, মাংস তো দূরের কথা। বয়স ছেচল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে ভাল, খাইতে ভালও বাসে–কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট তরে না।

রাত সাড়ে বারোটা। কর্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেলে সে আর মতি চাকর ছাড়া আর কেহ রাত্রে থাকে না। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে–রাত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল–চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্চে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর?

–এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি! সারাদিন খেটে আবার ও-সব শখ থাকে? আমি যাব না–তুই যাস তো যা। এসে ভাঁড়ার ঘরের জানালায় টোকা মারিস। দোর খুলে দেবো।

মতি চাকর ছোকরা মানুষ। তাহার শখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয্যেকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের সঙ্গে তাহাদের রেষারেষি করিয়া কারবার চলে। তিনি এত রাতে এখানে কি মনে করিয়া? কখনো তো আসেন না! হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুয্যেও একটা

হোটেলের কর্তা, সুতরাং হাজারির কাছে সেও তার মনিবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল, আর কে আছে ঘরে?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণে মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল–বিনীত ভাবে বলিল–কেউ নেই বাবু, আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল–চল ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে বসিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বেচু চক্কত্তির গদিতে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল–তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

–আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

–কাপড় চোপড় দেয়?

–আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুয্যে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন–শোন, আমার হোটেলে তুমি কাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা

কাপড় পাবে। ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক। যাবে?

হাজারি দস্তুরমত অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না। তার পর বলিল–বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

–ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজি। তবে হ্যাঁ, বেচু চক্কত্তির সঙ্গে আমি অসরস করতে চাইনে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম ঝি কোথাও আড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল–এখন আমি কোন কথা বলতে পারব না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যা নয়, তবে খায় খুব সঙ্গোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না। সংসারে কেহ এ পর্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল রাঁধে বলিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরস্কার দিতে চায় নাই–খদ্দেরর মুখের ফাঁকা কথায় পেট ভরে না তো!

যদুবাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার চাকরি (মায় খোরাকী ধোপা নাপিত) দিতে।

এতদিন রাণাঘাটের বাজারে আছে–কখনও কাহারও সঙ্গে মেশে না সে–মিশিতে ভালও বাসে না। তাহার জীবনের আশা যে-টা, সে-টা দশজনের সঙ্গে মিশিয়া আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে পূর্ণ হবে না। তাহাকে খাঁটিতে হইবে, বাজার বুঝিতে হইবে, হিসাব রাখা শিখিতে হইবে, একটা ভাল হোটেল চালাইবার যাহা কিছু সুলুক সন্ধান সব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, দেশের কাছে বড় মুখ দেখাইতে হইলে, পরের মুখে নিজের নাম শুনিতে হইলে– সেজন্য চেষ্টা চাই, খাটুনি চাই। আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে কিংবা মতি চাকরের মত ছোট বাজারের বারোয়ারীর যাত্রা শুনিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

রাত অনেক। মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঘুম আসার নামটি নাই।

দরজায় খটখট শব্দ হইল। হাজারি উঠিয়া দরজা খুলিল–সে আগেই বুঝিয়াছিল মতি চাকর ফিরিয়াছে। মতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল–এখনো ঘুমোওনি ঠাকুর? এখনো জেগে যে!

হাজারি গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখিয়া তবে মতিকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বলিল–যে গরম, ঘুম আসবে কি, সারাদিন আগুনের তাতে–যাত্রা দেখলি নে?

মতি বলিল–যাত্রার আসরে জায়গা নেই। লোক ভর্তি। ফিরে এলাম। চল এক জায়গায়, যাবে ঠাকুরমশায়?

–কোথায়?

–পাড়ার মধ্যে। চলো না–ঘুম যখন নেই, একটু ঘুরেই না হয় এলে। তোমার তো কোনদিন কোথাও–

হাজারি বলিল–তোরা ছেলে-ছোকরা, আমার বয়স ছেচল্লিশ। আমি তোর বাপের বয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব কথা কেন?...তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস করগে যা।

–বাবুর কাছে কি পদ্মদিদির কাছে কিছু বলো না ঠাকুরমশাই, দোহাই, দুটি পায়ে পড়ি।

আশ্চর্য এই যে, মতির এই কথা হাজারির মনে এক নতুন ধরনের ভাবনা আনিয়া দিল। তাহার উচ্চাশা আছে, মতির মত রাত বেড়াইয়া স্ফূর্তি করিয়া সময় নষ্ট করিলে ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না। মতি কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না, বাসনের ঘরে (হোটেলের পিতল কাঁসার থালা-বাটি রান্নাঘরের পাশে সিন্দুকে থাকে, মাজাঘষার পর রোজ রাত্রে বেচু চক্কত্তি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেগুলি গুনিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া চাবি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান) গিয়া শুইয়া পড়িল। হাজারিও বাসনের ঘরে শোয়, আজ সে বাহিরের গদির মেজেতে তাহার

পুরোনো মাদুরখান পাতিয়া শুইল।

না–যদুবাবুর হোটেলে সে যাইবে না। হোটেলের রাঁধুনিগিরি সব জায়গায় সমান। এ হোটেলে আছে পদ্ম, ও হোটেলে হয়তো আবার কে আছে কে জানে? তা ছাড়া, বেচু বাবু তাহার পাঁচ বছরের অন্নদাতা। লোভে পড়িয়া এতদিনের অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

সে নিজে হোটেলে খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাঁধুনি-বিত্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেন, তখন অন্য কথা।

পরদিন খুব সকালে পদ্ম ঝি আসিয়া ডাকিল–ও ঠাকুর, দোর খোল–এখনও ঘুম–বাবাঃ! কুম্ভকর্ণকে হার মানালে তোমরা!

হাজারি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ছেঁড়া মাদুরখানা গুটাইয়া রাখিয়া দোর খুলিয়া দিল। একটু পরেই বেচু চক্কত্তি আসিলেন। দরজায়, গদিতে ও ক্যাশ-বাক্সে গঙ্গা জলের ছিটা দিয়া, ক্যাশ-বাক্সের ডালার উপরটা সামান্য একটু গঙ্গাজল দিয়া মার্জনা করিয়া লইয়া পদ্ম ঝিকে বলিলেন–ধুনো দে–বেলা হয়ে গেল। আজ হাটবার, ব্যাপারীদের ভিড় আছে, শীগগির করে আঁচ দে–আর সেদিনকার মত পচা দই-টই আনিস নে বাপু। ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়–শেষকালে স্যানিটারি বাবুর চোখে পড়ে যাবে। দরকার কি?

ব্যাপারীরা সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের চাষা লোক। তাহারা দই খাইতে পছন্দ করে বলিয়া প্রতি হাটবারে তাহাদের জন্য কয়েক হাঁড়ি দইয়ের বরাদ্দ আছে। এই দই পদ্ম ঝি তাহার নিজের ঘরে পাতিয়া হোটেলে বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা লাভ করিয়া থাকে। এবং সে যে প্রথম শ্রেণীর জিনিস সরবরাহ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ্ম ঝি মুখ ঘুরাইয়া বলিল–বাবু আপনার যত সব অনাছিষ্টি কথা! দই পচা না ঘন্ট, কে বলচে দই পচা! ওই মুখপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাদ্দর চাল যদি আজ–

হাজারি ঠাকুর কথাটা বলিয়াছিল বটে তবে সে দই পচা কি তাজা তাহা বলে নাই বলিয়াছিল ব্যাপারী খদ্দেররা বলাবলি করিতেছিল এ রকম খারাপ দই খাইতে দিলে তাহারা চোদ্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সার বেশি খোরাকি দিবে না।

পদ্ম ঝি রান্নাঘরের চৌকাঠে পা দিয়া ঝাঁজালো ঝগড়ার সুরে বলিল–বলি, ও ঠাকুর দই পচা তোমাকে কে বলেছে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল–ওই সাধু মণ্ডল আর তার ভাইপো রোজ হাটেই তো এখানে খায়–ওরাই বলচিল–

–বলচিল! তোমার গলা ধরে বলতে গিয়েছে ওরা। তোমার মত হিংসুক কুচুটে লোক তো কখনো দেখিনি–আমি দই দিই বলে তুমি হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্চ

সে কি আমি বুঝিনে! তোমার শখের কুসুম গয়লানীর ছাপ-বাক্সে পয়সা না উঠলে কি আর তোমার মনে শান্তি আছে!...গাঁজাখোর মড়ুই-পোড়া বামুন কোথাকার!

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল–ছি ছি, কি যে বলো পদ্মদিদি তার ঠিক নেই-- কুসুমের বাপের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে, আমায় জ্যাঠা ব'লে ডাকে, আমি তাকে মেয়ে বলি–তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না?

ইহার উত্তরে পদ্ম ঝি যাহা বলিল, তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কুসুমকে সে সত্যই মেয়ের মত স্নেহ করে– তাহাদের গ্রামের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে–রাণাঘাটে তার শশুরবাড়ী–অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন দুধ বেচিয়া, দই বেচিয়া ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে মানুষ করে। এক শাশুড়ী ছাড়া বাড়ীতে কেহ নাই।

হঠাৎ একদিন পথে দু'জনের দেখা।

–জ্যাঠামশায় যে! দাঁড়ান একটু পায়ের ধূলো দিন। আপনি এখানে কোথায়?

–আরে কুসুম, কোত্থেকে তুই এখানে?

–এই তো আমার শশুরবাড়ী, ছোট বাজারে মন্দিরের গায়েই। আপনি কি আজ বাড়ী থেকে এসেছেন?

–না রে–আমি রেল-বাজারে হোটেলে কাজ করি। আজ মাস ছ'-সাত আছি।

বিদেশে একই গ্রামের মানুষ দেখিয়া দু'জনেই খুব খুশী হইল। সেই হইতে কুসুম হাজারি ঠাকুরের হোটেলে দুধ দই বেচিতে গিয়াছে। গরীব বলিয়া হাজারি ঠাকুর অনেকবার লুকাইয়া হোটেল হইতে রাঁধা ভাত-তরকারি তাহাকে থালা করিয়া বাড়িয়া দিয়াছে। দুধ দই বেচিয়া ফিরিবার সময় কুণ্ডুদের পাটের আড়তের গলিটায় দাঁড়াইয়া কুসুম থালা লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা পদ্ম ঝির চোখ এড়ায় নাই, সুতরাং সে বলিতেই পারে।

.

দুপুরের পর হাজারি প্রতিদিনের মত চূর্ণীর ধারে যাইতেছে–এমন সময় কুসুমের সঙ্গে দেখা হইল।

কুসুম দুধের ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, বেশ স্বাস্থ্য, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী বেশ শান্ত।

হাজারি বলিল–বাড়ী ফিরছিস এত বেলায় যে!

কুসুম বলিল–জ্যাঠামশায়, বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিজের তো দুধ নেই–কায়েত পাড়া থেকে দুধ আনি, তবে বিক্রী করি, তবে বাড়ী ফিরি। আসুন না আমাদের

বাড়ী।

–না, এখন আর কোথায় যাবো! তুই যা, খাবি-দাবি।

কুসুম কিছুতেই ছাড়ে না, বলিল–আমার খাওয়া-দাওয়া জ্যাঠামশায়, শাশুড়ী রেঁধে রেখে দিয়েচে গিয়ে খাবো; কতক্ষণ লাগবে? আসুন না।

হাজারি অগত্যা গেল। ছ'চাল একখানা বড় ঘর, সেখানেতে কুসুমের শাশুড়ী থাকে আর একখানা ছোট চারচালা ঘরে কুসুম ছেলে দুটি লইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত কুসুমের খুব সদ্ভাব নাই।

কুসুম নিজের ঘরে হাজারিকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোশ, পুরু কাঁথা পাতিয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তাহার উপরে। তক্তপোশের নীচে বালি দেওয়া আর-বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি ও একটা বড় জালা–বাঁশের আলনাতে কতকগুলি লেপ-কাঁথা বাঁধা। একটা জলচৌকিতে থানকতক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে পিতল কাঁসার বাসন। ঘর দেখিয়া হাজারির মনে হইল–কুসুম বেশ সাজাইয়া রাখিতে জানে জিনিসপত্র।

কুসুম বলিল–পান খাবেন জ্যাঠামশায়?

–দে একটা। আর তুই খেতে যা। বেলা অনেক হয়েচে।

কিন্তু কুসুমের দেখা গেল, খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো তাড়া নাই। হাজারিকে পান দিয়া সেই যে হাজারির সামনে মেজেতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল–প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। সে নড়িবার নামও করে না দেখিয়া হাজারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বলিল–তুই খেতে যা না। আমি যাই, আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে সকাল সকাল।

কুসুম বলিল–যাচ্ছি এবার।

বলিয়া আর যায় না। আরও আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কুসুম আর যায় নাই। বাবা মারা গিয়াছে, ভাইয়েরা গরীব বলিয়া হউক বা ভাইবৌদের জন্যই হউক–তাহাকে বাপের বাড়ীতে কেহ লইয়া যায় না। নিজে দু-একবার গিয়াছিল, বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ভাইবৌদের ব্যবহার ভাল নয়।

হাজারির সঙ্গে কুসুম সেই সব কাহিনীই বলিতে লাগিল। ছেলেবেলায় গ্রামে কি পথে করিয়াছিল কি, সেই বিষয়ে কথাও তাহার আর ফুরায় না।

–এখানে ছোলার শাক পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের গাঁয়ের যুগীপাড়ার মাঠে আমরা ছোলার শাক তুলতে যেতাম জ্যাঠামশায়–একবার, তখন আমার বয়েস ন'বছর, আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দুজনে গিয়েছি ছোলার

শাক তুলতে– একটা মিঙ্গে দেখি জ্যাঠামশায় ছোলার ক্ষেতে বসে কচি ছোলা তুলে তুলে খাচ্ছে। আমাদের দেখে দোড় দোড়, বিষম দোড়! আমরা তো হেসে বাচিনে–ভেবেছে বুঝি আমাদের ক্ষেত!

বলিয়া কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি!

হাজারি দেখিল, ইহার ছেলেমানুষী গল্প শুনিতে গেলে ওদিকে হোটেলে যাইতে বিলম্ব হইবে–পদ্ম ঝি মুখ-নাড়ার চোটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

সে উঠিতে যাইতেছে, কুসুম বলিল–দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, আপনার জন্যে একটা জিনিস করে রেখেছি। সেইটে দেবার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বলিয়া একটা কাপড়ের পুঁটুলি খুলিয়া একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল–কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

–বাঃ, বেশ হয়েছে রে!

কুসুম কাঁথাখানি পাট করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল–আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে,–আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দেব। তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু করে এখানা আজ দিন পাঁচ-ছয় হ’ল শেষ হয়েছে।

হাজারি ভারি খুশী হইল।

কুসুমের বাবা রসিক ঘোষ প্রায় তাহার সমবয়সী। কুসুম তাহার মেয়ের সমান। একই গায়ের লোক–তাহা হইলেও কি সবাই করে? গাঁয়ে তো কত লোক আছে! ·

মুখে বলিল, বেঁচে থাক মা, মেয়ে না হলে বাপের জন্যে এত আত্তি দেখায় কে? ভারী চমৎকার কাঁথা। আমি পেতে শুয়ে বাঁচবো এখন। ভারী চমৎকার কাঁথা। বেশ, বেশ!

কুসুম বলিল–জ্যাঠামশায়, আপনি তো বললেন মেয়ে না হলে কে করে–কিন্তু আমিও বলচি, বাবা না হলে হোটেল থেকে নিজের মুখের ভাতের থালা কে মেয়েকে দেয় লুকিয়ে– শ্রাবণ মাসের সেই উপব্রান্ত বাদলায়–

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে সে বাঁ-হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল–মাথার ওপর ভগবান জানেন– আর কেউ জানে না–আপনি আমার জন্যে যা করচেন। আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা–আমি ছোট জাতের মেয়ে–আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, তবে আমিও বলচি ওপরের দেনেওয়ালা আপনাকে ভাতের থালার বদলে মোহরের থালা যেন দেন। আমিও যেন দেখে মরি।

বলিয়াই সে আসিয়া হাজারির পায়ে গড় হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সেদিন ছিল বেশ বর্ষা।

হাজারি দেখিল, হোটেলে গদির ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। অন্যদিন এ ধরনের খদ্দের এ হোটেলে সাধারণতঃ আসে না–হাজারি ইহাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল।

বেচু চক্কত্তি ডাকিল–হাজারি ঠাকুর, এদিকে এস–হাজারি গদির ঘরে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে ভদ্রলোকদের একজন বলিলেন–এই ঠাকুরটির নাম হাজারি?

বেচু চক্কত্তি বলিল–হাঁ বাবু, এরই নাম হাজারি।

বাবুটি বলিলেন–এর কথাই শুনেচি। ঠাকুর তুমি আজ বর্ষার দিনে আমাদের মাংস পোলাও রেঁধে ভাল করে খাওয়াতে পারবে? তোমার আলাদা মজুরী যা হয় দেবো।

বেচু বলিল–ওকে আলাদা মজুরী দেবেন কেন বাবু, আপনাদের আশীর্বাদে আমার হোটেলের নাম অনেক দূর অবধি লোকে জানে। ও আমারই ঠাকুর, ওকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা যা হুকুম করবেন তা ও করবে।

এই সময় পদ্ম ঝি বেচু চক্কত্তির ডাকে ঘরে ঢুকিল।

বেচু চক্কত্তি কিছু বলিবার পূর্বে জনৈক বাবু বলিল–ঝি, আমাদের একটু চা ক'রে খাওয়াও তো এই বর্ষার দিনটাতে। না হয় কোনো দোকান থেকে একটু এনে

দাও। বুঝলেন চক্কত্তি মশায়। আপনার হোটেলের নাম অনেক দূর পর্যন্ত যে গিয়েছে বল্লেন–সে কথা মিথ্যা নয়। আমরা যখন আজ শিকারে বেরিয়েছি, তখন আমার পিসতুতো ভাই বলে দিয়েছিল, রাণাঘাট যাচ্চ, শিকার করে ফেরবার পথে রেল-বাজারের বেচু চক্কত্তির হোটেলের হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস খেয়ে এসো। তাই আজ সারাদিন জলায় আর বিলে পাখী মেয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভাবলাম, ফিরবার গাড়ী তো রাত দশটায়। তা এ বর্ষার দিনে গরম গরম মাংস একটু খেয়েই যাই। মজুরী কেন দেবো না চক্কত্তি মশায়? ও আমাদের রান্না করুক, আমরা ওকে খুশি করে দিয়ে যাবো। ওর জন্যেই তো এখানে আসা। কথা শুনিয়া হাজারি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরও সে খুশি হইল এই ভাবিয়া যে, চক্কত্তি মশায়ের কানে কথাগুলি গেল–তাহার চাকুরির উন্নতি হইতে পারে। মনিবের সুনজরে পড়িলে কি না সম্ভব? খুশির চোটে ইহা সে লক্ষ্যই করিল না যে, পদ্ম ঝি তাহার প্রশংসা শুনিয়া এদিকে হিংসায় নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবুরা হোটেলের উপর নির্ভর করিল না–তাহারা জিনিসপত্র নিজেরাই কিনিয়া আনিল। হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে একটুকু জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার মধ্যে মাংস কোনদিনই থাকে না–তবে বাধা খরিদ্দারগণের মনস্তুষ্টির জন্য মাসে একবার বা দুবার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে-সে রান্নার মধ্যে বিশেষ কৌশল দেখাইতে গেলে চলে না, বা হাজারির ইচ্ছাও করে না–যেমন ভাল শ্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না–তেমনি।

হাজারি ঠিক করিল, পদ্ম ঝি তাহাকে দুই চক্ষু পাড়িয়া যেমন দেখিতে পারে না–তেমনি আজ মাংস রাঁধিয়া সকলের বাহবা লইয়া পদ্ম ঝির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহাকে যত ছোট মনে করে ও, তত ছোট সে নয়। সেও মানুষ, সে অনেক বড় মানুষ।

ভাল যোগাড় না দিলে ভাল রান্না হয় না। পদ্ম ঝি যোগাড় দিবে না এ জানা কথা। হোটেলের অন্য উড়ে বামুনটিকে বলিতে পারা যায় না–কারণ সে-ই হোটেলের সাধারণ রান্না রাঁধিবে।

একবার ভাবিল–কুসুমকে আনবো?

পরক্ষণেই স্থির করিল, তার দরকার নাই। লোকে কে কি বলিবে, পদ্ম ঝি তো বঁটি পাতিয়া কুটিবে কুসুমকে। যাক, নিজেই যাহা হয় করিয়া লইবে এখন।

বেলা হইয়াছে। হাজারি বাজার হইতে কেনা তরি-তরকারী, মাংস নিজেই কুটিয়া বাছিয়া লইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। বর্ষাও যেন নামিয়াছে হিমালয় পাহাড় ভাঙিয়া। কাঠগুলা ভিজিয়া গিয়াছে–মাংস সে কয়লার জালে রাঁধিবে না। তাহার সে বিশেষ প্রণালীর মাংস রান্না কয়লার জ্বালে হইবে না।

সব রান্না শেষ হইতে বেলা দুইটা রাজিয়া গেল। তারপরে খরিদ্দার বাবুরা খাইতে বসিল। মাংস পরিবেশন করিবার অনেক পূর্বেই ওস্তাদ শিল্পীর গর্ব ও

আত্মপ্রত্যয়ের সহিত হাজারি বুঝিয়াছে, আজ যে ধরনের মাংস রান্না হইয়াছে–ইহাদের ভাল না লাগিয়া উপায় নাই। হইলও তাই।

বাবুরা বেচু চক্কত্তিকে ডাকাইলেন, হাজারি ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিলেন যে বেচু চক্কত্তিও যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল সে কথা নিয়া। চাকরকে ছোট করিয়া রাখিয়া মনিবের সুবিধা আছে, তাহাকে বড় করিলেই সে পাইয়া বসিবে।

যাইবার সময় একজন বাবু হাজারিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন–তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর।

–সাত টাকা আর খাওয়া-পরা।

–এই দুটো টাকা তোমাকে আমরা বকশিশ দিলাম–চমৎকার রান্না তোমার। যখন আবার এদিকে আসবো, তুমি আমাদের রেঁধে খাইও।

হাজারি আমি খুশি হইল। বকশিশ ইহারা হয়তো কিছু দিবেন সে আশা করিয়াছিল বটে, কি দু-টাকা দিবেন তা সে ভাবে নাই।

যাইবার সময় বেচু চক্কত্তির সামনে বাবুরা হাজারি রান্নার আর এক দফা প্রশংসা করিয়া গেলেন। আর একবার শীঘ্রই শিকারে আসিবেন এদিকে। তখন এখানে আসিয়া হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস না খাইলে তাহাদের চলিবেই না। বেশ

হোটেল করেছেন চক্কত্তি মশায়।

বেচু চক্কত্তি বিনীত ভাবে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল–আজ্ঞে বাবু মশায়েরা রাজসই লোক, সব দেখতে পাচ্ছেন, সব বুঝতে পাচ্ছেন। এই রাণাঘাট রেল-বাজারে হোটেল আছে অনেকগুলো, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন, সকলেই দয়া করে এই গরীবের কুঁড়েতেই পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছা হয়, আগে থেকে একখানা চিঠি দেবেন, সব মজুদ থাকবে আপনাদের জন্যে; বলবেন কলকাতায় ফিরে দু'চার জন আলাপী লোককে–যাতে এদিকে এলে তারাও এখানেই এসে ওঠেন। বাবু–তা আমার বামুনের মজুরীটা?... হেঁ-হেঁ–

–কত মজুরী দেবো?

–তা দিন বাবু একবেলার মজুরী আট আনা দিন।

বাবুরা আরও আট আনা পয়সা বেচুর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেচু হাজারী ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল–ঠাকুর আজ আর বেরিও না কোথাও। বেলা গিয়েচে। উনুনে আঁচ আর একটু পরেই দিতে হবে। পদ্ম কোথায়?

–পদ্মদিদি থালা বাসন বার করচে, ডেকে দেবো?

পদ্ম ঝি আজ যে মুখ ভার করিয়া আছে, হাজারি তাহা বুঝিয়াছিল। আর হোটেলে সকলের সামনে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে বাবুরা, আজ আর কি তাহার মনে সুখ আছে? পদ্ম ঝির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য তাহার ভাতের থালায় হাজারি বেশী করিয়া ভাত তরকারি এবং মাংস দিয়াছিল। পদ্ম ঝি কিছুমাত্র প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না, মুখ যেমন ভার তেমনিই রহিল।

ভাতের থালা উঠাইয়া লইয়া পদ্ম ঝি হঠাৎ প্রশ্ন করিল– রাঁধসা মাংস আর কতটা আছে ঠাকুর?

বলিয়াই ডেকচির দিকে চাহিল। এমন চমৎকার মাংস কুসুমের বাড়ী কিছু দিয়া আসিবে (সে ব্রাহ্মণের বিধবা নয়, মাছ-মাংস খাইতে তাহার আপত্তি নাই) ভাবিয়া ডেকচিতে দেড় পোয়া আন্দাজ মাংস হাজারি রাখিয়া দিয়াছিল–পদ্ম ঝি কি তাহা দেখিতে পাইল?

পদ্ম দেখিয়াছে বুঝিয়া হাজারি বলিল–সামান্য একটু আছে।

–কি হবে ওটুকু? আমায় দাও না-আমার আজ ভাগ্নীজামাই আসবে–তুমি ত মাংস খাও না–

কুসুমের জন্য রাখা মাংস পদ্ম ঝিকে দিতে হইবে–যার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না হাজারির! হাজারি মাংস খায় না তাহা নয়, হোটেলে মাংস রান্না হইলেই হাজারি নিজের ভাগের মাংস লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসে–নিজেকে বঞ্চিত করিয়া। পদ্ম

ঝি তাহা জানে, জানে বলিয়াই তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা উহার মনে জাগিয়াছে ইহাও হাজারি বুঝিল।

হাজারি বলিল–তোমায় তো দিলাম পদ্মদিদি, একটুখানি পড়ে আছে ডেকচির তলায় ওটুকু আর তুমি কি করবে?

–কি করবো বললুম, তা তোমার কানে গেল না? ভাগ্নীজামাই এসেছে শুনলে না? যা দিলে এতটুকুতে কি কুলুবে? ঢেলে দাও ওটুকু।

হাজারি বিপন্ন মুখে বলিল–আমি একটু রেখে দিইছি, আমার দরকার আছে।

পদ্ম ঝি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সুরে বলিল–কি দরকার? তুমি তো খাও না–কাকে দেবে শুনি?

হাজারি বলিল–দেবো–ও একজন একটু চেয়েছে–

–কে একজন?

–আছে–ও সে তুমি জানো না।

পদ্ম ঝি ভাতের থালা নামাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল–না, আমি জানিনে। তা কি আর জানি? আর সে জানা-জানি, আমার দরকার নেই। হোটেলের জিনিস তুমি কাউকে

দিতে পারবে না, তোমায় অনেকদিন বলে দিইছি। বেশ তুমি আমায় না দাও, চক্কত্তি মশায়ের শালাও আজ কলকাতা থেকে এসেছে–তার জন্যে মাংস বাটি করে আলাদা রেখে দাও–ওবেলা এসে খাবে এখন। আমি না পেতে পারি, সে হোটেলের মালিকের আপনার লোক, সে তো পেতে পারে?

বেচু চক্কত্তির এই শালাটিকে হাজারি অনেকবার দেখিয়াছে–মাসের মধ্যে দশ দিন আসিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী পড়িয়া থাকে, আর কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া টেরি কাটিয়া হোটেলে আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব চালায়–কথায় কথায় ঠাকুর-চাকরকে অপমান করে; চোখ রাঙায়, যেন হোটেলের মালিক নিজেই।

তাহাদের গ্রামের মেয়ে, দরিদ্রা কুসুম ভালটা মন্দটা খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পেটের ভাত জুটাইতে পারে না–তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া এত যত্নের মাংস শেষকালে সেই চালবাজ বার্ডসাই-খোর শালাকে দিয়া খাওয়াইতে হইবে–এ প্রস্তাব হাজারির মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু সে ভালমানুষ এবং কিছু ভীতু ধরনের লোক, যাহাদের হোটেল, তাহারা যদি খাইতে চায়, হাজারি তাহা না দিয়া পারে কি করিয়া–অগত্যা হাজারিকে পদ্ম ঝিয়ের সামনে বড় জামবাটিতে ডেকচির মাংসটুকু ঢালিয়া রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে রেকাবি চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হইল।

সামান্য একটু বেলা আছে, হাজারি সেটুকু সময়ের মধ্যেই একবার নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে গেল।

আজ তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে–দুইটি জিনিস আজ বুঝিয়াছে সে। প্রথম, ভাল রান্না সে ভুলিয়া যায় নাই, কলিকাতার বাবুরাও তাহার রান্না খাইয়া তারিফ করেন। দ্বিতীয়, পরের তাঁবে কাজ করিলে মানুষকে মায়া-দয়া বিসর্জন দিতে হয়।

আজ এমন চমৎকার রান্না মাংসটুকু সে কুসুমকে খাওয়াইতে পারিল না, খাওয়াইতে হইল তাহাদের দিয়া, যাহাদের সে দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কুসুম যেদিন কাঁথাখানি দিয়াছিল, সেদিন হইতে হাজারির কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ পড়িয়াছে কুসুমের ওপর।

বয়সে তো সে মেয়ের সমান বটেই, কাজও করিয়াছে মেয়ের মতই। আজ যদি হাজারির হাতে পয়সা থাকিত, তবে সে বাপের স্নেহ কি করিয়া দেখাইতে হয়, দেখাইয়া দিত। অন্য কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের হাতে অমন রান্না মাংসটুকুই সে কুসুমকে দিতে পারিল না।

ছেলেবেলাকার কথা হাজারির মনে হয়। তাহার মা গঙ্গাসাগর যাইবেন বলিয়া যোগাড়-যন্ত্র করিতেছেন–পাড়ার অনেক বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বিধবাদের সঙ্গে। হাজারি তখন আট বছরের ছেলে–সেও ভীষণ বায়না ধরিল গঙ্গাসাগর সে না গিয়া ছাড়িবেই না। তাহার ঝুঁকি লইতে কেহই রাজী নয়। সকলেই বলিল–তোমার ও ছেলেকে কে দেখাশুনো করবে বাপু, অত ছোট ছেলে আর সেখানে নানা ঝক্কি–তাহলে তোমার যাওয়া হয় না।

হাজারির মা ছেলেকে ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁর যাওয়াই হইল না। জীবনে আর কখনোই তাঁর সাগর দেখা হয় নাই, কিন্তু হাজারির মনে মায়ের এই স্বার্থত্যাগের ঘটনাটকু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া আছে।

হাজারি ভাবিল-যাক গে, যদি কখনো নিজে হোটেল খুলতে পারি, তবে এই রাণাঘাটের বাজারে বসেই পদ্ম ঝিকে দেখাবো–তুই কোথায় আর আমি কোথায়! হাতে পয়সা থাকলে কালই না হোটেল খুলে দিতাম! কুসুমকে রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবো আমার নিজের হোটেল হলে।

কতকগুলি বিষয় সে যে খুব ভাল শিখিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারে। বাজার-করা হোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারী কাজ এবং শক্ত কাজ। ভাল বাজার করার উপরে হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এবং ভাল বাজার করার মানেই হইতেছে সস্তায় ভাল জিনিস কেনা। ভাল জিনিসের বদলে সস্তা জিনিস–অথচ দেখিলে তাহাকে মোটেই খেলো বলিয়া মনে হইবে না–এমন দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা। যেমন বাটা মাছ যেদিন বাজারে আক্রা–সেদিন ছ'আনা সের রেল-চালানী রাস মাছের পোনা কিনিয়া তাহাকে বাটা বলিয়া চালাইতে হইবে–হঠাৎ ধরা বড় কঠিন, কোনটা বাটার পোনা, কোনটা রাসের পোনা।

.

পরদিন হাজারি চূর্ণীর ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মন কাল

হইতে ভাল নয়। পদ্ম ঝির নিকট ভাল ব্যবহার কখনও সে পায় নাই, পাইবার প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তবুও কাল সামান্য একটু রাধা মাংস লইয়া পদ্ম ঝি যে কাণ্ডটি করিল, তাহাতে সে মনোকষ্ট পাইয়াছে খুব বেশী। পরের চাকরি করিতে গেলে এমন হয়। কুসুমকে একটুখানি মাংস না দিতে পারিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছে বেশী–অমন ভাল রান্না সে অনেক দিন করে নাই–অত আশার জিনিসটা কুসুমকে দিতে পারিলে তাহার মনটা খুশি হইত।

ভাল কাজ করিলেও চাকুরির উন্নতি তো দূরের কথা, ইহারা সুখ্যাতি পর্যন্ত করিতে জানে না। বরঞ্চ পদে পদে হেনস্থা করে। এক একবার ইচ্ছা হয় যদুবাবুর হোটেলে কাজ লইতে। কিন্তু সেখানেও যে এরকম হইবে না তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। সেখানেও পদ্ম ঝি জুটিতে বিলম্ব হইবে না। কি করা যায়।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বেশীক্ষণ বসা যায় না। বহু পাপ না করিলে আর কেহ হোটেলের রাঁধুনীগিরি করিতে আসে না। এখনি গিয়া ডেকচি না চড়াইলে পদ্ম ঝি এক ঝুড়ি কথা শুনাইয়া দিবে, এতক্ষণ উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ...কিন্তু ফিরিবার পথে সে কি মনে করিয়া কুসুমের বাড়ী গেল!

কুসুম আসন পাতিয়া দিয়া বলিল–বাবাঠাকুর আসুন, বড় সৌভাগ্য অসময়ে আপনার পায়ের ধূলো পড়লো।

হাজারি বলিল–দ্যাখ, কুসুম, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

কুসুম সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল–কি বাবাঠাকুর?

–আমার বয়েস ছেচল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না, কি বলিস কুসুম? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে, তুই কি বলিস?

হাজারির কথাবার্তার গতি কোনদিকে বুঝিতে না পারিয়া কুসুম কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতুকের সুরে বলিল–তা–বাবাঠাকুর, তা তো বটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি–কেন বাবাঠাকুর?

কুসুমের মনে একটা কথা উঁকি মারিতে লাগিল–বাবাঠাকুর আবার বিয়ে-টিয়ে করবার কথা ভাবচেন নাকি?

হাজারি বলিল–আমার বড় ইচ্ছে আছে কুসুম, একটা হোটেল করব নিজের নামে। পয়সা যদি হাতে কোনদিন জমাতে পারি, এ আমি নিশ্চয়ই করবো, তুই জানিস! পরের ঝাঁটা খেয়ে কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। আমি আজ দশ বছর হোটেলে কাজ করছি, বাজার কি করে করতে হয় ভাল করে শিখে ফেলেছি। চক্কত্তি মশায়ের চেয়েও আমি ভাল বাজার করতে পারি। মাখমপুরের হাট থেকে ফি হাটরা যদি তরিতরকারী কিনে আনি তবে রাণাঘাটের বাজারের চেয়ে টাকায় চার আনা ছ'আনা সস্তা পড়ে। এ ধরো কম লাভ নয় একটা হোটেলের ব্যাপারে। বাজার করবার মধ্যেই হোটেলের কাজের আদ্ধেক লাভ। আমার খুব মনে জোর আছে কুসুম, টাকা পয়সা হাতে যদি কখনো পড়ে, তবে হোটেল যা চালাবো, বাজারের সেরা হোটেলে হবে, তুই দেখে নিস।

কুসুম হাজারি ঠাকুরের এ দীর্ঘ বক্তৃতা অবাক হইয়া শুনিতেছিল–সে হাজারিকে বাবার মত দেখে বলিয়াই মেয়ের মত বাবার প্রতি সর্বপ্রকার কাল্পনিক গুণ ও জ্ঞানের আরোপ করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ব্যাপারে সে বিশেষ কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাবাঠাকুর যে বুদ্ধিমান, তাহা সে হাজারির বক্তৃতা হইতে ধারণা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে বলিল–আমার এক জোড়া রুলি ছিল, এক গাছা বিক্রী ক'রে দিয়েছি আমার ছোট ছেলের অসুখের সময় আর বছর। আর এক গাছা আছে। বিক্রী করলে যাট-সত্তর টাকা হবে। আপনি নেবেন বাবাঠাকুর? ওই টাকা নিয়ে হোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি হাসিয়া বলিল–দূর পাগলী! ষাট টাকায় হোটেল হবে কি রে?

–কত টাকা হলে হয়?

–অন্ততঃ দুশো টাকার কম তো নয়। তাতেও হবে না।

–আচ্ছা, হিসেব করে দেখুন না বাবাঠাকুর।

–হিসেব করে দেখব কি, হিসেব আমার মুখে মুখে। ধরো গিয়ে দুটো বড় ডেকচি, ছোট ডেকচি তিনটে। থালা-বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চামচে, চায়ের

বাসন। বাইরে গদির ঘরের একখানা তক্তপোশ, বিছানা, তাকিয়া। বাক্স, খেরো বাঁধানো খাতা দুখানা। বালতি, লণ্ঠন, চাকি, বেলুন–এই সব নানান নটখটি জিনিস কিনতেই তো দুশো টাকার ওপর বেরিয়ে যাবে। পাঁচদিনের বাজার খরচ হাতে করে নিয়ে নামতে হবে। চাকর ঠাকুরের দু'মাসের মাইনে হাতে রেখে দিতে হয়–যদি প্রথম দু'মাস না হলো কিছু, ঠাকুর চাকরের মাইনে আসবে কোথা থেকে? সে-সব যাক-গে, তা ছাড়া তোর টাকা নেবোই বা কেন?

কুসুম রিদ্ধ স্বরে বলিল–আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন–ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্যি বাবাঠাকুর। সে ভাগ্যি থাকলে তো হবে, আমার অত টাকা যখন নেই, তখন আর সে কথা বলচি কি করে বলুন। যা আছে, ওতে যদি কখনো-সখনো কোন দরকার পড়ে আপনার মেয়েকে জানাবেন।

হাজারি উঠিল। আর এখানে বসিয়া দেরি করিলে চলিবে না। বলিল–না রে কুসুম, এতে আর কি হবে। আমি যাই এখন।

কুসুম বলিল– একটু কিছু মুখে না দিলে মেয়ের বাড়ী থেকে কি করে উঠবেন বাবাঠাকুর, বসুন আর একটু। আমি আসছি।

কুসুম এত দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যে হাজারি ঠাকুর প্রতিবাদ করিবার অবসর পর্যন্ত পাইল না। একটু পরে কুসুম ঘরের মধ্যে একখানা আসন আনিয়া পাতিল এবং মেজের উপর জলের হাত বুলাইয়া লইয়া আবার বাহিরে

গেল। কিছুক্ষণ পরে একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবিতে পেঁপে কাটা, আমের টিকলি ও দুটি সন্দেশ তানিয়া আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া বলিল–একটু জল খান, বসুন এসে, আমি খাবার জল আনি। হাজারি আসনের উপর বসিল। কুসুম ঝকঝকে করিয়া মাজা একটা কাঁচের গেলাসে জল আনিয়া রেকাবির পাশে রাখিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাইতে খাইতে হাজারির মনে পড়িল সেদিনকার সেই মাংসের কথা। মেয়ের মত স্নেহ-যত্ন করে কুসুম, তাহারই জন্য তুলিয়া রাখা মাংস কিনা খাওয়াইতে হইল চক্কত্তি মহাশয়ের গাঁজাখোর শালাকে দিয়া শুধু ওই পদ্ম ঝিয়ের জন্যে। দাসত্বের এই তো সুখ!

হাজারি বলিল–তুই আমার মেয়ের মতন কুসুম-মা।

কুসুম হাসিয়া বলিল–মেয়ের মতন কেন বাবাঠাকুর, মেয়েই তো।

–ঠিক, মেয়েই তো। মেয়ে না হোলে বাপের এত যত্ন কে করে?

–যত্ন আর কি করেছি, সে ভাগ্যি ভগবান কি আমায় দিয়েছেন। একে কি যত্ন করা বলে? কাঁথাখানা পেতে শুচ্চেন বাবাঠাকুর?

–তা শুচ্চি বই কি রে। রোজ তোর কথা মনে হয় শোবার সময়। মনে ভাবি কুসুম এখানা দিয়েছে। ছেঁড়া মাদুরের কাটি ফুটে ফুটেঁপিঠে দাগ হয়ে গিয়েছিল। পেতে

শুয়ে বেঁচেছি।

–আহা, কি যে বলেন! না, সন্দেশ দুটোই খেয়ে ফেলুন, পায়ে পড়ি। ও ফেলতে পারবেন না।

–কুসুম, তোর জন্যে না রেখে খেতে পারি কিছু মা? ওটা তোর কাছে রেখে দিলাম।

কুসুম লজায় চুপ করিয়া বহিল। হাজারি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলে বলিল–পান আনি, দাঁড়ান।

তাহার পর সামনে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া বলিল–আমার ও রুলি গাছা রইল তোলা আপনার জন্যে, বাবাঠাকুর। যখন দরকার হয়, মেয়ের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু।

সেদিন হোটেলে ফিরিয়া হাজারি দেখিল, প্রায় পনেরো সের কি আধ মণ ময়দা চাকর আর পদ্ম ঝি মিলিয়া মাখিতেছে।

ব্যাপার কি! এত লুচির ময়দা কে খাইবে?

পদ্ম ঝি কথার সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝাঁজ মিশাইয়া বলিল–হাজারি ঠাকুর, তোমার যা যা রাঁধবার আগে সেরে নাও–তারপর এই লুচিগুলো ভেযে ফেলতে হবে।

আচার্য-পাড়ায় মহাদেব ঘোষালের বাড়ীতে খাবার যাবে, তারা অর্ডার দিয়ে গেছে সাড়ে ন'টার মধ্যে চাই, বুঝলে।

হাজারি ঠাকুর অবাক হইয়া বলিল–সাড়ে ন'টার মধ্যে ওই আধ মণ ময়দা ভেজে পাঠিয়ে দেবো, আবার হোটেলের রান্না রাঁধবো! কি যে বল পদ্মদিদি, তা কি করে হবে? রতন ঠাকুকে বল না লুচি ভেঙে দিক, আমি হোটেলের রান্না বাঁধবো।

পদ্ম ঝি চোখ রাঙাইয়া ছাড়া কথা বলে না। সে গরম হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল– তোমার ইচ্ছে বা খুশিতে এখানকার কাজ চলবে না। কর্তা মশায়ের হুকুম। আমায় যা বলে গেছেন তোমায় বললাম, তিনি বড় বাজারে বেরিয়ে গেলেন– আসতে রাত হবে। এখন তোমার মর্জি–করো আর না করো।

অর্থাৎ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের এই অবিচারে হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। নিছক অবিচার ছাড়া ইহা অন্য কিছু নহে। রতন ঠাকুরকে দিয়া ইহারা সাধারণ রান্না অনায়াসেই করাইতে পারিত, কিন্তু পদ্ম ঝি তাহা হইলে খুশি হইবে না। সে যে কি বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে পদ্ম ঝিয়ের! উহাকে জব্দ করিবার কোনো ফাঁকই পদ্ম ছাড়ে না।

ভীষণ আগুনের তাতের মধ্যে বসিয়া রতন ঠাকুরের সঙ্গে দৈনিক রান্না কার্যেতেই প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। পদ্ম ঝি তাহার পর ভীষণ তাগাদা লাগাইল লুচি ভাজাতে হাত দিবার জন্য। পদ্ম নিজে খাটিতে রাজি নয়, সে গেল খরিদ্দারদের খাওয়ার তদারক করিতে। আজ আবার হাটবার, বহু ব্যাপারী খরিদ্দার। রতন ঠাকুর

তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। হাজারি এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইয়াই আবার আগুনের তাতে বসিয়া গেল লুচি ভাজিতে।

আধঘণ্টা পরে–তখন পাঁচ সের ময়দাও ভাজা হয় নাই–পদ্ম আসিয়া বলিল–ও ঠাকুর, লুচি হয়েছে? ওদের লোক এসেছে নিতে।

হাজারি বলিল–না এখনো হয়নি পদ্মদিদি। একটু ঘুরে আসতে বল।

–ঘুরে আসতে বললে চলবে কেন? সাড়ে ন'টার মধ্যে ওদের খাবার তৈরি করে রাখতে হবে বলে গেছে। তোমায় বলিনি সেকথা?

–বল্লে কি হবে পদ্মদিদি? মন্তরে ভাজা হবে আধ মণ ময়দা? ন'টার সময় তো উনুনে ব্রহ্মার নেচি ফেলেচি–জিগ্যেস করো মতিকে।

–সে সব আমি জানিনে। যদি ওরা অর্ডার ফেরত দেয়, বোঝাপড়া ক'রো কর্তার সঙ্গে, তোমার মাইনে থেকে আধ মন ময়দা আর দশ সের ঘি র দাম একমাসে তো উঠবে না, তিন মাসে ওঠাতে হবে।

হাজারি দেখিল, কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। সে নীরবে লুচি ভাজিয়া যাইতে লাগিল। হাজারি ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস করে নাই–কাজ করিতে বসিয়া শুধু ভাবে কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার নিয়ম–কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক। লুচি ঘিয়ে ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু

তাহাতে লুচি কাঁচা থাকিয়া যাইবে। এজন্য সে ধীরে ধীরে সময় লইয়া লুচি তুলিতে লাগিল। পদ্ম ঝি একবার বলিল– অত দেরি করে খোলা নামাচ্ছ কেন ঠাকুর? হাত চালাও না–অত লুচি ডুবিয়ে রাখলে কড়া হয়ে যাবে–

হাজারি ভাবিল, একবার সে বলে যে রান্নার কাজ পদ্ম ঝিয়ের কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে না, লুচি ডুবাইলে কড়া কি নরম হয় সে ভালই জানে, কিন্তু তখনই সে বুঝিল, পদ্ম ঝি কেন একথা বলিতেছে।

দশ সের ঘি হইতে জলতি বাদে যাহা বাকী থাকিবে পদ্ম ঝিয়ের লাভ। সে বাড়ী লইয়া যাইবে লুকাইয়া। কর্তামশায় পদ্ম ঝিয়ের বেলায় অন্ধ। দেখিয়াও দেখেন না।

হাজাৰি ভাবিল, এই সব জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খদ্দেরে পয়সা দেবে, তারা কাঁচা লুচি খাবে কেন? দশ সের ঘিয়ের দাম তো তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েছে, তবে তা থেকে বাঁচানোই বা কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভাল হয় তাই তো দেখতে হবে? পদ্ম ঝি বাড়ী নিয়ে যাবে বলে তারা দশ সের ঘিয়ের ব্যবস্থা করে নি।

পরক্ষণেই তাহার নিজের স্বপ্নে সে ভোর হইয়া গেল।

এই রেল-বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি কাহাকে বলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খদ্দের যে জিনিসের অর্ডার দিবে, তাহার মধ্যে

চুরি সে করিবে না। খদ্দের সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাঁধিবে, খাওয়াইয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।

লুচি ভাজা ঘিয়ের বুদ্বুদের মধ্যে হাজারি ঠাকুর যেন সেই ভবিষ্যৎ হোটেলের ছবি দেখিতে পাইতেছে। প্রত্যেক ঘিয়ের বুদ্বুদটাতে। পদ্ম ঝি সেখানে নাই, বেচু চক্কত্তির গাঁজাখোর ও মাতাল শালাও নাই। বাহিরে গদির ঘরে দিব্য ফর্সা বিছানা পাতা, খদ্দের যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুক, তামাক খাইতে ইচ্ছা করে থাক, বাড়তি পয়সা আর একটিও দিতে হইবে না। দুইটা করিয়া মাছ, হপ্তায় তিন দিন মাংস বাঁধা-খদ্দেরদের। এসব না করিয়া শুধু ইষ্টিশনের প্লাটফর্মে–হি-ই-ইন্দু হোটেল, হি-ই-ই-ন্দু হোটেল, বলিয়া মতি চাকরের মত চেঁচাইয়া গলা ফাটাইলে কি খদ্দের ভিড়িবে?

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল–ও ঠাকুর, তোমার হোল? হাত চালিয়ে নিতে পাচ্ছ না? বাবুদের নোক যে বসে আছে।

বলিয়াই ময়দার বারকোশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা লুচি যতগুলি ছিল, হাজারি প্রায় সব খোলায় চাপাইয়া দিয়াছে–খান পনেরো কুড়ির বেশী বারকোশে নাই। মতি চাকর পদ্ম ঝিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে লাগিল।

পদ্ম ঝি বলিল–তোমার হাত চলচে না, না? এখনো দশ সের ময়দার তাল ডাঙায়, ওই রকম করে লুচি বেললে কখন কি হবে?

হাজারি বলিল–পদ্মদিদি, রাত এগারোটা বাজবে ওই লুচি বেলতে আর এক হাতে ভাজতে। তুমি বেলবার লোক দাও।

পদ্ম ঝি মুখ নাড়িয়া বলিল–আমি ভাড়া করে আনি বেলবার লোক তোমার জন্যে। ও আমার বাবু রে! ভাজতে হয় ভাজো, না হয় না ভাজো গে–ফেরত গেলে তখন কর্তামশায় তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এখন।

পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

মতি চাকর বলিল–ঠাকুর, তুমি লুচি ভেজে উঠতে পারবে কি করে? লুচি পোড়াবে না। এত ময়দার তাল আমি বেলবো কখন বলো।

হঠাৎ হাজারির মনে হইল, একজন মানুষ এখনি তাহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া যাইত–কুসুম! কিন্তু সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের ঘরের বৌ–তাহাকে তো এখানে আনা যায় না। যদিও ইহা ঠিক, খবর পাঠাইয়া তাহার বিপদ জানাইলে কুসুম এখনি ছুটিয়া আসিত।

তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই–দেখিয়াছে শুধু লুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাখারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাঙ্গা রাঙ্গা লুচির গোছা–তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভীষণ আগুনের তাত, মাজা পিঠ বিষম টনটন করিতেছে, ঘাম ঝরিয়া কাপড় ও গামছা ভিজিয়া গিয়াছে, এক ছিলিম তামাক খাইবারও অবকাশ নাই–শুধু কাঁচা লুচি কড়ায় ফেলা

এবং ভাজিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া পাশের ধামাতে রাখা।

রাত দশটা।

মুর্শিদাবাদের গাড়ী আসিবার সময় হইল।

মতি চাকর বলিল–আমি একবার ইষ্টিশনে যাই ঠাকুরমশায়। টেরেনের টাইম হয়েছে। খদ্দের না আনলে কাল কর্তামশায়ের কাছে মার খেতে হবে। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

ঠিক কথা, সে খানিকক্ষণ প্লাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে 'হি-ই-ই- হোটেল' 'হি-ই-ই-দু হোটেল' বলিয়া চেঁচাইবে। মুর্শিদাবাদের ট্রেন আসিতে আর মিনিট পনেরো বাকী।

হাজারি বলিল–একা আমি বেলবো আর ভাজবো। তুই কি খেপলি মতি? দেখলি তো এদের কাণ্ড। রতনঠাকুর সরে পড়েছে, পদ্মদিদিও বোধ হয় সরে পড়েছে। আমি একা কি করি?

মতি বলিল–তোমাকে পদ্মদিদি দুচোখে দেখতে পারে না। কারো কাছে বোলো না ঠাকুর–এ সব তারই কারসাজি। তোমাকে জব্দ করবার মতলবে এ কাজ করেচে। আমি যাই, নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

মতি চলিয়া গেল। অন্ততঃ পাঁচ সের ময়দার তাল তখনও বাকী। লেচি পাকানো সে-ও প্রায় দেড় সের–হাজারি গুণিয়া দেখিল ষোল গণ্ডা লেচি। অসম্ভব! একজন মানুষের দ্বারা কি করিয়া রাত বারোটার কমে বেলা এবং ভাজা দুই কাল হইতে পারে!

মতি চলিয়া যাইবার সময় যে বিড়িটা দিয়া গিয়াছিল সেটি তখনও ফুরায় নাই–এমন সময় পদ্ম উঁকি মারিয়া বলিল–কেবল বিড়ি খাওয়া আর কেবল বিড়ি খাওয়া! ওদিকে বাবুর বাড়ী থেকে নোক দুবার ফিরে গেল–তখনি তো বলেচি হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে এ কাজ হবে না–বলি বিড়িটা ফেলে কাজে হাত দেও না, রাত কি আর আছে?

হাজারি ঠাকুর সত্যই কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিড়ি ফেলিয়া দিল। পদ্ম ঝিয়ের সামনে সে একথা বলিতে পারিল না যে, লুচি বেলিবার লোক নই। আবার সে লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল একাই।

রাত এগারোটার বেশী দেরি নাই। হাজারির এখন মনে হইল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। কেবলই এই সময়টা মনে আসিতেছিল দুটি মুখ। একটি মুখ তাহার নিজের মেয়ে টেঁপির–বছর বারো বয়স, বাড়ীতে আছে; প্রায় পাঁচ ছ'মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নাই–আর একটি মুখ কুসুমের। ওবেলা কুসুমের সেই যত্ন করিয়া বসাইয়া জল খাওয়ানো...তার সেই হাসিমুখ ...টেঁপির মুখ আর কুসুমের মুখ এক হইয়া গিয়াছে...লুচি ও ঘিয়ের বুদ্বুদে সে তখনও যেন একখানা মুখই দেখিতে পাইতেছে–টেঁপি ও কুসুম দুইয়ে মিলিয়া এক...ওরা আজ যদি দু'জনে

এখানে থাকিত। ওদিকে কুসুম বসিয়া হাসিমুখে লুচি বেলিতেছে এদিকে টেঁপি...

–ঠাকুর!

স্বয়ং কর্তামশায়, বেচু চক্কত্তি। পিছনে পদ্ম ঝি। পদ্ম ঝি বলিল–ও গাঁজাখোর ঠাকুরকে দিয়ে হবে না আপনাকে তখুনি বলিনি বাবু? ও গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, দেখচো না? কাজ এগুবে কোত্থেকে!

হাজারি তটস্থ হইয়া আরও তাড়াতাড়ি লুচি খোলা হইতে তুলিতে লাগিল। বাবুদের লোক আসিয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম ঝি যে লুচি ভাজা হইয়াছিল, তাহাদের ওজন করিয়া দিল কর্তাবাবুর সামনে। পাঁচ সের ময়দার লুচি বাকী থাকিলেও তাহারা লইল না, এত রাত্রে লইয়া গিয়া কোনো কাজ হইবে না।

বেচু চক্কত্তি হাজৰিকে বলিলেন–এই ঘি আর ময়দার দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে। গাঁজাখোর মানুষকে দিয়ে কি কাজ হয়?

হাজারি বলিল–আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। কেউ তো বেলে দিতে আসেনি এক মতি চাকর ছাড়া। সেও গাড়ীর টাইমে ইষ্টিশনে খদ্দের আনতে গেল, আমি কি করব বাবু।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–সে সব শুনচি নে ঠাকুর। ওর দাম তুমি দেবে। খদ্দের অর্ডার ফেরত দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারিনে, আর মাখা

নেচি কাটা ময়দা।

হাজারি ভাবিল, বেশ, তাহাকে যদি এদের দাম দিতে হয়, লুচি ভাজিয়া সে নিজে লইবে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত খাটিয়া ও মতি চাকরকে কিছু অংশ দিবার জন্য লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া লুচি বেলাইয়া সব ময়দা ভাজিয়া তুলিল। মতি তাহার অংশ লইয়া চলিয়া গেল। এখনও তিন চার বুড়ি লুচি মজুত।

পদ্ম ঝি উঁকি মারিয়া বলিল–লুচি ভাজচো এখনও বসে? আমাকে খানকতক দাও দিকি–

বলিয়া নিজেই একখানা গামছা পাতিয়া নিজের হাতে খান পঁচিশ-ত্রিশ গরম লুচি তুলিয়া লইল। হাজারি মুখ ফুটিয়া বারণ করিতে পারিল না। সাহসে কুলাইল না।

অনেক রাত্রে সুপ্তোত্থিতা কুসুম চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের দরজা খুলিয়া সম্মুখে মস্ত এক পোঁটলা-হাতে-ঝোলানো অবস্থায় হাজারি ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল–কি বাবাঠাকুর, কি মনে করে এত রাত্রে?...

হাজারি বলিল–এতে লুচি আছে মা কুসুম। হোটেলে লুচি ভাজতে দিয়েছিল খদ্দেরে। বেলে দেবার লোক নেই–শেষকালে খদ্দের পাঁচ সের ময়দার লুচি নিলে না, কর্তাবাবু বলেন আমায় তার দাম দিতে হবে। বেশ আমায় দাম দিতে হয় আমিই নিয়ে নিই। তাই তোমার জন্যে বলি নিয়ে যাই, কুসুমকে তো কিছু দেওয়া হয় না কখনো। রাত বড্ড হয়ে গিয়েচে– ঘুমিয়েছিলে বুঝি? ধর তো মা বোঁচকাটা

রাখো গে যাও।

কুসুম বোঁচকাটা হাজারির হাত হইতে নামাইয়া লইল। সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছে, বাবাঠাকুর পাগল, নতুবা এত রাত্রে–(তাহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে–), এখন আসিয়াছে লুচির বোঁচকা লইয়া।

হাজারি বলিল, আমি যাই মা–লুচি গরম আর টাটকা, এই ভেজে তুলিচি। তুমি খানকতক খেয়ে ফেলো গিয়ে এখনি। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে। আর ছেলেপিলেদের দাও গিয়ে। কত আর রাত হয়েচে– সাড়ে বারোটার বেশী নয়।

হোটেলে ফিরিয়া হাজারি ঠাকুর একটি দুঃসাহসের কাজ করিল।

মতি চাকর পূর্ব হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তুলিয়া বলিল–মতি, আমি রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাচ্চি। এত লুচি কি হবে, বাড়ীতে দিয়ে আসি। তুমি থাকো, আমি কাল সকাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না করবো, কর্তা মশায়কে বলো।

মতি অবাক লইয়া বলিল–এত রাত্রে লুচি নিয়ে বাড়ী রওনা হবে।–

–এত লুচি কি হবে? এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমার জিনিস নিজের বাড়ী দিয়ে আসি। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না, তাদের দিয়ে আসি! ছ’টা পয়সা তো খরচ।

হাজারি আর ঘুমাইল না। টেঁপির জন্য তার মন-কেমন করিয়া উঠিয়াছে। কুসুম যেমন, টেঁপিও তেমন। আরও দুটি ছেলে আছে ছোট ছোট। তাদের মুখ বঞ্চিত করিয়া এত লুচি এখানে রাখিয়া পদ্ম ঝি আর কর্তামশায়ের বাড়ীতে খাওয়াইয়া কোন লাভ নাই।

রাত সাড়ে তিনটার সময় গাংনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাজারি নিজের গ্রামের পথ ধরিল এবং সাড়ে তিন কোশ পথ হাঁটিয়া ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পৌঁছিল।

এঁড়োশোলা এক সময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল–এখন পূর্বের শ্রী নাই। গ্রামের জমিদার কর বাবুরা এখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়াতে গ্রামের মাইনর স্কুলটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এখান হইতে বাস উঠাইয়া কেহ রানাঘাট, কেহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত নিরুপায় যারা তারাই গ্রামে পড়িয়া আছে।

হাজারির বাড়ীতে দুখানা খড়ের ঘর। ছোট উঠান, একদিকে কাঁঠাল গাছ, অন্যদিকে একটা সজনে গাছ এবং একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছটা হাজারির মা নিজের হাতে পুঁতিয়াছিলেন– বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়, কাশীর পেয়ারার বীজের চারা।

হাজারির ডাকাডাকিতে হাজারির স্ত্রী উঠিয়া দোর খুলিয়া, এ অবস্থায় স্বামীকে দেখিয়া বলিল–এসো, এসো। শেষ রাতের গাড়ীতে এলে কেন গো? এই দুরান্তর

রাস্তা, অন্ধকার রাত–আবার বড্ড সাপের ভয় হয়েছে–সাপের কামড়ে দু-তিনটি মানুষ মরে গিয়েছে এর মধ্যে।

–আমাদের গাঁয়ে?

–আমাদের গায়ে নয়–নতুন কাওয়া পাড়ায় একটা মরেচে আর বামন পাড়ায় শুনচি একটা–অত বড় বোঁচকাতে কি গো?

হাজারি লুচির আসল ইতিহাস কিছু বলিল না। স্ত্রীর আনন্দপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল–পেয়েছি গো পেয়েছি। ভগবান দিয়েছেন, সবাই মিলে খেয়ে নাও মজা করে। টেঁপিকে খুব করে খাওয়াও, ও পেট ভরে খাবে আমি দেখি।

.

সেদিন সকালের গাড়ীতে হাজারি রাণাঘাটে ফিরিতে পারিল না।

দুপুরের পরে হাজারি কুসুমের বাপের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

এই গ্রামেই গোয়ালপাড়ায় কুসুমের জ্যাঠামশায় হরি ঘোষের অবস্থা এক সময় যথেষ্ট ভাল ছিল, এখনও বাড়ীতে গোহাল-পোরা গরুর মধ্যে আট-দশটি অবশিষ্ট আছে, দুটি ছোট ছোট ধানের গোলাও বজায় আছে।

হাজারিকে হরি ঘোষ খুব খাতির করিয়া খেজুর পাতার চটে বসিতে দিল। বলিল–কবে আলেন বাবাঠাকুর? সব ভালো।

–তোমরা সব ভাল আছ?

–আপনার ছিচরণের আশিব্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে। রাণাঘাটেই কাজ কচ্চেন তো?

–হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো এলাম।

–আমাদের কুসুমের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

হাজারি পাড়াগাঁয়ের লোক, এখানকার লোকের ধাত চেনে। কুসুমের সঙ্গে সর্বদা দেখা শোনা বা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টানের কোন পরিচয় সে এখানে দিতে চায় না। ইহারা হয়তো সহজ ভাবে সেটা গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে নানারূপ কদর্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইতে। সুতরাং সে বলিল

–হ্যাঁ,–দু-একবার হয়েছিল। ভাল আছে।

–এবার যদি দেখা হয়, একবার আসতে বলবেন ইদিকে। তার গাঁয়ে আসবার

দিকে তত টান নেই, শহরে দুধ বেচে চালানো যে কি মিষ্টি লেগেছে!

হাজারি কথার গতি অন্য দিকে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল–এবার আবাদপত্র কি রকম হোল বল?

-ধানের আবাদ করিচি বারো বিঘে আর বাকী সব তরকারি। কুমড়ো দু-বিঘে, আলু, পেঁয়াজ,–তা এবার আকাশের অবস্থা ভাল না বাবাঠাকুর, ক্ষেতে মাটি ফেটে যাচ্চে!

তরকারির কথায় হাজারির নিজের গোপনীয় উচ্চাশার কথা মনে পড়িল। তরকারি তাহার গ্রাম হইতে কিনিলে রাণাঘাট বাজারের চেয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এখন হইতেই সে আনাজপত্র লইয়া যাইবে।

হরি ঘোষকে বলিল–আচ্ছা, তোমাদের আলু ক'মণ হতে পারে?

–বাবাঠাকুর তার কি কোন ঠিক আছে? তবে ত্রিশ-চল্লিশ মণ খুব হবে।

–তুমি সমস্ত আলু আমায় দিতে পারবে? নগদ দাম দেবো।

হরি ধোষ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল–বাবাঠাকুর, আজকাল কাঁচামালের ব্যবসা করচেন নাকি?

–ব্যবসা এখনও করিনি, তবে করবো ভাবচি। সে তোমায় বলব একদিন।

গোয়ালপাড়া হইতে আসিবার পথে একটা খুব বড় বাঁশবনের মাঝখান দিয়া পথ। এখানে লোকজন নাই, এঁড়োশোলা গ্রামেই লোকজনের বসত নাই। আগে ছিল–ম্যালেরিয়ায় মরিয়া হাজিয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধুই বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান ও বাঁশবনের জঙ্গল।

এই বাঁশবনের মধ্যে পুরোনো দিনে পালিত পাড়া ছিল, হাজারি বাল্যকালেও দেখিয়াছে। পালিতেরা বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল গ্রামের মধ্যে, পূজাপার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব পর্যন্ত হইয়াছে বাজেন পালিতের বাড়ী। এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিতদের ভিটাটা পড়িয়া আছে এই পর্যন্ত। দিন মানেই বোধ হয় বাঘ লুকাইয়া থাকে।

বাঁশঝাড়ে কটকট করিয়া শুকনো বাঁশের শব্দ হইতেছে–ঘন ছায়া, শুকনো বাঁশপাতার ও সোলার শব্দ। ফিঙ্গে, শালিখ পাখীর কলরব। হাজারির মনে হইল, আজ যেন তার হোটেলের দাসত্ব-জীবন গতে মুক্তির দিন। সেই ভীষণ গরম উনুনের সামনে বসিয়া আজ আর তাকে ডেকচিতে ভাত-ডাল রান্না করিতে হইবে না। পদ্ম ঝিয়ের কড়া তাগাদা ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে হইবে না। বাঁশবনের ছায়ায় পূর্ণ শান্তিতে সে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়–তাহা হইলেও কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

এই মুক্তি সে ভাল ভাবেই আবাদ করিতে চায় বলিয়াই তো হোটেল খুলিবার কথা এত ভাবে।

সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এইবার কিছু টাকা হইলেই সে রাণাঘাটের বাজারে হোটেল খুলিয়া দিতে পারে।

হাজারি সত্যই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, টাকা কোথায় ধার পাওয়া যাইতে পারে। এক গ্রামের গোসাঁইরা বড় লোক, কিন্তু তাহারা প্রায় সবাই থাকে কলিকাতায়। এখানে বৃদ্ধ কেশব গোসাঁই থাকেন বটে কিন্তু লোকটা ভয়ানক কৃপণ–তিনি কি হাজারির মত সামান্য লোককে বিনা বন্ধকে, বিনা জামিনে টাকা ধার দিবেন?

হাজারির জামিন হইবেই বা কে!

তাহার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। দু'খানা মাত্র চালাঘর। রান্নাঘরখানা গত বর্ষায় পড়িয়া গিয়াছে–পয়সা অভাবে সারানো হয় নাই, উঠানের আমতলায় রান্না হয়–বৃষ্টির দিন এখন ক্রমশঃ চলিয়া গেল, এখন তত অসুবিধা হয় না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

হাজারি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার ছোট মেয়ে টেঁপি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উল বুনিতেছে। টেঁপি বাবাকে দেখিয়া বলিল–তোমার জন্য আসন বুনচি বাবা-কাল তুমি যদি থাকো, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

হাজারি মনে মনে হাসিল। বেচু চক্কত্তির হোটেলে সে রঙীন পশমের আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে–ছবিটি বেশ বটে। পদ্ম ঝি কি মন্তব্য করিবে তাহা হইলে?

মেয়েকে বলিল–দেখি কেমন আসন? বা বেশ হচ্ছে তো, কোথায় শিখলি তুই বুনতে?

টেঁপি বলিল–মুখুয্যে-বাড়ীর নীলা-দি আর অতসী-দি'র কাছে। আমি রোজ যাই দুপুরে, ওরা আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়।

–ওরা এখনও আছে? হরিচরণবাবু চলে যান নি এখনও?

–ওরা নাকি এ মাসটা থাকবে। থাকলে তো আমারই ভাল–আমি কাজটা শিখে নিতে পারি। কি চমৎকার গান গাইতে পারে অতসী-দি! আজ শুনবে বাবা?

–তুই গান শিখলি কিছু?

টেঁপি লাজুক স্বরে বলিল–দু-একটা। সে কিছু নয়। তুমি অতসী-দির গান যদি শোনো, তবে বলবে যে কলের গানের রেকর্ড শুনচি। ওদের বাড়ী খুব বড় কলের গানও আছে। রোজ সন্ধ্যের পর বাজায়। কত রকমের গান আছে–যাবে শুনতে সন্ধ্যের পর? অতসী-দি নিজে কল বাজায়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে–অতসী-দিকে বলবো বাবা এসেছে, ভালো ভালো বেছে গান দেবে।

হাজারি বলিল–হ্যাঁরে, হরিচরণবাবুর শরীর সেরেচে জানিস?

–তা তো জানিনে, তবে তিনি বৈঠকখানায় বসে রোজই তো সবার সঙ্গে গল্প করেন। একদিন বৈঠকখানায় কলের গান বাজিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্ত্তন!

সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি বর্তমানে হাজারির তত আগ্রহ নাই, হাজারির উদ্দেশ্য হরিচরণবাবুকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ শ'দুই টাকা ধার করা যায় কিনা, সেদিকে।

হরিচরণ মুখুয্যে মহাশয় এ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহারা এ গ্রামের জমিদার–কিন্তু অনেক দিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন। প্রকাণ্ড তিন-মহলা বাড়ী পড়িয়া আছে, দু-একজন বৃদ্ধা পিসী-মাসী ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ এতদিন ছিল না।

আজ মাস চার-পাঁচ হইল হরিচরণ মুখুয্যের একমাত্র পুত্র কলিকাতায় মারা যায় বসন্ত রোগে। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই আজ প্রায় তিন মাস হইল হরিচরণবাবু সপরিবারে দেশের বাটীতে আসিয়া যে কেন বাস করিতেছেন–সে খবর হাজারি রাখে না। তবে ইহা জানে যে, হরিচরণবাবু গ্রামের উত্তর মাঠে একটি দীঘি খনন করিবার জন্য জেলা বোর্ডের হাতে অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন এবং পুত্রের নামে একটি ডিসপেনসারী করিয়া দিবেন গ্রামে। হরিচরণবাবু কারো বাড়ী যান না। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন সব সময়। তার দুই মেয়ে ও স্ত্রী এখানেই, তাছাড়া চাকর-বাকর ও দু'জন দরোয়ান আছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পর সাহসে ভর করিয়া হাজারি হরিচরণবাবুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে বড় বড় থামওয়ালা সাদা মার্বেল পাথর বাঁধানো বারান্দা। বারান্দার সামনে একটা মাঝারি গোছের কামরা, পাশে একটা ছোট কামরা, পূর্বে নবীনবাবু বলিয়া ইহাদের এক সরিক বড় বৈঠকখানার পাশে পৃথক ভাবে নিজের জন্য আর একটি বৈঠকখানা তৈরী করিয়াছিলেন–তিনি আজ পঁচিশ বৎসর হইল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে, উক্ত বৈঠকখানা ঘর বর্তমানে বিচালি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাজারি টেঁপিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। টেঁপি বলিল–বাবা তুমি বোসো, আমি অতসী-দিকে বলিগে তুমি এসেছ কলের গান শুনতে। এখুনি দেবে গান।

বৈঠকখানার সামনে হাজারিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া টেঁপি পাশের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে সরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে তেলের চৌপায়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ইহা সাবেকী কালের বন্দোবস্ত, এখনও ঠিক বজায় আছে। হাজারি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে ঘরে ঢুকিবে কিনা, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে স্বয়ং হরিচরণবাবু বারান্দায় বাহির হইয়াই সামনে হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন–কে?

হাজারি বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল–বাবু, আমি হাজারি—

–ও, হাজারি! কি মনে করে, এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের মধ্যে এসো। মাস-দুই তোমায় দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে, আমার বড় মেয়ে অতসীর সঙ্গে তার বেশ ভাব।

হরিচরণবাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, গৌরবর্ণ, লম্বা আড়ার চেহারা, বড় বড় চোখ –গলার স্বর গম্ভীর। তিনি খুব শৌখীন লোক ছিলেন। এখনও এই বয়সেও এবং ছেলে মারা যাওয়া সত্ত্বেও বেশ শৌখীনতা ও সুরুচির পরিচয় আছে তার আটপৌরে পোশাকেও।

হাজারি আসলে আসিয়াছে টাকা ধার করিবার কথা বলিতে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড বড় সেকেলে প্রমাণ সাইজের আয়নাখানায় নিজের আপাদ-মস্তক দেখিয়াই তাহার সাহসটুকু সব উবিয়া গেল।

হরিচরণবাবুর নির্দেশ মত সে একখানা চেয়ারে বসিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন–চা খাবে হাজারি?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল–আজ্ঞে, চা আমি–থাকগে, সে কেন আবার কষ্ট–

হরিচরণবাবু বলিলেন–বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমি তো চা খাবোই এখন, দাঁড়াও

আনতে বলি

এই সময় টেঁপি বৈঠকখানার যে দোর অন্তঃপুরের দিকে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণবাবুকে বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়াও সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল–বাবা দাঁড়াও, অতসী-দি কলের গান বাজাচ্চে-আমি বলেছি আমার বাবা তোমাদের কলের গান শুনতে এসেচে

হরিচরণ বাবু বলিয়া উঠিলেন–কলের গান শুনতে এসেচ হাজারি! তা আমাকে বলতে হয় এতক্ষণ। শুনতে আসবে এর আর কথা কি? তোমরা দু-পাঁচজন আস-ধাও, বড় আনন্দের কথা। গ্রাম তো লোকশূন্য হয়ে পড়েচে। ওরে খুকি, তোর বাবার জন্যে আর আমার জন্যে দু' পেয়ালা চা আনতে বলে দে তোর অতসী-দিদিকে।

হাজারি মনে মনে টেঁপির উপর চটিয়া গেল। হতভাগা মেয়েটা সব দিল মাটি করিয়া। কে তাহাকে বলিয়াছিল কলের গান শুনিতে সে যাইতেছে মুখুয্যে বাড়ীতে? অতঃপর টাকার কথা উত্থাপন করা কি ভালো দেখায়? নাঃ, যত ছেলেমানুষ নিয়া হইয়াছে কারবার!

হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এই সময় দু' পেয়ালা চা-হাতে ধরে ঢুকিল। প্রথমে হাজারি সামনে টেবিলে একটি পেয়ালা নামাইয়া অন্য পেয়ালাটি হরিচরণবাবুর হাতে দিল। অতসীয় বয়স আঠারো-উনিশ, বেশ ধপধপে ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী–ডাগর ডাগর চোখ–এক কথায় অতসী সুন্দরী মেয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ

সহজ অনাড়ম্বর সাজগোজ, হাতে কয়েক গাছি সরু সোনার চুড়ি এবং কানে ইয়ারিং ছাড়া অলঙ্কারেরও কোন বাহুল্য নাই।

হরিচরণবাবু বলিলেন–তোমার হাজারি কাকা–প্রণাম কর অতসী।

অতলী আগাইয়া আসিয়া হাজারির সামনে নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। হাজারি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল–থাক থাক এসো মা, রাজরাণী হও মা–এসো, কল্যাণ হোক।

অতসীকে হরিচরণবাবু বলিলেন–তোমার হাজারি কাকা গান শুনবেন। গ্রামোফোনটা নিয়ে এসো।

অতসীর সঙ্গে টেঁপি খুব ভাব করিয়াছে। টেঁপির বাবাকে অতসী এই প্রথম–দেখিল বন্ধুর পিতা কি রকম দেখিতে, কৌতূহলের সহিত সে চাহিয়া দেখিতেছিল, বাবার কথায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের বার বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

হরিচরণবাবু চাকরকে বলিলেন বাজাবে কে? তোর দিদিমণি আসছে না?

–দিদিমণি যে বল্লেন আপনি বাজাবেন–

–আমি ভাল চোখে দেখতে পাব না। তাকেই পাঠিয়ে দিগে যা– একটু পরে

অতসী, টেঁপি এবং পাড়ার আরও দু-তিনটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। কলের গান বাজনা শুরু হইল এবং চলিল ঘণ্টা-দুই। আরও একবার চা দিয়া গেল চাকরে, কিন্তু পরিবেশন করিল অতসী।

সব মিটিয়া চুকিয়া যাইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। হাজারি ছটফট করিতেছিল, গান শুনিতে সে এখানে আসে নাই।

গান বন্ধ হইলে অতসী, টেঁপি ও মেয়ের দল যখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, তপন হাজারি সাহসে ভর করিয়া বলিল–আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল বাবু।

হরিচরণবাবু বলিলেন–কি বল?

–আমার কিছু টাকা দরকার, যদি আমায় কিছু ধার দিতেন, তাহলে আমার একটা মস্ত বড় আশার কাজ মিটতো।

–মেয়ের বিয়ে দেবে?

–আজ্ঞে না বাবু, তা নয়, ব্যবসা করবো।

–কি ব্যবসা?

–বাবু আপনি তো জানেন আমি হোটেলে কাজ করি। আপনার কাছে লুকোবে না।

আমি নিজে একটা হোটেল খুলতে চাচ্ছি এবার। টাকাটা সেজন্যে দরকার।

–কত টাকা দরকার?

–অন্তত দুশো টাকা আমায় যদি দয়া করে দেন বাবু, আমার খালধারের কাঁঠাল বাগান আমি বন্ধক রাখচি আপনার কাছে। এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করবে।

হরিচরণবাবু ভাবিয়া বলিলেন–বাগান বন্ধক রেখে টাকা আমি দিতাম না, দিতাম তো তোমাকে এমনি দিতাম, কিন্তু অত টাকা এমন সময় আমার হাতে নগদ নেই।

হাজৰি এ-কথার পরে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, বিশেষত সে জানিত হরিচরণবাবু উদার মেজাজের মানুষ, সত্যবাদী লোক। টাকা হাতে থাকিলে, হাতে টাকা না থাকার কথা বলিতেন না।

অতলী আসিয়া বলিল–কাকা, আপনি একটু বসুন। টেঁপি খেতে বলেছে, মা ছাড়বে না। মেয়েরা, যারা গান শুনতে এসেছিল, সবাইকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। একটু দেরি হবে। না হয় আপনি যান, আমি ঝি’র সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এখন। হরিচরণবাবু বলিলেন –তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, একটু বসে যাও না হাজারি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। কেউ বড় একটা আসে না আমার এখানে–। হাজারি বসিল।

–তুমি কোথায় কোন হোটেলে কাজ কর?

–আজ্ঞে রাণাঘাট, বেচু চক্কত্তির হোটেলে, রেল-বাজারের মধ্যে।

–কত মাইনে পাও?

–বাবু সে আর বলবার কথা নয়, খাওয়া আর সাত টাকা মাসে। তাই ভাবছিলাম পরের তাঁবে থাকবে না। এদিকে বয়স হলো, এইবার একটা হোটেল খুলে নিজে চালাবো।

–হোটেল চালাতে পারবে?

–তা বাবু আপনার আশীর্বাদে একরকম সবই জানি ও-লাইনের। বাজার আর রান্না, হোটেলের দুটো মস্ত কাজ, এ যে শিখেচে, সে হোটেল খুলে লাভ করতে পারে। আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে ও দুটো কাজ শিখে নিইচি–খদ্দের কি চায় তাও জানি। চাকরি করি রাঁধুনীর বটে বাবু কিন্তু আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, আপনার আশীর্বাদে চোখ-কান খুলে কাজ করি।

–বেশ ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হাজারি তাহার বহুদিনের আশা ও সাধ একটি আদর্শ হিন্দু হোটেল

প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। চূর্ণীনদীর ধারে বসিয়া অবসর মুহূর্তে তাহার সে স্বপ্ন দেখার কথাও গোপন করিল না। তাহার রান্না খাইয়া কলিকাতার বাবুরা কি রকম সুখ্যাতি করিয়াছে, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইবার চেষ্টা, কিছুই বাদ দিল না। হরিচরণবাবু বলিলেন–দেখ হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েছে একটা কিছু গড়ে তুলবো। এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সব-কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর যেন কিছু করবার নেই, ক'রে কি হবে, কার জন্যে করবো এই সব কথা মনে ওঠে। তা ছাড়া জীবনে কখনোই কিছু দরকার হয়নি। বাবার সম্পত্তি ছিল যথেষ্ট–নতুন কিছু গড়ে তুলবো এ ইচ্ছে কোনদিন জাগেনি। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, ওই একটা আশাই তোমায় যুবক করে রেখে দেবে যে! আমার মাথায় এত পাকা চুল ছিল না। খোকা মারা যাওয়ার পরে জীবনের উদ্যম, আশা ভরসা যেমন চলে গেল, অমনি মাথার চুল পেকে উঠলো। তবে এখন ইচ্ছে আছে খোকার নামে একটা স্কুল করে দেবো। আবার ভাবি, স্কুলে পড়বেই বা কে? আমাদের এ অঞ্চলে তো লোকের বাস নেই। তার চেয়ে না হয় একটা ডাক্তারখানা করে দিই। উদ্যমই জীবনের সবটুকু, যার জীবনে আশা নেই, যা কিছু করার ছিল সব হয়ে গেছে–তার জীবন বড় কষ্টকর। যেমন ধরো দাঁড়িয়েচে আমার। খোকা মারা না গেলে আজ আমার ভাবনা হে হাজারি! ভেবেছিলুম কয়লার খনি ইজারা নেবো–কত উৎসাহ ছিল। এখন মনে হয় কার জন্যে করবো? তাই বলচিলুম, তোমায় দেখে হিংসে হয়। তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে–আমার তা নেই। আর এই দেখ, এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি আছি পড়ে, ভালো লাগে কি? ভালো লাগে না। কখনো থাকিনি, কিন্তু বাইরে আর

হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না। ওই মেয়েটা আছে, কলের গান এনেচে একটা– বাজায়, আমি শুনি। ওর মায়ের জন্যে বেছে বেছে ভক্তি আর দেহতত্ত্বের গান কিনে দিইচি, যদি তা শুনে তার মনটা একটু ভাল থাকে। মেয়েমানুষ, কষ্টটা লেগেছে তার অনেক বেশী।

হাজারি এই দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা তেমন বুঝিল না–কেবল বুঝিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে সহানুভূতিসূচক দু-চার কথা বলিল। বেশী কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া গুছাইয়া বলিতে কখনো সে শেখে নাই, তবুও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের জন্য তাহার সত্যকার দুঃখ হওয়াতে, ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে বানাইয়া কিছু বলিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন–আর একটু চা খাবে?

–আজ্ঞে না। চা খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই, আপনি খান বাবু।

এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল–বাবা, যাবে?

হাজারি হরিচরণবাবুর কাছে বিদায় লইয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ভড়েদের বাড়ীর উঠানে রাঙাকাঠ কাটিয়াছে–রাঙাকাঠের গন্ধ বাহির হইতেছে। সিধু ভড় দাওয়ায় জাল বুনিতেছিল, বলিল–দা-ঠাকুর কনে ছেলেন এত রাত অবদি?

হাজারি বলিল–বাবুর বাড়ী। বাবু ছাড়েন না কিছুতে, চা খাও, কলের গান শোন, শেষে তো টেঁপিকে না খাইয়ে ছাড়লেন না গিন্নী মা। হাজারির বড় ভাল লাগিয়াছিল আজ সন্ধ্যাটা। বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন ভাবে বসিয়া চা সে কখনো খায় নাই, খাতির করিয়া তাহার সঙ্গে কোনো বড় লোকে মনের কথাও কখনো বলে নাই। কলের গান তো আছেই। মেয়েকে বলিল–টেঁপি কি খেলি রে? টেঁপি একটু ভোজনপ্রিয়। খাইতে ভালবাসে আর গরীবের মেয়ে বলিয়াই অতসীর মা তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়েন না। বলিল–পরোটা, মাছের ডালনা, সুজি, পটলভাজা, আলুভাজা–

হাজারির স্ত্রী অনেকক্ষণ রান্না সারিয়া বসিয়া আছে, বলিল–এত রাত্তির পজ্জন্ত ছিলে কোথায় সব? পাড়া বেড়ানো শেষ হয় না যে তোমাদের, বসে বসে কেবল ঘুম আসচে–

টেঁপি বলিল–আমি খেয়ে এসেছি মা, অতসী-দিদির মা ছাড়লেন না কিছুতে। আমি কিছু খাবো না।

–হ্যাঁরে, তুই খেয়ে এলি! ওবেলার সেই বাসি লুচি তোর জন্যে রয়েছে যে! লুচি খাবি না?

অনেকদিন ইহাদের সংসারে এমন সচ্ছলতা হয় নাই যে, লুচি ফেলিয়া ছড়াইয়া ছেলে-মেয়েরা খাইতে পায়। বলিয়াও সুখ।

টেঁপি বলিল–তুমি খাও মা। আমি খুব খেয়ে এসেছি। সেখানেও তো পরোটা, সুজি, মাছের ডালনা, এই সব খাইয়েছে। আজ দিনটা বেশ কাটল–না মা? ভাল খাওয়া সকাল থেকে শুরু হয়েচে আর রাত পর্যন্ত চলেচে।

আহারাদি শেষ করিয়া হাজারি বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

হরিচরণবাবুর কথায় তাহার অনেকখানি উৎসাহ আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

লুচি! টেঁপি কত লুচি খাইতে পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার এই সব লোভাতুর ছেলে-মেয়ের মুখে ভাল খাবার-দাবার সে দিতে পারে না–কিন্তু যাতে পারে সে চেষ্টা করিবার জন্যই তো সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

হরিচরণবাবুর টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহার মত লোভাতুর ছেলে-মেয়ে নাই তাহার ঘরে, কাহাদের মুখে সুখাদ্য তুলিয়া দিবার আশায় তিনি খাটিবেন?

আজ হরিচরণবাবুর নিকট হইতে সে টাকা ধার পায় নাই বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিস পাইয়া আসিয়াছে, যাহার মূল্য টাকা-কড়ির চেয়ে বেশী।

তাহার সংসারে ছেলে মেয়ে আছে, টেঁপি আছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পায়ে বল আসিবে, মনে জোর পাইবে। হরিচরণবাবুর জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ছেচল্লিশ হইলে কি হয়, টেঁপি যে ছেলেমানুষ। তাহার

নিজের সুখ কিসের? টেঁপিকে একখানা ভাল শাড়ী কিনিয়া দিলে ওর মুখে যে হাসি ফুটিবে, সেই হাসি তাহাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে কর্মের পথে।

আহা, যদি এমন কখনো হয়।

যদি টেঁপিকে একটা কলের গান কিনিয়া দেওয়া যায়? গান এত ভালবাসে যখন...

হয়তো স্বপ্ন...কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ। দেখা যাক না কি হয়।

বাঁশঝাড়ে শন শন শব্দ হইতেছে। রাত অনেক হইয়াছে। গ্রাম নীরব হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে হাজারি স্ত্রীকে বলিল–ওগো, আমার গামছাখানা বড্ড ময়লা হয়েচে, একটু সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দাও তো, কাল খুব সকালে কেচে দিও আমি কাল সক্কালে উঠেই রাণাঘাট যাবো।

সকালে কেন, এখুনি কেচে দিই। ভিজে গামছা নিয়ে যাবে কি করে, এখন কেচে হাওয়ায় মেলে দিলে রাত্তিরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

.

সকালে উঠিয়া হাজারি ঠাকুর রাণাঘাট চলিয়া আসিল।

হোটেলে ঢুকিবার আগে তাহার ভয় করিতে লাগিল। কর্তাবাবু এবং পদ্ম ঝি

তাহাকে কি না জানি বলে। একদিন কামাই করিবার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহার প্রাণ যাইবে।

হইলও তাই।

ঢুকিবার পথেই বসিয়া স্বয়ং বেচু চক্কত্তিমশায়–খোদ কর্তা। হাজারিকে দেখিয়া হাতের হুঁকা নামাইয়া কড়া সুরে বলিলেন–কাল কোথায় ছিলে ঠাকুর? হাজারি মিথ্যা কথা বলিল না। বাড়ীতে কাহারও অসুখ ইত্যাদি ধরনের বানানো মিথ্যা কথা সে কখনও বলে না। বলিল–আজ্ঞে, অনেক দিন পরে বাড়ী গেলাম কর্তামশায়, ছেলে-মেয়ে রয়েছে–তাই একটা দিন–

–না বলে-কয়ে এভাবে হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার মানে কি? কার কাছে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে?

এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। লুচি দিতে গিয়াছিল বাড়ীতে, তাহা বলিতেও বাধে। সে চুপ করিয়া রহিল।

–তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর–পদ্ম ঝি ঠিক কথা বলে–দেখতে ভালমানুষ হলে কি হবে? তুমি এত বড় একটা হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নিউদ্দিশ হয়ে গেলে কাউকে কিছু না বলে? বলি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই মিলে–গাঁজাখোর, নেমকহারাম কোথাকার! চালাকির আর জায়গা পাওনি?

বেচু চক্কত্তির গলার জোর আওয়াজ পাইয়া পদ্ম ঝি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল এবং দোরে উঁকি মারিয়া হাজারিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল–এই যে! কি মনে করে! আবার যে উদয় হ'লে? কাল আমি বলি আর দরকার নেই, ও আপদ বিদেয় করে দেন কর্ত্তা, গাঁজা খেয়ে কোথায় নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল–চেহারা দেখচেন না?

হাজারি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো গজাল-আঁটা ছোট্ট আয়নাখানায় নিজের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিল–কি দেখিল পদ্ম ঝি তাহার চেহারাতে! গাঁজা তো দূরের কথা, একটা বিড়ি পর্যন্ত সকাল হইতে সে খায় নাই!

–যাও, কাল একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, তার মজুরি এক টাকা, আর জল খাবারের চার আনা তোমার এ মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয়, সেই দিনই বিদেয় করে দেবো মনে থাকে যেন–বেচু চক্কত্তি রায় দিলেন।

হাজারি অপ্রতিভ মুখে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল–সেখানেও নিস্তার নাই। কর্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও, পদ্ম ঝির হাতে অত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। পদ্ম ঝি হাজারির পেছন পেছন রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল–করবে না তো তোমার কাজ ওরা–কেন করবে?...একা হাঁড়ি ঠেলো আজকে–যেমন বদমাইশ তার তেমনি। একা বড় ডেকচি নামাও, ফেন গালো, ভাত বাড়ো খদ্দেরদের--কাল সব কাজ মুখ বুজে ও-ঠাকুর করেছে একা–নবাবপুত্তর গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন আর ওর জন্যে খেটে মরবে সবাই–উড়ঞ্চুড়ে মড়ুইপোড়া বামুন

কোথাকার।

পদ্ম ঝি রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এই মাত্র বেচু চক্কত্তি বলিয়াছেন যে, কাল হাজারির বদলে ঠিকা ঠাকুর রাখা হইয়াছিল যাহার মজুরি হাজারির মাহিনা হইতে কাটা যাইবে।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল, একা কি রকম? এই তো ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েছে বল্লেন কর্তাবাবু?

পদ্ম ঝি সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল–হইছিল তো। হয়নি তো কি? কর্তামশায় কি মিথ্যে কথা বলেন তোমার কাছে? যদি না-ই বা পাওয়া যেত ঠাকুর তবে ঠাকুরকে একা খাটতে হোত না? তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার–মুর্শিদাবাদ আসবার সময় হোল। এখুনি ইষ্টিশানের খদ্দের সব আসবে। ডাল সাঁৎলে ফেলো তাড়াতাড়ি, চচ্চড়িটা চড়িয়ে দ্যাও।

মুর্শিদাবাদ ট্রেন সশব্দে আসিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইল। এইবার কিছু খরিদ্দারের ভিড় হইবে।

হাজারি ছোট ডেকচিটার মধ্যে হাত ডুবাইয়া ডাল সাঁৎলাইতেছে, এমন সময় বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির চড়া গলার আওয়াজ এবং তর্কবিতর্কের শব্দ শুনিয়া সে রান্নাঘরের দোরের কাছে আসিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিল।

যতীশ ভটচাজের সঙ্গে কর্তামশায়ের কথা কাটাকাটি হইতেছে। যতীশ ভটচাজ অনেক দিন হইতে তাহাদের খরিদ্দার–আগে আগে নগদ পয়সা দিয়া খাইয়া যাইত, আল মাস-ছয় হইতে মাসিক হারে খায়। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, ম্যালেরিয়া রোগীর মত চেহারা, মাথার চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে, রং পূর্বে ফর্সা ছিল, এখন পুড়িয়া আধকালো হইয়া আসিয়াছে প্রায়। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে বিবর্ণ কেম্বিসের জুতা।

বেচু চক্কত্তি বলিতেছেন–না, আপনি অন্যস্তর চেষ্টা করুন ভটচাজ মশাই। আমি পারবো না সোজা কথা। হোটেল খুলিচি দু’পয়সা রোজগারের চেষ্টা, অন্নছত্তর তো খুলিনি?

যতীশ ভটচাজ, বলিতেছে –টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না চক্কত্তি মশাই। এ ক’ মাসের বাকী আমি এক সঙ্গে দেবো।

–না মশাই–আপনি অন্যন্তর চেষ্টা করুন। যা গিয়েচে, গিয়েচে–আর আপনাকে খাইয়ে আমি জড়াতে রাজী নই।

যতীশ ভটচাজ, বেশ নরম সুরে বলিল–না না, যাবে কেন? বিলক্ষণ! পাই-পয়সা শোধ করে দেবো। তবে পড়ে গিইচি একটু ফেরে কর্তামশাই, (খুব খোশামোদ জুড়ে দিয়েচে!) তা এই কটা দিন যেমন খাচ্চি তেমনি খেয়ে যাই–সামনের মাসের পয়লা দোসরা–

–না মশাই, সামনের মাসের পয়লা দোসরার এখনো ঢের দেরি। ওসব আর চলবে না। মাপ করবেন, আপনি অন্যন্তরে দেখুন–

যতীশ ভটচাজের চেহারা দেখিয়া হাজারির মনে হইল, লোকটা খুব ক্ষুধার্ত, সকাল হইতে কিছু খায় নাই। এত বেলায় না খাওয়াইয়া কর্তামশাই তাড়াইয়া দিতেছেন, কাজটা কি ভালো? হয়ত কিছু কষ্টে পড়িয়া থাকিবে, নতুবা দুমুঠা খাইবার জন্য লোকে এত খোশামোদ করে না।

হাজারির ইচ্ছা হইল, একবার সে বলে–কর্তামশাই আমি আজ খাবো না–কাল দেশে একটা নেমন্তন্ন ছিল খেয়ে শরীর খারাপ আছে। আমার ভাতটা না হয় ভটচাজ মশাই খেয়ে যান–কিন্তু কথাটা বলিলে কর্তামশায়ের অপমান করা হইবে, বিশেষ করিয়া পদ্ম তাহা হইলে তাহাকে আস্ত রাখিবে না।

যতীশ ভটচাজ শেষ পর্যন্ত না খাইয়া চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিল–আহা, পুরোনো খদ্দের–ওকে এক থাল ভাত দিলে কি ক্ষতি হোত হোটেলের–আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এসে কাউকে ফেরাবো না– এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পয়সা–তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার খরিদ্দারগণ আসিয়া পড়িয়াছে। খাইবার ঘরে বেশ ভিড়। মতি চাকর আজ দশ-বারোটি লোক জুটাইয়া আনিয়াছে। পদ্ম আসিয়া বলিল–দশ থালা

ভাত বাড়ো–দু’থালা নিরিমিষ্যি। আলুর ডালনা দিও।

আধঘণ্টা পরে মুর্শিদাবাদ ট্রেনের খরিদ্দার বিদায় হইলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বনগাঁয়ের ট্রেনের সময় কতকগুলি লোক খাইতে আসিল। বেলা দেড়টা, এ সময় নূতন লোক প্রায়ই আসে না, পদ্ম ঝি যখন হাঁকিল, পাঁচ থালা ভাত ঠাকুর–হাজারি তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল–ডাল একেবারেই নেই–দু’জনের মত হবে কি না–

পদ্ম ঝি ডেকচির কাছে আসিয়া নীচু হইয়া দেখিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল–ওমা, এ তো একেবারেই নেই বল্লে হয়! এখন খদ্দের খাওয়াবো কি দিয়ে? তোমার দোষ, যখন ডাল কমে আসছে, এখনও দু’খানা টেরেন্ বাকি, তখন একটু ফেন মিশিয়ে সাঁৎলে নিলে না কেন? কতবার তোমায় বলে দেওয়া হয়েছে। ফেন আছে?

হাজারি বলিল–আছে।

–আছে তো দু’বাটি দ্যাও ডালে ফেলে– দিয়ে একটু নুন দিয়ে গরম করে নাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচো কি?

হাজারি এ ধরনের কাজ কখনো করে নাই। করিতে তাহার বাধে। সে সত্যই ভাল রাঁধুনী। ইচ্ছা করিয়া হাতের ভাল রান্নাটা নষ্ট করিতে বা এভাবে খরিদ্দার ঠকাইতে তাহার মন সরে না। কিন্তু পদ্ম ঝির হুকুম না মানিয়া উপায় কি? বাধ্য হইয়া ডালে ফেন মিশাইয়া খরিদ্দার বিদায় করিতে হইল।

ছুটি পাইল সেদিন প্রায় বেলা আড়াইটায়।

একটুখানি গড়াইয়া লইয়া রোদ একটু পড়িয়া আসিলে সে চূর্ণীনদীর তীরে তাহার অভ্যাসমত বেড়াইতে চলিল। আজ ক'দিন নদীর ধারে যায় নাই–আর সেই পরিচিত নির্জন নিমগাছটার তলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়া ওপারের খেয়াঘাটের দিকে এবং শান্তিপুর যাইবার রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে নাই। বেশ লাগে জায়গাটা।

আর ওখানে গিয়া বসিলেই হাজারির মাথায় হোটেল সংক্রান্ত নানা রকম নতুন কথা আসে, অন্য কোথাও তেমন হয় না।

আজ জায়গাটাতে গিয়া বসিতেই হাজারির প্রথমে মনে হইল, হোটেল চলে রান্নার গুণে। যাহারা পয়সা দিয়া খাইতে আসিবে, তাহারা চায় ভাল জিনিস খাইতে– ফেন-মিশানো ডাল খাইতে তারা আসে না।

পদ্ম ঝিয়ের অনাচারের দরুন বেচু চক্কত্তির হোটেল উঠিয়া যাইবে। তাহার নিজের হোটেল ততদিনে খোলা হইয়া যাইবে। তাহার রান্নার গুণেই হোটেল চলিবে। হঠাৎ হাজারি লক্ষ্য করিল, যতীশ ভটচাজ, চূর্ণীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় পার হইয়া ওপারে যাইবে।

–ও ভটচাজ মশায়–ভটচাজ মশায়—

যতীশ চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া হাজারির কাছে আসিল।

–কোথায় যাবেন?

–যাচ্ছি একটু ফুলে-নবলা, আমার ভায়রাভাই থাকে, তারই ওখানে। দেখলে তো হাজারি তোমাদের চক্কত্তি মশায়ের কাণ্ডটা আজ! বলি টাকা কি আমি দিতাম না? দুপুরবেলা না খাইয়ে কি-না বল্লে অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন গিয়ে। ভাত-বেচা বামুন যদি ছোটলোক না হয়, তবে আর কে হবে! বিড়ি আছে? দাও তো একটা–

হাজারি নিকট হইতে বিড়ি লইয়া ধরাইয়া বলিল–দুশো ঝাঁটা মারি শহরের মাথায়। আর থাকচি নে। যাচ্ছি ফুলে-নবলা, আমার বড় ভায়রাভাই পার্বতী চক্কত্তি সেখানে একজন নামকরা লোক। পার্বতী দাদা একবার বলেছিল ওদের জমিদারী কাছারীতে একটা চাকরি করে দেবে। পালচৌধুরীদের জমিদারী। মস্ত কাছারী। সেখানেই যাচ্ছি। একটা হিল্লে হয়ে যাবেই।

হাজারি বলিল–একটা কথা বলি ভটচাজ মশাই, যদি কিছু মনে না করেন–

যতীশ ভটচাজ, বলিল–কি?–টাকাকড়ি এখন কিছু নেই আমার কাছে তা বলে দিচ্ছি। তবে দেনা আমি রাখবো না–খাওয়ার টাকা আগে শোধ দিয়ে তখন অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও চক্কত্তি মশাইকে।

হাজারি বলিল–টাকাকড়ির কথা বলিনি। বলচিলাম, আপনি আহার করেচেন?

যতীশ ভটচাজ, কিছুমাত্র না ভাবিয়া সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল–না। কোথায় করবে? এত বেলায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেল থেকে ফিরে আর ভাত কে আমার জন্যে নিয়ে বসে ছিল?

হাজারি খপ করিয়া যতীশ ভটচাজের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিল–আমার সঙ্গে চলুন ভটচাজ মশায়–আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াবো আজ। আসুন আমার সঙ্গে —

যতীশ ভটচাজ বলিল–কোথায়? কোথায়? আরে না, না হাজারি, আজ ও-সব থাক, আমি জল-টল খেয়ে–আর এমন অবেলায়–

হাজারি নাছোড়বান্দা। তাদের হোটেলের একজন পুরানো খদ্দের আজ পয়সা নাই বলিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাণাঘাট হইতে চলিয়া যাইতেছে–কি জানি কেন, এ ব্যাপারটার জন্য হাজারি যেন নিজেকেই দায়ী করিয়া বসিল।

যতীশ ভটচাজ বলিল–আমি তোমাদের হোটেলে আর যাবো না কিন্তু হাজারি। আচ্ছা তুমি যখন ছাড়চো না তখন বরং একটু জল-টল খাওয়াও।

–হোটেলে নিয়েই বা যাবো কেন? আসুন না জল-টল নয়, ভাত খাওয়াবো রেঁধে। যতীশ ভটচাজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, ফুলে-নবলা যেতে পারবো না আজ

তাহলে। আজ সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

নিকটেই কুসুমের বাড়ী, একবার হাজারি ভাবিল ভটচাজকে সেখানে লইয়া যাইবে কি না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করিল। ভদ্রলোককে নতুবা কোথায় বসাইয়া সে খাওয়ায়?

কুসুমের বাড়ীর দোরে কড়া নাড়িতেই কুসুম আসিয়া দোর খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যতীশ ভটচাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে লজ্জিত হইয়া নীচুস্বরে বলিল–বাবাঠাকুর কি মনে করে? উনি কে সঙ্গে?

–ওর জন্যেই আসা। উনি বামুন মানুষ, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমার চেনাশুনা–আমাদের হোটেলের পুরোনো খদ্দের। পয়সা ছিল না বলে খেতে দেয়নি কর্তামশাই। উনি না খেয়ে শান্তিপুর চলে যাচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা–ধরে আনলুম। উকে কিছু না খাইয়ে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাইরের ঘরটা খুলে দাও গিয়ে—

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দোর খুলিতে গেল। যতীশ ভটচাজ, কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল–হাজারি তাহাকে ডাক দিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীর ভিতর যাইতেই কুসুম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল–কি করবেন বাবাঠাকুর, রান্না করবেন? সব যোগাড় করে দিই। আর ততক্ষণ ধরে যা-কিছু আছে, ও বাবাঠাকুরকে দিই, কি বলেন?

হাজারি বলিয়া–রান্না করে খাওয়াতে গেলে চলবে না কুসুম। উনি থাকতে পারবেন না; ফুলে-নবলা যাবেন। আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আনি–এখানে একটু বসবার জন্যে নিয়ে এলাম।

কুসুম দিয়া বলিল–বাবাঠাকুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিকিনি। আমি সব যোগাড় করচি জলখাবারের। আমার ঘরে সব আছে, ঘরে থাকতে বাজারে যাবেন খাবার আনতে কেন? আমার বাড়ীতে যখন ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো পড়েছে, তখন আমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে খেতে দেব–কিন্তু বাবাঠাকুর, সেই সঙ্গে আপনিও–মনে থাকে যেন। হাজারি প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করার পূর্বেই কুসুম ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল–অগত্যা হাজারি বাহিরের ঘরে যতীশ ভটচাজের কাছে ফিরিয়া আসিল।

যতীশ ভটচাজ, বলিল–তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী নাকি হে?

–না, আত্মীয় নয়, এরা হোল ঘোষ-গোয়ালা। এই বাড়ীতে আমার ধর্মমেয়ের বিয়ে হয়েছে, ওই যে দোর খুলে দিলে, ওই মেয়েটি।

পনেরো মিনিট আন্দাজ পরে ঝন ঝন করিয়া শিকল নড়িয়া উঠিতে হাজারি বাহিরের বাড়ীর অক্ষয়ের দিকে দাওয়ায় গিয়া দাঁড়াইল–দাঁড়াইয়া দাওয়ার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। দু'খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পাতা–দু'বাটি জ্বাল দেওয়া দুধ, দুখানা থালে ফল-মূল কাটা, বড় বাতাসা, ছানা, দুটি মুখ-কাটা ভাব। ঝকঝকে করিয়া মাজা দুটি কাঁসার গ্লাসে দু'গ্লাস জল।

হাসিমুখে কুসুম বলিল–ওঁকে ডাকুন, সেবা করতে বলুন। যা বাড়ীতে ছিল একটু মুখে দিয়ে নিন দু'জনে।

–তা তো হোল–কিন্তু আমি আবার কেন কুসুম?

–মেয়ের বাড়ী যে–না খেয়ে যাবার কি জো আছে? ডাকুন ওকে।

যতীশ ভটচাজ খাইতে বসিয়া যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, দেখিয়া মনে হইল, সে বড়ই ক্ষুধার্ত ছিল। তাহার থালায় একটুও কিছু পড়িয়া রহিল না। কুসুম পান সাজিয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিল, খাওয়ার পরে। যতীশ ভটচাজ বিদায় লইবার সময় বলিল– তোমার মেয়েটিকে একবার ডাকো হাজারি, আশীর্বাদ করে যাই।

কুসুম আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দু'জনকেই প্রণাম করিল। যতীশ ভটচাজ বলিল– মা শোনো, সারাদিন সত্যিই খাইনি। ভারি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম তোমার এখানে। তুমি বড় ভাল মেয়ে, ছেলেপিলে নিয়ে সুখে থাকো, আশীর্বাদ করি।

হাজারি যতীশ ভটচাজের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

পথে আসিয়া বলিল–ভটচাজ মশাই, একটা হোটেল নিজে খুলবো অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আছে। আপনি কি বলেন?

–অনায়াসে করতে পারো। খুব লাভের জিনিস–তোমার হবেও। তোমার মনটা বড় ভালো। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?

–তাই নিয়েই তো গোলমাল। নইলে এতদিন খুলে দিতাম–দেখি, চেষ্টায় আছি–ছাড়চি নে–ওই যে আমার মেয়ে দেখলেন, ওই কুসুম, ও একবার টাকা দিতে চেয়েছিল। তা কি নেওয়া ভাল? ও গরীব বেওয়া লোক, কেন ওর সামান্য পুঁজি নিতে যাবো? তাই নিই নি। নিলে ও এখুনি দেয়–তবে সে টাকা খুব সামান্য। তাতে হোটেল খোলা হবে না।

যতীশ ভটচাজ চূর্ণীর খেয়ার ধারে আসিয়া বলিল–আচ্ছা, চলি হাজারি–তুমি হোটেল খুললে তোমার হোটেলে আমি বাঁধা খদ্দের থাকবো, সে তুমি ধরে নিতে পারো। আর কোথাও যাবো না–তোমার মত রান্না ক'টা ঠাকুর রাঁধতে পারে হে? বেচু চক্কত্তির হোটেলে আমি যে যেতাম শুধু তোমার নিরামিষ রান্না খাওয়ার লোভে! ভাল চলবে তোমার হোটেল। এদিগরে তোমার মত রাঁধতে পারে না কেউ, বলে যাচ্ছি।

যতীশ ভটচাজ তো চলিয়া গেল, কিন্তু হাজারির মনে তাহার শেষ কথাগুলি একটা খুব বড় বল ও প্রেরণা দিয়া গেল।

সে জানে, তাহার হাতের রান্না ভাল–কিন্তু খরিদ্দারের মুখে সে কথা শুনিলে তবে না তৃপ্তি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়াছিল বটে–কিছু সে যাইবার সময় যাহা দিয়া

গেল হাজারির মনের আনন্দ ও উৎসাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা খুব মূল্যবান ও সার্থক প্রতিদান।

হাজারি যখন হোটেলে ফিরিল, তখন বেলা বেশী নাই। রতন ঠাকুর ডাল-ভাত চাপাইয়া দিয়াছে, মতি চাকর বা পদ্ম ঝি কেহই নাই। গদির ঘরে বেচু চক্কত্তি কাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল।

হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকিলে কিন্তু হাজারির মনে নতুন বলের সঞ্চার হয়। বরং ছুটি পাইয়া বাহিরে গেলেই যত দুর্ভাবনা আসিয়া জোটে–প্রকাণ্ড উনুনের উপরে ফুটন্ত ডেকচির সামনে বসিয়া হাজারি নিজেকে বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করে। তখন না মনে থাকে কুসুমের কথা, না মনে থাকে অন্য কোনো কিছু। অবসাদ আসে কাজ হাতে না থাকিলে, এ বরাবর দেখিয়া আসিতেছে সে।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর ফিরিল।

হাজারিকে চুপি চুপি বলিল–একটি কথা আছে। আমার দেশের একজন লোক এসেছে–আমার কাছে থেকে চাকরি খুঁজবে। বড় গরীব–তাকে বিনি টিকিটে খাওয়ার ঘরে ঢুকিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমার যদি মত হয়, তবে তাকে বলি।

হাজারি বলিল–নিয়ে এসো, তার আর কি। গবীর মানুষ খাবে, আমার কোনো অমত নেই। রতন ঠাকুর খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল। রাত্রে তাহার লোক যখন খাইতে আসিল, রতন ঠাকুর হাজারিকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে লোকটাকে চিনাইয়া

দিতে, হাজারি পরিতোষ করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

পদ্ম ঝিয়ের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া লোকটা বিনা টিকিটে খাইয়া চলিয়া গেল–কেহ কিছু ধরিতেও পারিল না।

এই রকম চলিল, এক-আধ দিন নয়, দশ-বারো দিন। একদিন আবার তাহার অন্য এক সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বিনামূল্যে খাইতে দিতে হইল।

ব্যাপারটি সামান্য, হাজারি কিন্তু একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা পাইল ইহা হইতে। এত সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যেও চুরি তো বেশ চলে। বেচু চক্কত্তির টিকিট ও পয়সাতে ঠিক মিল আছে, সুতরাং তার দিক দিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই–পদ্ম ঝি যে পদ্ম ঝি, সে পর্যন্ত বিন্দুবিসর্গ জানিল না ব্যাপারটার। ভাত তরকারি কিছু মাপ থাকে না যে কম পড়িবে। সুতরাং কে ধরিতেছে? কেন? এ ধরনের চুরি ধরিবার কি উপায় নাই কোনো?

কয়দিন ধরিয়া হাজারি চূর্ণীর ঘাটে নির্জনে বসিয়া শুধু এই কথা ভাবে। ঠাকুরে ঠাকুরে ষড়যন্ত্র করিয়া যদি বাহিরের লোক ঢুকাইয়া খাওয়ায়, তবে সে চুরি ধরিবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়া একটা উপায় তাহার মাথায় আসিল একদিন বিকালে। থালায় নম্বর যদি দেওয়া থাকে, আর টিকিটের নম্বরের সঙ্গে যদি তার মিল থাকে, তবে থালা এঁটো হইলেই ধরা পড়িবে অমূক নম্বরের থালার খদ্দের বিনা টিকিটে খাইয়াছে–না পয়সা দিয়া খাইয়াছে।

মাঝে মাঝে তদারক করিলেই জিনিসটা ধরা পড়িবে। তা ছাড়া থালা মাজিবার সময় ঝি বা চাকরের নিকট হইতে এঁটো থালার নম্বরগুলি জানিয়া লইলেই হইবে।

হাজারি খুব খুশী হইল। ঠিক বাহির করিয়াছে বটে–একটা ফাঁক অবিশ্যি আছে, সেও জানে–যদি কলাপাতায় খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিনা নম্বরী থালা সেই লোকটা বাহির হইতে আনে–তাহাতে নিস্তার নাই, কারণ ঝি-চাকরের চোখে তখনই ধরা পড়িবে। এঁটো থালা সেই লোকটা কিছু মাজিতে বসিতে পারে না হোটেলের মধ্যেই। কলার পাতায় কেহ খাইতেছে, ইহা চোখে পড়িলে তখনি ঝি-চাকরে সন্দেহ করিবে বলিয়া হঠাৎ কেহ সাহস করিবে না কাহাকেও পাতায় ভাত দিতে।

দুশো-আড়াইশো টাকা যদি যোগাড় করা যায়, তবে এই রেলবাজারেই আপাতত হোটেল খুলিয়া দেওয়া যায়। টাকা দেয় কে?

যতীশ ভটচাজের কথা তাহার মনে পড়িল।

বেচারী বড় কষ্টে পড়িয়াছে! শেষে কিনা ভায়রাভাইয়ের বাড়ী চলিয়াছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে। লোকে কি সোজা কষ্ট পাইলে তবে কুটুম্বস্থানে যায় চাকুরির উমেদার হইয়া!

যদি সে হোটেল খোলে, যতীশ ভটচাজকে আনিয়া রাখিবে। বৃদ্ধ মানুষ, দুটি

করিয়া খাইতে পারিবে আর কিছু হাত খরচ মিলিবে। ইহার বেশী তাহার আর কিসেরই বা দরকার।

প্রতিদিনের মত আজও বেলা পড়িয়া আসিল। গত দু'বৎসর যেরূপ হইয়া আসিতেছে। সেই একই ঘোড়ানিম গাছ, সেই একই চূর্ণীর খেয়াঘাট, পালেদের সেই একই কয়লার ডিপোতে মুটে ও সরকার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে–সবই পুরাতন।

দিন যায়, কিন্তু তাহার সাধ পূর্ণ হইবার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে।

সামান্য মাইনে হোটেলের–কি হইবে ইহাতে? বাড়ীতে টেঁপিকে একখানা ভাল শখের কাপড় দেওয়া যায় না, পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া যায় না।

টেঁপির মা গরীব ঘরের মেয়ে। যেমন বাপের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, স্বামীর ঘরে আসিয়াও তাই। সংসারে গভীর খাটুনি খাটিয়া ছেলেমেয়ে মানুষ করিতেছে– মুখ ফুটিয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে কোনো আদর-আবদার করে নাই–ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিতেছে, আধপেটা খাইয়া নিজে, ছেলেমেয়েদের জন্য দু-মুঠা বেশী ভাত জল দিয়া রাখিয়া দিতেছে হাঁড়িতে, তাহারা সকাল বেলা খাইবে। কখনো কোনোদিন সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, অদৃষ্টকে নিন্দা করে নাই।

হাজারি সব বোঝে।

তাই তো সে আজকাল সর্ব্বদা একমনে উপায় চিন্তা করে–কি করিয়া সংসারের উন্নতি করা যায়। চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে রাঁধুনীবৃত্তি করিলে কখনও যে উন্নতি করা যাইবে না। আর পদ্ম ঝির ঝাঁটা খাইয়া মাঝে পড়িয়া হাড় কালি হইয়া যাইবে।

ভগবান যদি দিন দেন, তবে তাহার আজীবনের সংকল্প সে কার্যে পরিণত করিবে। হোটেল একখানা খুলিবে।

কুসুমের সঙ্গে এই যে আলাপ হইয়াছে, হাজারি এটাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কুসুম চমৎকার মেয়ে–প্রবাস-জীবনে কুসুমের সাহচর্য্য, তাহার মধুর ব্যবহার–হোক না সে গোয়ালার মেয়ে–কিন্তু বড় ভাল লাগে, আরও ভাল লাগে এইজন্যে যে ঠিক কুসুমের মত স্নেহ প্রবণ কোনো আত্মীয় মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

অনেকখানি যে নির্ভর করা যায় কুসুমের ওপর। সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মনে হয়, এ কাজের ভার কুসুমের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সে প্রতারণা করিবে তো নাই-ই, বরং প্রাণপণ-যত্নে কাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন আপনার লোকে করিয়া থাকে।

হাজারি যদি নিজের দিন ফিরাইতে পারে, তবে কুসুমের দিনও সে অমন রাখিবে

না।

ঢেঁপিও তার মেয়ে, কিন্তু ঢেঁপি বালিকা, কুসুম বুদ্ধিমতী। ও যেন তার বড় মেয়ে–যে বাপের দুঃখকষ্ট সব বোঝে এবং বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে। মন-প্রাণ দিয়া চেষ্টা করে। মেয়েও বটে, বন্ধুও বটে।

সকালে সেদিন রতন ঠাকুর আসিল না।

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল, ও-ঠাকুর আজ আর আসবে না, কাল বলে গিয়েছে; তরকারী গুলো তুমি কুটে নাও, নিয়ে রান্না চাপিয়ে দাও, আমি আঁচ দিয়ে দিচ্চি।

হাজারি প্রমাদ গণিল। আজ হাটবার, দুপুরে অন্তত একশো দেড়শো হাটুরে খরিদ্দার খাইবে; একহাতে তাহাদের রান্না করা এবং খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

পদ্ম ঝিয়ের কথামত সে বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল–বেলা সাড়ে আটটার সময় সবে ডাল-ভাত নামিয়াছে–এমন সময় একজন খরিদ্দার টিকিট লইয়া খাইতে আসিল।

হাজারি বলিল–আজ্ঞে বাবু, সবে ডাল-ভাত নেমেছে, কি দিয়ে খাবেন?

লোকটি রাগিয়া বলিল–নটা বেজেছে, মোটে ডাল-ভাত? কি রকম ঠাকুর তুমি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে এতক্ষণ তিনটে তরকারি হয়ে গিয়েছে। এ রকম করলেই

তোমাদের হোটেল চলেচে?

হাজারি বলিল–ন'টা তো বাজেনি বাবু, সাড়ে-আটটা।

লোকটার মেজাজ রুক্ষ ধরনের। বলিল–আমি বলচি নটা, তুমি বলচো সাড়ে-আটটা! আবার মুখে মুখে তর্ক? আমি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

–সে কথা তো হয় নি বাবু। ঘড়ি কেন দেখতে পাবেন না, আপনারা বড় লোক। কিন্তু ন'টা বাজলে কেষ্টনগরের গাড়ী আসে। সে গাড়ী তো এখনো আসে নি?

–আবার তর্ক? এক চড় মারবো গালে–

বোধ হয় লোকটা মারিয়াই বসিত, ঠিক সেই সময় পদ্ম ঝি গোলমাল শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল–কি হয়েছে বাবু?

লোকটা পদ্ম ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল–তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করচে, কি জানোয়ার। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে এসে আবার লম্বা লম্বা কথা, আজ দিতাম তোমাকে একটি চড় কষিয়ে, টের পেতে তুমি মজা–

পদ্ম ঝি বলিল–যাক বাবু, আপনি ক্ষ্যামা দেন। ওর কথায় চটলে কি চলে? আসুন, আপনি খাবেন এখানে।

--খাবো কি, তোমাদের ঠাকুর বলচে এখনও কিছু রান্না হয় নি। তাই বলতে গেলাম তো আমার সঙ্গে তর্ক। রান্না হয় নি তো টিকিট বিক্রি করেছিলে কেন তোমরা? দেখাবে তোমাদের মজা! যত বদমায়েশ সব।

পদ্ম ঝি ঝাঁজের সহিত বলিল–ঠাকুর, তুমি কি রকম মানুষ? বাবুর সঙ্গে মুখোমুখি তককো করা তোমার কি দরকার ছিল? রান্না কেনই বা হয় না। যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও, আর মাছ ভেজে দাও। যান বাবু আপনি গিয়ে বসুন।

খানিক পরে লোকটা খাওয়া ফেলিয়া বলিল–মাছটা এক্কেবারে পচা। রামো রামো, কেন মরতে এ হোটেলে খেতে এসেছিলুম–ছি ছি–এই ঠাকুর এদিকে এসো–

পদ্ম ঝি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল–কি হয়েছে বাবু, কি হয়েছে?

--কি হয়েছে? যত সব ন্যাকামি? মাছ একদম পচা, লোকজনকে মারবার মতলব তোমাদের–না? আজই রিপোর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের নামে–

রিপোর্টের কথা শুনিয়া পদ্ম ঝির মুখ শুকাইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি বলিল–বাবু, আপনার পায়ে পড়ি বসুন, না খেয়ে উঠবেন না, আমি দই এনে দিচ্চি। একদিন যা হয়ে গিয়েচে ক্ষ্যামা ঘেন্না করে নিন বড় বাবু।

সে তাড়াতাড়ি দই ও বাতাসা আনিয়া দিল। লোকটি খাইয়া উঠিয়া যাইবার সময়

বেচু চক্কত্তি বিনীতসুরে নিতান্ত কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, বাবু একটা কথা আছে, আপনার টিকিটের পয়সাটা ত নিতে পারি নে। আপনার খাওয়াই হোল না। পয়সা ক'আনা আপনি নিয়ে যান।

লোকটা বলিল–না না থাক। পয়সা দিতে হবে না ফেরত–কিন্তু এরকম আর যেন কখনও না হয়।

বেচু চক্কত্তি জোর করিয়া লোকটার হাতে পয়সা কয়েক আনা গুঁজিয়া দিল।

একটু পরে গদির ঘরে হাজারি ঠাকুরের ডাক পড়িল। হাজারি গিয়া দেখিল সেখানে পদ্ম ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বেচু চক্কত্তি বলিল–ঠাকুর, খদ্দেরদের সঙ্গে ঝগড়া করতে কদ্দিন শিখেচ?

হাজারি অবাক হইয়া বলিল–ঝগড়া? কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম বাবু?

পদ্ম ঝি বলিল–ঝগড়া করেছিলে না তুমি ওই বাবুর সঙ্গে? সে মুখোমুখি তককো কি! বাবু তো চড় মারবেনই। আমি গিয়ে না পড়লে দিত কষিয়ে দু-চার ঘা। আগে কি বলেছে না বলেচে আমি তো শুনি নি, গিয়ে দেখি বাবু রেগে লাল হয়ে গিয়েচেন। ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? তখনও সমানে ঝগড়া চালাচ্চে–

বেচু চক্কত্তি বলিল–খদ্দের যাই কেন বলুক না তাই শুনে যেতে হবে, এ তুমি বুড়ো

হয়ে মরতে চল্লে, আজও শিখলে না তুমি?

–বাবু, আপনি শুনে বিচার করুন। ঝগড়া তো আমি করিনি–উনি বল্লেন ন'টা বেজেচে, আমি বল্লাম সাড়ে-আটটা বেজেছে, এই উনি আমায় বল্লেন, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

পদ্ম ঝি বলিল–তোমার সব মিথ্যে কথা ঠাকুর। ও কথায় কখনো ভদ্দর লোক চটে। তুমি বেয়াদপের মত তককো করেচো তাই বাবু চটে গিয়েচেন। আমি গিয়ে স্বকর্ণে শুনিচি তুমি যা তা বলচো।

অবশ্য এখানে পদ্ম ঝিয়ের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলিতে পারে না, এ কথা হাজারি ভাল করিয়া জানিত। বেচু চক্কত্তি মহাশয় কাহারও কথা শুনিবেন না, পদ্ম ঝি যাহা বলিবে তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেনই। সে অগত্যা চুপ করিয়া বহিল।

বেচু চক্কত্তি বলিল–পচা মাছ কে এনেছিল?

হাজারি উত্তর দেবার পূর্বেই পদ্ম ঝি বলিল–ওই গিয়েছিল বাজারে। ওই এনেচে।

হাজারি বিস্ময়ে কাঠ হইয়া গেল। কি সর্বনেশে মিথ্যে কথা! পদ্ম ঝি খুব ভাল করিয়াই জানে, কাল রাত্রে প্রায় দেড়পোয়া আন্দাজ পোনা মাছ উদ্বৃত্ত হইলে, পদ্ম ঝি-ই তাহাকে বলিয়াছিল, মাছগুলা ঢাকিয়া রাখিতে এবং পরদিন কড়া করিয়া

আর একবার ভাজিয়া লইয়া মাছের ঝাল করিতে; তাহা হইলে খরিদ্দার টের পাইবে না যে মাছটা বাসি। বাসি মাছ ভাজা সে খরিদ্দারকে দিতে যায় নাই, পদ্ম ঝি নিজেই ভাজা মাছ দিবার কথা বলিয়াছিল।

কিন্তু এ সব কথা বেচু চক্কত্তিকে বলিয়া কোন লাভ নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল–তোমার আট-আনা জরিমানা হোল। মাইনের সময় কাটা যাবে–যাও।

হাজারি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল–কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, কি অসহ্য অবিচার! সে বাজারে গিয়াছিল ইহা সত্য, মাছ কিনিয়াছিল তাহাও সত্য, কিন্তু সে মাছ পচা নয়, সে মাছ খরিদ্দারের পাতে দেওয়াই হয় নাই। অথচ পদ্ম ঝি দিব্য তাহার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিল, আর সেই মিথ্যা অপরাধে তাহার হইল জরিমানা।

পদ্ম দিদি তাহার সঙ্গে যে কেন এমন করিয়া লাগে–কি করিয়াছে সে পদ্ম দিদির?

রতন ঠাকুর আজ নাই, খাটুনি সবই তাহার ওপর। আট-দশজন লোক ইতিমধ্যে টিকিট কিনিয়া খাবার ঘরে ঢুকিল, চাকরে জায়গা করিয়া দিল। হাজারি তাড়াতাড়ি আলু ভাজিয়া ইহাদের ভাত দিল। তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল, শুধু আলুভাজা আর ভাল দিয়া খাওয়া যায়? ইহারা সকলেই রেলের যাত্রী। স্টেশন হইতে তাহাদের হোটেলের চাকর বলিয়া আনিয়াছে যে একমাত্র তাহাদেরই

হোটেলে এত সকালে সব হইয়া গিয়াছে–মাছের ঝোল, অম্বল পর্যন্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে ডাল আর আলুভাজা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, এ কি অন্যায়– ইত্যাদি।

পদ্ম ঝি দরজার কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল–ও ঠাকুর, দাও না মাছ ভেজে, বাবুরা বলচেন শুনতে পাও না? বাবুরা খাবেন কি দিয়ে?

অর্থাৎ সেই পচা মাছ ভাজা আবার দাও। আজকার মাছ এখনও কোটা হয় নাই পদ্ম তাহা জানে।

হাজারি ঠাকুর কিন্তু পচা মাছ আর খরিদ্দারদের পাতে দিবে না। সে বলিল–ভাজা মাছ আর নেই। যা ছিল ফুরিয়ে গিয়েছে।

পদ্ম ঝি বলিল–তবে একটু বসুন বাবুরা, একখানা তরকারী করে দিচ্ছে, বসুন আপনারা, উঠবেন না।

শিক্ষামত মতি চাকর আসিয়া বলিল–ও ঠাকুর, বনগাঁয়ের গাড়ী আসবার যে সময় হোল, রান্নাবান্না কিছু হোল না এখন? ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে যে।

খরিদ্দারের ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহারাও সেই গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে যাইবে! একজন বলিল–ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে?

মতি চাকর বলিল–হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ। গাড়ী গাংনাপুর ছেড়েচে–এল বলে।

মাছভাজা খাওয়া মাথায় থাকুক–তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিতে পারিলে বাচে। গাড়ী ফেল হইয়া গেলে অনেকক্ষণ আর গাড়ী নাই।

পদ্ম ঝি বলিল–আহা-হা উঠবেন না বাবুরা, ধীরে সুস্থে খান। মাছ ভেজে দাও ঠাকুর, আমি তাড়াতাড়ি কুটে দিচ্ছি। বসুন বাবুরা।

খরিদ্দারেরা উঠিয়া পড়িল–ধীরভাবে বসিয়া খাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চলিয়া যাইতেই পদ্ম ঝি বলিল–যাক, এইবার মাছগুলো কুটি। এত সকালে কোন হোটেলে রান্না হয়েছে? ছ'খানা মাছের গাদা বেঁচে গেল।

এই জুয়াচুরিগুলা হাজারি পছন্দ করে না।

শুধু এখানে বলিয়া নয়, রেল-বাজারের সব হোটেলেই এই ব্যাপার সে দেখিয়া আসিতেছে। খরিদ্দারকে খাওয়াইতে বসাইয়া দিয়া বলে–বাবু, গাড়ীর ঘণ্টা পড়ে গেল। খরিদ্দার আধ পেটা খাইয়া উঠিয়া যায়, হোটেলের লাভ।

ছিঃ–ন্যায্য পয়সা গুনিয়া লইয়া এ কি জুয়াচুরি?

হাজারি ঠাকুর এতদিন এখানে কাজ করিতেছে, কখনো মুখ দিয়া একথা বাহির করে নাই যে ট্রেনের সময় হইয়া গেল।

অনেক সময় ট্রেনের সময় না হইলেও ইহারা মিথ্যা করিয়া ধুয়া তুলিয়া দেয়, যাহাতে খরিদ্দার ব্যস্ত হইয়া পড়ে–অধিকাংশই পাড়াগেঁয়ে লোক, রেলের টাইমটেবিল মুখস্থ করিয়া তাহারা বসিয়া নাই, ইহাদের ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

মতি চাকরকে শিখানো আছে, সে সময় বুঝিয়া রেল গাড়ীর ধুয়া তুলিয়া দিবে–আজ পাঁচবছর হাজারি দেখিয়া আসিতেছে এই ব্যাপার।

নিজের হোটেল যখন সে খুলিবে ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্য এসব হীন ও নীচ কৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায্য পয়সা লইবে, ন্যায্যমত পেট ভরিয়া খাইতে দিবে। এই সব নিরীহ পল্লীবাসী রেলযাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা না লইলে যদি তাহার হোটেল না চলে, না হয় না-ই চলিল হোটেল।

ফাঁকি দেওয়া যায় না হাটুরে খরিদ্দারদের!

আজ মদনপুরের হাট–এখানকারও হাট। পাড়াগাঁ হইতে দুধ ও তরিতরকারী লইয়া বহুলোক আসে–তাহারা অনেকে এখানে খায়। বার বার যাতায়াত করিয়া তাহারা চালাক হইয়া গিয়াছে–মতি চাকর প্রথম প্রথম দু-একবার ইহাদের উপর কৌশল খাটাইতে গিয়া বেকুব বনিয়াছে।

তাহারা বলে–হোক হোক গাড়ীর ঘণ্টা, লাও তুমি। না হয় পরের গাড়ীডায়

যাবানি। তা' বলে সারাদিন খাবার পরে ভাত ফেলে তো উঠতি পারিনে? হ্যাদে লিয়ে এসো আর দু-হাতা ডাল—ও ঠাকুর–

হাটুরে লোকজন খাইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা একটা।

ইহাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত। ইহারা চাষা লোক, খায় খুব বেশী! তা ছাড়া খুব শৌখীন রকমের খাদ্য না পাইলেও ইহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু পেট ভরা চাই।

সাধারণ বাবু-খরিদ্দাররের জন্য যে চাল রান্না হয়, ইহাদের সে চাল নয়। মোটা নাগরা চালের ভাত ইহাদের জন্য বরাদ্দ। ফেন মিশানো ডাল ও একটা চচ্চড়ি। ইহাদের সাধারণত দেওয়া হয় চিংড়ি মাছ বা কুচা মাছ। পোনা মাছ ইহাদের দিয়া পারা যায় না। কুচো চিংড়ি কিছু বেশী দিতেও গায়ে লাগে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় হাজারির নিজের গ্রামের লোকও থাকে–তাহাদের মুখে বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, কিন্তু আজ তাহার গ্রাম হইতে কেহ আসে নাই।

রতন ঠাকুর নাই–একা হাতে এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেশন করিয়া হাজারি নিতান্ত ক্লান্ত দেহে যখন খাইতে বসিবার যোগাড় করিতেছে তখন বেলা প্রায় তিনটার কম নয়। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ পূর্বেই থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, বেচু চক্কত্তি গদিতে বসিয়া এবেলার ক্যাশ মিলাইতেছেন–এই সময় পাশের হোটেলের বংশীধর ঠাকুর আসিয়া বলিল–ও ভাই হাজারি, দুটো ভাত হবে?

বংশীধর মেদিনীপুর জেলার লোক, তবে বহুঁকাল রাণাঘাটে থাকায় কথার বিশেষ কোন টান লক্ষ্য করা যায় না। সে বলিল, আমার এক ভাগ্নে এসেচে হঠাৎ এখন এই তিনটের গাড়ীতে। আজ হাটবার, হাটুরে খদ্দেরদের দল সব খেয়ে গিয়েছে, আমাদের খাওয়াও চুকেছে, তাই বলে দেখে আসি যদি–

হাজারি বলিল -হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দ্যাও গিয়ে, ভাত যা আছে খুব হয়ে যাবে।

বংশীধরের ভাগিনেয় আসিল। চমৎকার চেহারা, আঠারো-উনিশের বেশী বয়স নয়। তাহাকে আসন করিয়া ভাত দিতে গিয়া হাজারি দেখিল ডেকচিতে যা ভাত আছে, তাহাতে দু-জনের কুলায় না। বংশীধরের ভাগিনেয়টি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবান ছেলে, নিশ্চয়ই দুটি বেশ ভাত খায়–তাহারই পেট ভরিবে কিনা সন্দেহ।

হাজারি উহাকেই সব ভাতগুলি বাড়িয়া দিল–ডাল তরকারি যাহা ছিল তাহাও দিল, সে খাইতে খাইতে বলিল–মাছ নেই?

–না বাবা, মাছ সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ এখানকার হাটবার, বড্ড খদ্দেরের ভিড়। মাছের টান, ডাল তরকারির টান, সবেরই টান। তোমার খাওয়ার বড্ড কষ্ট হোল বাবা, তা বোসো দু-পয়সার দই আনিয়ে দিই।

–না না থাক, আপনার দই আনাতে হবে না।

–না বাবা বসো! বংশীধরের ভাগ্নে যা, আমার ভাগ্নেও তাই। পাশাপাশি হোটেল–

এতদিন কাজ করছি।

হাজারি নিজে গিয়া দই আনিয়া দিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল–আচ্ছা মামা, এখানে কোন চাকরি খালি আছে?

–কি চাকরি বাবা?

–এই ধরুন হোটেলের রাঁধুনীগিরি কি এমনি। কাজের চেষ্টায় ঘুরচি। এখানে কিছু হবে মামা?

মামা বলিয়া ডাকিতে ছেলেটির উপর হাজারির কেমন স্নেহ হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল–না বাবা, আমার সন্ধানে তো নেই, কিন্তু একটা কথা বলি। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে যাবে কেন তুমি? দিব্যি সোনার চাঁদ ছেলে। এ লাইনে বড় কষ্ট, এ তোমাদের লাইন নয়। পড়াশুনা কদ্দূর করেচ?

ছেলেটি অপ্রতিভের সুরে বলিল–না মামা, বেশী করি নি। আমাদের গায়ের ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর লেখাপড়া হল না।

–তোমার নামটি কি?

–শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত হাজারির মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, চমৎকার ছেলেটি, ইহার সঙ্গে টেঁপির বিবাহ দিলে বড় সুন্দর মানায়!...

কিন্তু তাহা কি ঘটিবে? ভগবান কি এমন পাত্র টেঁপির ভাগ্যে জুটাইয়া দিবেন।

ছেলেটি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল–আপনার খাওয়া হয়েছে মামা?

–এইবার খেতে বসবো বাবা। আমাদের খাওয়া এইরকম। বেলা তিনটের এদিকে বড় একটা মেটে না, সেইজন্যই তো বলচি বাবা এসব ছ্যাঁচড়া লাইন, তোমাদের জন্যে নয় এসব। রান্না কাজ বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ।

ছেলেটি একটু হতাশ সুরে বলিল–তবে কোন্ লাইন ধরবো বলুন মামা? কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম। আজ ছ'মাস ধরে ঘুরচি। কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। আপনি বলছেন রাঁধুনীর কাজ–কলকাতায় একটা হোটেলের বাইরে লেখা ছিল–দুজন চাকর চাই। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম, বল্লে–কি? আমি বল্লাম–চাকরের কাজ খালি আছে দেখে এসেচি। বল্লে--তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এ কাজ তোমার জন্যে নয়। কত করে বল্লাম, কিছুতেই নিলে না।

হাজারি অবাক হইয়া শুনিতেছিল। বলিল–বলো কি?

–তারপর শুনুন। কোথাও চাকুরি জোটে না। কলকাতায় শেষকালে খেতে পাইনে

এমন হল। দু-একদিন তো না খেয়েই কাটলো। তারপর ভাবলাম, আমার এক মামা রাণাঘাটে হোটেলে কাজ করেন সেখানেই যাই। তাই আজ এলাম–উনি আমার আপন মামা নয়। মায়ের জ্ঞাতি ভাই। তা এখানেও আপনি বলছেন এ লাইন আমার জন্যে নয়–তবে কোথায় যাবো আর কি-ই বা করবো?

ছেলেটির হতাশার সুর এবং তাহার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী হাজারির মনে বড় লাগিল। সে তখনও ভাবিতেছিল–আহা, ছেলেমানুষ! আমার বড় ছেলে সন্তু বেঁচে থাকলে এতদিন এত বড়টা হোত। টেঁপির সঙ্গে ভারি মানায়। সোনার চাঁদ হেন ছেলে! টেঁপি কি আর সে অদেষ্ট করেছে! নাই বা হোল চাকরি। ও গিয়ে টেঁপিকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে হয়ে আমার গায়ের ভিটেতে গিয়ে বসুক–ওকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজে রোজগার করে ওদের খাওয়াবো। জমিজমাও তো আছে কিছু।

খাওয়া শেষ করিয়া বংশীধরের ভাগিনেয়টি চলিয়া গেল বটে কিন্তু হাজারির প্রাণে যেন কি এক অনির্দেশ্য নূতন সুরের রেশ লাগাইয়া দিয়া গেল। তরুণ মুখের ভঙ্গি, তরুণ চোখের চাহনি হইতে এত প্রেরণা পাওয়া যায়?...... জীবনে এ সব নবীন অভিজ্ঞতা হাজারির।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের গাছতলায় নির্জনে বসিয়া সে কত স্বপ্ন দেখিল। নতুন সব স্বপ্ন। টেঁপির সহিত বংশীধরের ভাগিনেয়টির বিবাহ হইতেছে। বাধা কিছুই নাই, তাহাদেরই পালটি ঘর।

টেঁপির ক্ষুদ্র, কোমল হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ হাতে তুলিয়া দিয়াছে... দুই হাত একত্র মিলাইয়া হাজারি মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করিতেছে।...টেঁপির মার চোখ দিয়া আনন্দে জল পড়িতেছে–কি সুন্দর সোনার চাঁদ জামাই!

কেন সে হোটেলে রাঁধুনীগিরি করিতে যাইবে ছেলেবয়সে? হাজারির নিজের হোটেলে জামাই থাকিবে ম্যানেজার, চক্কত্তি মশায়ের মত গদিতে বসিয়া খরিদদারকে টিকিট বিক্রয় করিবে–হিসাবপত্র রাখিবে।

দ্বিগুণ খাটিবার উৎসাহ আসিবে হাজারির–জামাইও যা ছেলেও তাই। অত বড় অত সুন্দর, উপযুক্ত ছেলে। টেঁপির সারাজীবনের আনন্দ ও সাধের জিনিস। ওদের দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রাণপণে খাটিবে। তিন মাসের মধ্যে হোটেল দাঁড় করাইয়া দিবে।

বেলা পড়িল। চূর্ণীর খেয়ায় লোক পারাপার হইতেছে, যাহারা শহরে কেনা-বেচা করিতে আসিতেছিল–এই সময় তাহারা বাড়ী ফেরে।

একবার কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া হোটেলে ফিরিতে হইবে–গাছতলায় বসিয়া আর বেশীক্ষণ আকাশ-কুসুম ভাবিলে চলিবে না। রতন ঠাকুর সম্ভব এবেলাও দেখা দিতেছে না, তাহাকে একাই সব কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু সত্যই কি আকাশ-কুসুম? হোটেল তাহার হইবে না? টেঁপির সঙ্গে ওই ছেলেটির–

যাক। বাজে ভাবনায় দরকার নাই। দেরি হইয়া যাইতেছে।

পদ্ম ঝি বৈকালের দিকে হাজারিকে বলিল–বলি, হ্যাঁগো ঠাকুর, আজ মাছের মুড়োটা কি হ'ল গা? আজ ত কর্তাবাবুর জর। তিনি বেলা এগারোটার মধ্যেই চলে গিয়েছেন– অত বড় মুড়োটার কি একটা টুকরোও চোখে দেখতে পেলাম না–

হাজারি মাছের মুড়োটা লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল। বড় মাছের মুড়ো সাধারণতঃ কর্তার বাসায় যায়, কিন্তু আজ কর্তার অসুখ –তিনি বেশীক্ষণ হোটেলে ছিলেন না –মুড়োটা পদ্ম ঝি নিজের বাড়ী লইয়া যাইত–হাজারি কখনও মুড়ো নিজে খায় নাই– রতনঠাকু খাইয়াছে, পদ্ম ঝি ত প্রায়ই লইয়া যায়–হাজারির দাবি কি থাকিতে পারে না মুড়োর উপর? তাই সে সেটা কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল যখন ছুটি করিয়া চূর্ণীর ঘাটে বেড়াইতে যায় তখন।

পদ্ম ঝিয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাজারি বলিল–কেন গা পদ্মদিদি, এতক্ষণ পরে মুড়োর খোঁজ হল?

–এতক্ষণ পরেই হোক আর যতক্ষণ পরেই হোক–কি হ'ল মুড়োটা?

–আমায় কি একদিন খেতে নেই? তোমরা ত সবাই খাও। আমি আজ খেয়েছি।

–কই মুড়োর কাঁটাচোকডা ত কিছু দেখলাম না? কোথায় বসে খেলে?

হাজারির বিব্রত ভাব পদ্ম ঝিয়ের চোখ এড়াইল না। সে চড়াগলায় বলিল–খাও নি তুমি। খেলে কিছু বলতাম না। তুমি সেটা লুকিয়ে বিক্রী করেছ–কেমন ঠিক কথা কি না? চোর, জুয়াচোর কোথাকার– হোটেলের জিনিস নুকিয়ে নুকিয়ে বিক্রী? আচ্ছা, তোমার চুরির মজা টের পাওয়াচ্ছি–আসুক কর্তা–

হাজারি বলিল–না পদ্ম দিদি, বিক্রী করব কাকে? রাঁধা মুড়ো কে নেবে? সত্যি আমি খেয়েছি।

–আবার মিথ্যে কথা? আমি এতকাল হোটেলে কাজ করে হাতে ঘাটা পড়িয়ে ফেলনু, মাছের মুড়োর কাঁটাচোকডা আমি চিনিনে–না? অত বড় মুড়োটা চার আনার কম বিক্রী কর নি। জমা দাও সে পয়সা গদিতে, ওবেলা নইলে দেখো কি হাল করি কর্তার সামনে।

–আচ্ছা নিও চার আনা পয়সা–আমি দেব। একটু মুড়ো খেয়ে যদি দাম দিতে হয়–তাও নিও।

পদ্ম ঝি একটুখানি নরম হইয়া বলিল–তা হলে বেচেছিলে ঠিক?

–না পদ্ম দিদি।

–তবে কি করলে ঠিক করে বল

–তোমার ত পয়সা পেলেই হ'ল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

–দরকার আছে তাই বলচি–কোথায় গেল মুড়োটা? বলো–নইলে কর্তার সামনে তোমার অপমান করব। বল এখনো–

–আমি খেয়েছি।

–আবার? আমার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ঠাকুর? আমি এবার বুঝতে পেরেছি মুড়ো কোথায় গেল।–তোমার সেই–

হাজারি জানে পদ্ম ঝি বলিতে যাইতেছে–সে পদ্ম ঝিয়ের মুখের কথা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল–পদ্ম দিদি, তোমাদের ত খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছি গরীব বামুন। কেন আর ও সামান্য জিনিস নিয়ে বকাঝকা কর?

এ কথায় পদ্ম ঝি নরম না হইয়া বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। বলিল–নিজে খেলে কিছু বলতাম না ঠাকুর–কিন্তু হোটেলের জিনিস পর দিয়ে খাওয়ান সহ্যি হয় না। এর একটা বিহিত না করে আমি যদি ছাড়ি তবে আমার নামে কুকুর পুষো, এই বলে দিচ্ছি সোজা কথা।

হাজারি ভয়ে ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল–নিজের জন্য নয়, কুসুমের জন্য। পদ্ম ঝিয়ের অসাধ্য কাজ নাই–সে না জানি কি করিয়া বসিবে–কুসুমের শাশুড়ীর

কানে–হয়ত কত রকমের কথা উঠাইবে, তাহার উপরে যদি কুসুমের বাপের বাড়ী অর্থাৎ তাহার গ্রামে সে কথা গিয়া পৌঁছায়–তবে উভয়েরই লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিবে সেখানে। অথচ কুসুম নিরপরাধিনী। পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিয়া চিন্তিয়া রতনঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। তাহার আত্মীয়কে বিনা পয়সায় খাওয়ার ষড়যন্ত্রের মধ্যে হাজারি ছিল–সুতরাং রতন হাজারির দিকে টানিত। সে বলিল–তুমি কিছু ভেব না হাজারি দা, পদ্ম দিদিকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। মুড়ো বাইরে নিয়ে যাবে, তা আমায় একবারখানি জানালে হ'ত নি? তোমায় কত বুঝিয়ে পারব আমি?

কিছু পরে সন্ধ্যার দিকে বেচু চক্কত্তি আসিলেন। চাকর হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা হাতে লইয়া বেচু চক্কত্তি বলিলেন–ধুনো গঙ্গাজল দে আগে–আর পদ্মকে বাজারের ফর্দ দিতে বলে দে–

কয়লাওয়ালা মহাবীর প্রসাদ বসিয়াছিল পাওনার প্রত্যাশায়–তাহাকে বলিলেন–সন্ধ্যের সময় এখন কি? ওবেলা ত সাড়ে বার আনা নিয়ে গিয়েছ, আবার এবেলা দেওয়া যায়? কাল এসো। তোমার কি?

একটি রোগা কালো মত লোক হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল–বাবু সেদিন কুমড়ো দিয়েলাম–তার পয়সা।

–কুমড়ো? কে কুমড়ো নিয়েছে?

–আজ্ঞে বাবু, আপনাদের হোটেলে দিয়ে গিয়েলাম–ছ’আনা দাম বলেলাম, তা তিনি বললেন–পাঁচগণ্ডা পয়সা হবে। তা বলি, ভদ্দর নোকের কথা–তাই দ্যান। তিনি বললেন–আজ নয়, বুধবারে এসে নিয়ে যেওয়ানে–তাই এ্যালাম

–ছ’আনা পয়সার কুমড়ো ধারে নিয়েছে কে–খাতায় কি বাজারের ফর্দের মধ্যে ত ধরা নেই, এ ত বাপু আশ্চর্য কথা। আমরা ধারে জিনিসপত্তর খরিদ করি নে। যা কিনি তা নগদ। কে তোমার কাছে কুমড়ো নিলে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

বেচু রতন ও হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–তাহারা কুমড়ো কেনা ত দূরের কথা–গত পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কুসুড়ার তরকারিই রাঁধে নাই, বলিল–কোন কুমড়া চক্ষেও দেখে নাই এই কয়দিনে।

কথাবার্তার মধ্যে পদ্ম ঝি বাজারের ফর্দ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কুমড়োওয়ালা বলিয়া উঠিল— এই যে! ইনিই তো নিয়েলেন! সেই কুমড়ো মা ঠাকরণ।–বলেলেন বুধবারে আসতি–তাই আজ এলাম। বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কুমড়ো কে নিয়েলেন–

পদ্ম ঝি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল–হ্যাঁ, কুমড়ো নিয়েছিলাম তা কি হবে? পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে কি পালিয়ে যাব? দিয়ে দাও ত কর্তাবাবু ওর পয়সা মিটিয়ে–আমি এর পরে–বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া কুমড়োওয়ালাকে পয়সা মিটাইয়া দিলেন, সে চলিয়া গেল।

রতনঠাকুর আড়ালে গিয়া হাজারিকে বলিল–হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল পদ্মদিদি–কিন্তু কর্তাবাবুর দরদটা একবার দেখেছ ত হাজারি-দা?

–ও আর দেখাদেখি কি, দেখেই আসছি। আমি যদি কুমড়ো নিতাম তবে পদ্মদিদি আজ রসাতল বাধাত–কর্ত্তাবাবুও তাতেই সায় দিত। এ ত আর তুমি আমি নই? এ হোটেলে পদ্মদিদিই মালিক। তুমি এইবার একবার বল পদ্মদিদিকে মুড়োর কথাটা। নইলে ও এখুনি লাগাবে কর্ত্তাকে।

রতন পদ্ম ঝিকে আড়ালে বলিল–ও পদ্মদিদি, গরীব বামুন তোমাদের দোরে করে খাচ্ছে–কেন আর ওকে নিয়ে অমন করো? একটা মুড়ো যদি সে খেয়েই থাকে–এতদিন খাটছে এখানে, তা নিয়ে তাকে অপমান করো না। সবাই ত নেয়–কেউ ত নিতে ছাড়ে না–আমি নিইনে না তুমি নাও না? বেচারীকে কেন বিপদে ফেলবে?

পদ্ম ঝি বলিল–ও খায়নি–ও এখান থেকে বের করে ওর সেই পেয়ারের কুসুমকে দিয়ে এসেছে–আমি কচি খুকী? কিছু বুঝি নে? নচ্ছার বদমাইশ লোক কোথাকার–

রতন হাসিয়া বলিল—যা বোঝে সে করুক গিয়ে পদ্মদিদি–তোমার আমার কি? সে মুড়ো নিজে খায়,–পরকে দেয় তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি কিছু বোল না আজ আর ওকে।

পদ্ম ঝি কুমড়োর ব্যাপার লইয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল–নতুবা সে রতনের কথা এত সহজে রাখিত না। বলিল–তাহলে বারণ করে দিও ওকে–বারদিগর যেন এমন আর না করে। তাহলে আমি অনত্থ বাধাবো–কারোর কথা শুনবো না।

সে রাত্রে হোটেলের কাজকর্ম চুকাইয়া হাজারি চূর্ণীর ধারে বেড়াইতে গেল। দিব্য জ্যোৎস্না-রাত–প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ কি সর্বনাশই আর একটু হইলে হইয়াছিল! তাহার নিজের জন্য সে ভাবে না, ভাবে কুসুমের জন্য। কুসুম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে–সেখানে তার বদনাম রটিলে উভয়েরই সেখানে মুখ দেখানো চলিবে না। আর তাহার এই বয়সে এই বদনাম রটিলে লোকেই বা বলিবে কি?

কুসুমকে সে মেয়ের মত দেখে–ভগবান জানেন। ওসব খেয়াল তাহার থাকিলে এই রাণাঘাট শহরে সে কত মেয়ে জুটাইতে পারিত। এই রাধাবল্লভতলার মাটি ছুঁইয়া সে বলিতে পারে জীবনে কোনদিন ওসব খেয়াল তার নাই। বিশেষতঃ কুসুম। ছিঃ ছিঃ-টেঁপির সঙ্গে যাহাকে সে অভিন্ন দেখে না–তাহার সম্বন্ধে রতন ঠাকুরের কাছে পদ্ম ঝি যে সব বিশ্রী কথা বলিয়াছে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাত প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। শহর নিযুক্তি হইয়া গিয়াছে, কেবল কুণ্ডুদের চূর্ণীর ধারে কাঠের আড়তে হিন্দুস্থানী কুলীরা ঢোলক বাজাইয়া বিকট চিৎকার শুরু করিয়াছে–ওই উহাদের নাকি গান! যখন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস আসিয়া দাঁড়ায়

স্টেশনে তখন সে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে–আর এখন স্টেশন পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ এত রাত্রে কোনো ট্রেন আসে না। রাত চারটা হইতে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হইবে।

হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া মতি চাকরের ঘুম ভাঙাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বড় গরম–স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে না হয় বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়া যাক। আজ রাত্রে ঘুম আসিতেছে না চোখে।

ভোরে উঠিয়া হোটেলের সামনে আসিয়া হাজারি দেখিল হোটেলের দরজা এখনও বন্ধ। সে একটু আশ্চর্য্য হইল। মতি চাকর তো অনেকক্ষণ উঠিয়া অন্যদিন দরজা খোলে। ডাকাডাকি করিয়াও কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না–তারপর গদির ঘরের জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিতে গিয়া হাজারি লক্ষ্য করিল–বাসনের ঘরের মধ্যে অত আলো কেন?

ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল বাসনের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কেহই নাই। মতি চাকরেরও সাড়াশব্দ নাই কোনদিকে। এরকম তো কখনো হয় না।

এমন সময় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে একটা চায়ের স্টলও আছে–খুব সকাল হইতেই সেখানে চা বিক্রী শুরু হয়।

হাজারির ডাকে নিমাই আসিল। দুজনে ঘরের মধ্যে ঝুঁকিয়া দেখিল মতি চাকর খাবার ঘরে শুইয়া দিব্যি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। উভয়ের ডাকে মতি ধড়মড়

করিয়া উঠিল।

হাজারি বলিল–মতি দোর খোলা কেন?

মতি বলিল–তা তো আমি জানি নে! তুমি রাত্তিরে ছিলে কোথায়? দোর খুললে কে?

তিনজনে ঘরের মধ্যে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিল। হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল– হাজারি দা, সর্বনাশ! থালা বাসন কোথায় গেল? একখানও তো দেখছি নে!

–সে কি!

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো ঘরেই বাসনের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিমাই বলিল–চায়ের দুধটা দিয়ে আসি হাজারি-দা, বাসন সব চক্ষুদান দিয়েচে কে। তোমাদের কর্তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর আসিল। সে-ই গিয়া বেচু চক্কত্তিকে ডাকিয়া আনিল। পদ্ম ঝিও আসিল। চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া পাশের হোটেল হইতে যদু বাঁড়ুয্যে আসিলেন, বাজারের লোকজন জড় হইল–থানায় খবর দিতে তখনি, এ. এস. আই নেপালবাবু ও দুজন কনস্টেবল আসিল। হৈ হৈ বাধিয়া গেল। বেচু চক্কত্তি মাথায় হাত দিয়া ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছেন, প্রায় ষাট-সত্তর টাকার থালা বাসন চুরি গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–হাজারি রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে বাবু। বড্ড গরম হচ্ছিল–তাই ঘাটের ধার থেকে ফিরে ওখানেই রাত কাটালাম।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,–কত রাত্রে প্ল্যাটফর্মে শুয়েছিলে? কোন প্ল্যাটফর্মে?

–আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চির ওপর।

–তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল?

–না বাবু, তখন অনেক রাত।

–কত?

–দেড়টার বেশী।

-এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

–রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি দুবেলাই চূর্ণীর খেয়াঘাটে গিয়ে বসি। কালও সেখানে ছিলাম।

–আর কোনো দিন হোটেল ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে শুয়েছিলে?

–মাঝে মাঝে শুই, তবে খুব কম।

এই সময় বেচু চক্কত্তিকে পদ্ম ঝি চুপি চুপি কি বলিল। বেচু চক্কত্তি নেপালবাবুকে বলিলেন, দারোগাবাবু, একবার ঘরের মধ্যে একটা কথা শুনে যান দয়া করে–

ঘরের ভিতর হইতে কথা শুনিয়া আসিয়া নেপালবাবু বলিলেন–হাজারি ঠাকুর, তুমি কুসুমকে চেন?

হাজারির মুখ শুকাইয়া গেল। ইহার মধ্যে ইহারা কুসুমের কথা আনিয়া ফেলিল কেন? কুসুমের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক?

হাজাবির মুখের ভাব নেপালবাবু লক্ষ্য করিলেন।

হাজারির উত্তর দিতে একটু দেরি হইতেছিল, নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন— কথার জবাব দাও?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে মুখে আঁচল চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাজারি

বুঝিল–কুসুমের কথা সে-ই কর্তাকে বলিয়াছে নতুবা তিনি অতশত খোঁজখবর রাখেন না। কর্ত্তামশায় দারোগাকে বলিয়াছেন কথাটা–সে ওই পদ্ম ঝিয়ের উসকানিতে।

–কুসুম থাকে কোথায়?

–গোয়ালপাড়ায়, বড় বাজারের দিকে।

–সে কি করে?

–দুধ-দই বেচে। গরীব লোক–

–বয়েস কত?

–এই চব্বিশ-পঁচিশ–

পদ্ম ঝি একটু মুচকি হাসিল এই উত্তর শুনিয়া, হাজারির তাহা চোখ এড়াইল না। দারোগাবাবুর প্রশ্নের গতি তখনও সে বুঝিতে পারে নাই–কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের মুখের মুচকি হাসি দেখিয়া সে বুঝিল কেন ইহারা কুসুমের কথা এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

–তোমার সঙ্গে কুসুমের কত দিনের আলাপ?

–সে আমার গায়ের মেয়ে। সে যখন ছেলেমানুষ তখন থেকে তাকে জানি। তার বাবা আমার বন্ধুলোক–আমাদের পাড়ার পাশেই–

–কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই দেখাশোনা কর–না?

–মাঝে মাঝে দেখা করি বৈকি–গাঁয়ের মেয়ে, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার–নেপালবাবু হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই দরকার। এখানে তার শশুরবাড়ী?

–আজ্ঞে হাঁ।

–স্বামী আছে?

-না, আজ বছর চার-পাঁচ মারা গিয়েছে–শাশুড়ী আছে বাড়ীতে। এক দেওর-পো আছে।

–তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আস?

লজ্জায় ও সঙ্কোচে হাজারি যেন কেমন হইয়া গেল। এসব কথা এখানে কেন?

পদ্ম ঝি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই মুখে আঁচল চাপা দিল। নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন–আঃ, হাসি কিসের? এটা হাসির জায়গা নয়। চুপ–

কিন্তু দারোগাবাবু ধমক দিলে কি হইবে–পদ্ম ঝিয়ের হাসি সংক্রামক হইয়া উঠিয়া উপস্থিত লোকজন সকলেরই মুখে একটা চাপা হাসির ঢেউ আনিয়া দিল। অন্য লোকের হাসি হাজারি তত লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের হাসিতে সে কিসের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঠাওর করিয়া মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল–দারোগাবাবু, সে গরীব লোক, আমাদের গায়ের মেয়ে, সে আমাকে বাবা বলে ডাকে–আমার সে মেয়ের মত–তাই মাঝে মাঝে কোনদিন একটু-আধটু তরকারী কি রাঁধা মাংস তাকে দিয়ে আসি। কত তো ফেলা-ঝেলা যায়, তাই ভাবি যে একজন গরীব মেয়ে–

–বুঝেছি, থাক আর তোমার লেকচার দিতে হবে না। কাল রাত্রে তুমি সেখানে গিয়েছিলে?

–আজ্ঞে না বাবু।

–আজ সকালে গিয়েছিলে?

-না বাবু, সকালে প্ল্যাটফর্ম থেকেই হোটেলে এসেছি।

দারোগাবাবু অন্য সকলের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল মতি চাকর ও হাজারিকে বলিলেন–আমার সঙ্গে তোমাদের থানায় যেতে হবে। কনস্টেবলদের বলিলেন –এদের ধরে নিয়ে চল।

মতি কান্নাকাটি করিতে লাগিল–একবার বেচু চক্কত্তি, একবার দারোগাবাবুর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ–ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া কি ফল?–ইত্যাদি।

হাজারির প্রাণ উড়িয়া গেল থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া।

এ কি বিপদে ভগবান তাহাকে ফেলিলেন?

থানা-পুলিস বড় ভয়ানক ব্যাপার, মোকদ্দমা হইলে উকীল দিবার ক্ষমতা হইবে না তাহার, বিনা কৈফিয়তে জেল খাটিতে হইবে–কত বছর তাই বা কে জানে? না খাইয়া স্ত্রীপুত্র মারা পড়িবে। জেলখাটা আসামীকে ইহার পর চাকুরিই বা দিবে কে?

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার, যদি ইহারা কুসুমকে ইহার মধ্যে জড়ায়? জড়াইবেই বোধ হয়। হয়তো কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে চাহিবে।

নিরপরাধিনী কুসুম! লজ্জায় ঘৃণায় তাহা হইলে সে হয়তো গলায় দড়ি দিবে। আরও কত কি কথা লোকে রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা তো গেলে তাহার নিজেরও আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকবে না।

কখনও সে একটা বিড়ি-দেশলাই কাহারও চুরি করে নাই জীবনে–সে করিবে

হোটেলের বাসন চুরি! নিজের মুখের জিনিস নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে কুসুমকে মাঝে মাঝে দিয়া আসে বটে–চুরির জিনিস নয় সে সব। সে খাইত, না হয় কুসুম খায়।

থানায় গিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই হাজারি ও মতি বসিয়া রহিল। হাজারি শুনিল বেচু চক্কত্তি ও পদ্ম ঝি দুজনেই বলিয়াছে উহাদের উপরই তাহাদের সন্দেহ হয়। সুতরাং পুলিস তো তাহাদের ধরিবেই।

থানার বড় দারোগা থানায় ছিলেন না–বেলা একটার সময় তিনি আসিয়া চুরির সব বিবরণ শুনিয়া হাজারি ও মতিকে তাহার সামনে হাজির করিতে বলিলেন। হাজারি হাত জোড় করিয়া দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন–হোটেলে কতদিন কাজ করচ?

–আজ্ঞে বাবু, ছবছর।

–বাসন চুরি করে কোথায় রেখে দিয়েচ?

–দোহাই বাবু–আমার বয়েস ছচল্লিশ-সাতচল্লিশ হোল–কখনো জীবনে একটা বিড়ি কারো চুরি করিনি।

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন–ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আর ওই চাকর বেটা দুজনে মিলে যোগসাজসে চুরি করেচ। স্বীকার করো–

–বাবু আমি এর কোনো বার্তা জানি নে! আমি সে রাত্তিরে হোটেলেই ছিলাম না।

–কোথায় ছিলে?

–ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ছিলাম সারারাত।

–কেন?

–বাবু, আমি খাওয়া-দাওয়া করে চূর্ণীর ঘাটে বেড়াতে যাই রোজ। বড্ড গরম ছিল বলে সেখানে একটু বেশী রাত পর্যন্ত ছিলাম–ফিরে এসে দেখি দরজা বন্ধ, তাই ইষ্টিশানে–

এই সময় নেপালবাবু ইংরাজিতে বড় দারোগাকে কি বলিলেন। বড় দারোগা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন-ও। আচ্ছা– তুমি কুসুম বলে কোনো মেয়েমানুষের বাড়ী যাতায়াত করো?

বাবু, কুসুম আমার গায়ের মেয়ে। গরীব বিধবা, তাকে আমি মেয়ের মতো দেখি–সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে, বাবার মত ভক্তিছেদ্দা করে। যদি সেখানে গিয়ে থাকি, তাহোলে তাতে দোষের কথা কি আছে বাবু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। একথা লাগিয়েছে আমাদের হোটেলের পদ্ম ঝি–সে আমাকে দুচোখ পেড়ে দেখতে পারে না কুসুমকেও দেখতে পারে না। আমাদের নামে নানারকম বিচ্ছিরি কথা

সে-ই রটিয়েছে। আপনিই হাকিম-দেবতা। আর মাথার ওপর চন্দ্র সূয্যি রয়েচেন–আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হোতে গেল–আমার সেদিকে কখনো মতিবুদ্ধি যায়নি বাবু। আমি তাকে মেয়ের মত দেখি–তাকে এর মধ্যে জড়াবেন না–সে গেরস্তর বৌ–মরে যাবে ঘেন্নায়।

বড় দারোগা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক। হাজারির চোখমুখের ভাব দেখিয়া তাহার মনে হইল লোকটা মিথ্যা বলিতেছে না।

বড় দারোগা মতি চাকরকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জেরা করিলেন। তাহার কাছেও বিশেষ কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না–তাহার সেই এক কথা, ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইতেছিল, সে কিছুই জানে না।

বড় দারোগা বলিলেন–দু-জনকেই হাজতে পুরে রেখে দাও–এমনি এদের কাছে কথা বেরুবে না–কড়া না হোলে চলবে না এদের কাছে।

হাজারি জানে এই কড়া হওয়ার অর্থ কি। অনেক দুঃখ হয়তো সহ্য করিতে হইবে আজ। সব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত আছে যদি কুসুমের নাম ইহারা আর না তোলে।

বেলা দুইটার সময় একজন কনস্টেবল আসিয়া কিছু মুড়ি ও ছোলা-ভাজা দিয়া গেল। সকাল হইতে হাজারি কিছুই খায় নাই–সেগুলি সে গোগ্রাসে খাইয়া ফেলিল।

বেলা চারটার সময় রতন ঠাকুর হোটেল হইতে হাজারির জন্য ভাত আনিল।

বলিল–আলাদা করে বেড়ে রেখেছিলাম, লুকিয়ে নিয়ে এলাম হাজারি-দা। কেউ জানে যে তোমার জন্যে ভাত আনচি।

বড় দারোগার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া রতন ঠাকুর হাজতের মধ্যে ভাত লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মতির ভাত আনিবার কথা তাহার মনে ছিল না–হাজারি বলিল–ওই ভাত দু-জনে ভাগ করে খাবো এখন।

রতন বলিল–হোটেলে মহাকাণ্ড বেধে গিয়েছে। একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, সে কাজের বহর দেখে এবেলাই পালিয়েচে। খদ্দের অনেক ফিরে গিয়েছে। পদ্ম বলছে তুমি আর মতি দুজনে মিলে এ চুরি করেচ। কুসুমের বাড়ী থানাতল্লাস না করিয়ে পদ্ম ছাড়বে না বলচে। সেখানে বাসন চুরি করে তুমি রেখে এসেচ। কর্তারও তাই মত। তুমি ভেবো না হাজারি-দা–মোকদ্দমা বাধে যদি আমি উকিল দেবো তোমার হয়ে। টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুমি এ কাজ করনি আমি তা জানি। আর কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কি ধরণের লোক।

হাজারি রতনের হাত ধরিয়া বলিল– ভাই আর যা হয় হোক–কুসুমের বাড়ী যেন খানা-তল্লাস না হয় এটা তোমাকে করতে হবে। কোনো উকিলের সঙ্গে না হয় কথা বলো, আমার দুমাসের মাইনে পাওনা আছে–আমি না হয় তোমাকে দেবো।

রতন হাসিয়া বলিল–তোমার সেই মাইনে আবার দেবে ভেবেচ কর্তাবাবু? তা নয়–সে তুমি দ্যাও আর নাই দ্যাও–আমি উকীল দেবো তুমি ভেবো না। কত পয়সা রোজগার করলাম জীবনে হাজারি-দা-এক পয়সা তো দাঁড়াল না। সংকাজে দুপয়সা খরচ হোক।

হাজারি বলিল–মতিকে তাহোলে ভাত দিয়ে এস–সে অন্য ঘরে কোথায় আছে।

রতন বলিল–মতিকে আমার সন্দেহ হয়।

–না বোধ হয়। ও যদি চুরি করবে তো অমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে পারে নাক ডাকিয়ে? আর ও সেরকম লোক নয়।

রতন ভাতের থালা লইয়া চলিয়া গেল।

.

আরও পাঁচ-ছ'দিন হাজারি ও মতি হাজতে আটক থাকিল। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না–সুতরাং চুরির চার্জশীট দেওয়া সম্ভব হইল না।

ছ'দিনের দিন দুজনেই খালাস পাইল।

মতি বলিল–হাজারি-দা, এখন কোথায় যাওয়া যায়? হোটেলে কি আমাদের আর নেবে?

হাজারিও জানে হোটেলে তাহাদের চাকুরি গিয়াছে। কিন্তু সেখানে দু'মাসের মাহিনা বাকি–বেচু চক্কত্তির কাছে গিয়া মাহিনা চাহিয়া লইতে হইবে।

বেলা তিনটা। এখন হোটেলে গেলে কর্তা মশাই থাকিবেন না–সুতরাং হাজারি সন্ধ্যার পরে হোটেলে যাইবে ঠিক করিল। কতদিন চূর্ণীর ধারে যায় নাই–রাধাবল্লভতলায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সে আপন মনে চূর্ণীর ধারে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসিয়া হাজারির মনে পড়িল, সে এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায় নাই। রতন হাজতে রোজ ভাত দিয়া যাইত, আজ দুদিন সে আর আসে নাই–কেন আসে নাই কে জানে, হয়তো পদ্ম জানিতে পারিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে–কিংবা হয়তো তাহাদের ভাত আনিয়া দেওয়ার অপরাধে তাহারও চাকুরি গিয়াছে।

একটা পয়সা নাই হাতে যে কিছু কিনিয়া খায়। হাজতের ভাত হাজারি এক দিনও খায় নাই–আজও একজন কনস্টেবল ভাত আনিয়াছিল, সে বলিয়াছিল–তেওয়ারিজি, আমায় দুটি মুড়ি বরং এনে দিতে পারো, আমার জ্বর হয়েছে, ভাত খাবো না।

বেলা বারোটার সময় সামান্য দুটি মুড়ি খাইয়াছিল–আর কিছু পেটে যায় নাই

সারাদিন। সন্ধ্যার পরে হোটেলে গিয়া দুটি ভাত খাইবে এখন, সেই ভালো।

হাজারির সন্দেহ হয় বাসন আর কেহ চুরি করে নাই, পদ্ম ঝির নিজেরই কাজ। ক'দিন হাজতে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া তাহার মনে হইয়াছে, পদ্ম অন্য কোন লোকের যোগসাজসে এই কাজ করিয়াছে। ও অতি ভয়ানক চরিত্রের মেয়েমানুষ, সব পারে। গত বৎসর খদ্দেরদের কাপড়ের ব্যাগ যে চুরি হইয়াছিল–সেও পদ্ম ঝিয়ের কাজ–এখন হাজারির ধারণা জন্মিয়াছে।

এরকম ধারণা সে বিদ্বেষবশত করিতেছে না, গত ছ বৎসর হাজারি পদ্ম ঝিয়ের এমন অনেক কাণ্ড দেখিয়াছে যাহা সে প্রথম প্রথম তত বুঝিত না–কিন্তু এখন দুয়ে দুয়ে যোগ দিয়া সে অনেকটাই বুঝিয়াছে।

বৃদ্ধ বেচু চক্কত্তি পদ্ম ঝিয়ের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে–দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না, হোটেলটির যে কি সর্বনাশ করিতেছে পদ্ম দিদি, তাহা তিনি এখন না বুঝিলেও পরে বুঝিবেন।

রতন ঠাকুর ও সেদিন ভাত দিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে।

–হাজারিদা, হোটেলের অর্ধেক জিনিস পদ্মদিদির ঘরে–আজকাল বাজারের জিনিস পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করেছে। সেদিন দেখলে তো কুমড়োর কাণ্ড? চুষে খাবে এমন সাজানো হোটেলটা বলে দিচ্চি। পদ্ম দিদির কেন অত টান বাড়ীর ওপরে–তাও আমি জানি। তবে বলিনে, যাহোক আট টাকা মাইনের চাকরিটা করি–এ বাজারে

হঠাৎ চাকরিটা অনত্থক খোয়াবো?

সন্ধ্যার পরে হাজারি হোটেলের গদিঘর দিয়া ঢুকিতে সাহস না করিয়া রান্নাঘরের দিকের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিল। ভাবিয়াছিল রান্নাঘরে রতন ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে–কিন্তু একজন অপরিচিত উড়িয়া ঠাকুরকে ভাত রাঁধিতে দেখিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই বাহির হইয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছে–এমন সময় খরিদ্দারদের খাবার ঘর হইতে পদ্ম ঝি বলিয়া উঠিল–কে ওখানে? কে যায়?

হাজারি ফিরিয়া বলিল–আমি পদ্মদিদি

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বলিল–আমি?-কে আমি?-ও। হাজারি ঠাকুর।...তুমি কি মনে করে? চলে যাচ্চ কোথায় অত তাড়াতাড়ি? ঢুকলেই বা কেন আর বেরুচ্ছই বা কেন?

–আজ হাজত থেকে খালাস পেয়েছি পদ্মদিদি। কোথায় আর যাবো, যাবার তো জায়গা নেই কোথাও–হোটেলেই এলাম, খিদে পেয়েচে–দুটো ভাত খাবো বলে। রান্নাঘরে এসে দেখি রতন ঠাকুর নেই, তাই সামনে দিয়ে গদিঘরে যাই–

–তা যাও গদিঘরে! এই খদ্দেরের খাবার ঘর দিয়েই যাও—

হাজারি সঙ্কুচিত অবস্থায় হোটেলের খাবার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিয়া গদির ঘরে গেল। পদ্ম ঝি গেল পিছু পিছু।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন– এই যে, হাজারি যে! কি মনে করে?

হাজারি বলিল–আজ্ঞে কর্ত্তামশায়, পুলিসে ছেড়ে দিলে আজ–তাই এলাম। যাবো আর কোথায়? আপনার দরজায় দুটো ক'রে খাই। তা ছেড়ে আর কোথায় যাবো বলুন?

বেচু চক্কত্তি কোনো উত্তর দিবার আগেই পদ্ম ঝি আগাইয়া আসিয়া বেচু চক্কত্তিকে বলিল–ওকে আর একদণ্ড এখানে থাকতে দিও না কর্তাবাবু–এখুনি বিদেয় করো। বাসন ও আর মতি যোগসাজসে নিয়েছে। পাকা চোর, পুলিসে কি করবে ওদের?

হাজারি এবার রাগিল। পদ্ম ঝিকে কখনও সে এ সুরে কথা বলে নাই। বলিল–তুমি দেখেছিলে বাসন নিতে পদ্ম দিদি?

পদ্ম ঝি বলিল–তোমার ও চোখ-রাঙানির ধার ধারে না পদ্ম, তা বলে দিচ্ছি হাজারি ঠাকুর। অমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না–বাসন তোমাকে নিতে দেখলে হাতের দড়ি তোমার খুলতো না তা জেনে রেখো।

হাজারি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে ততক্ষণ। নীচু হওয়াই তাহার অভ্যাস-যাহারা বড়, তাহাদের কাছে আজীবন সে ছোট হইয়াই আসিতেছে–আজ চড়া গলায় তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সাহস তাহার আসিবে কোথা হইতে?

সেরকম সুরে বলিল–না না, রাগ করছো কেন পদ্ম দিদি–আমি এমনিই বলচি, বাসন নিতে যখন তুমি দ্যাখোনি–তখন আমি গরীব বামুন, তোমাদের দোরে দুটো করে খাই– কেন আর আমাকে–

এইবার বেচু চক্কত্তি কথা বলিলেন।

একটু নরম সুরে বলিলেন–যাক, যাক, কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমার বাসন তাতে ফিরবে না। দুজনেই থামো। তারপর তুমি বলছ কি এখন হাজারি?

–বলচি, কর্ত্তা, আমায় যেমন পায়ে রেখেছিলেন, তেমনি পায়ে রাখুন। নইলে না খেয়ে মারা যাবো। বাবু, চোর আমি নই, চোর যদি হতাম, আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম না আর।

পদ্ম ঝি বলিল–চোর কিনা সে কথায় দরকার নেই–কিন্তু তোমার এখানে জায়গা আর হবে না। তা হোলে খদ্দের চলে যাবে।

বেচু বলিলেন–তা ঠিক।–খদ্দের চলে গেলে হোটেল চালাবো কি করে আমি? হাজারি এ যুক্তির অর্থ বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ঠাকুর চোর হইলে সে না হয় হোটেলের জিনিস চুরি করিতে পারে, কিন্তু খরিদ্দারদের গায়ের শাল খুলিয়া বা তাহাদের পকেট মারিয়া লইতেছে না তো–তবে খরিদ্দারের আসিতে আপত্তি কি?

কিন্তু হাজারি এ প্রশ্ন উঠাইতে পারিল না। তাহার জবাব হইয়া গেল। সে কিছু খাইয়াছে কি না এ কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে সে বলিল–তা হোলে আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, দু'মাসের তো বাকী পড়ে রয়েচে, হাওলাত নেই কিছু। খাতা দেখুন।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–সে এখন হবে না, এর পরে এসো।

পদ্ম একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলে। সে বলিল–ওর আশা ছেড়ে দাও, মাইনে পাবে না।

–কেন পাব না?

পদ্ম ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল–সে তককো তোমার সঙ্গে করবার সময় নেই এখন। পাবে না মিটে গেল। নালিশ করো গিয়ে–আদালত তো খোলা রয়েছে।

হাজারি চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

বেচু চক্কত্তির দিকে চাহিয়া বিনীত স্বরে বলিল–কর্তামশায়, আজ আপনার দোরে ছ'বছর খাটসি। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই–বাড়ীতে দুমাস খরচ পাঠাতে পারিনি, বাড়ী যাবার রেলভাড়া পর্যন্ত আমার হাতে নেই–আমায় কিছু না দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন –এই নিয়ে যাও। এখানে ঘ্যান ঘ্যান কোরো না–খদ্দের আসতে আরম্ভ করচে, বাইরে যাও গিয়ে

হাজারি আধুলিটা কুড়াইয়া লইয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিল। তারপর হাত জোড় করিয়া মাজা হইতে শরীরটা খানিকটা নোয়াইয়া বেচু-চক্কত্তিকে প্রণাম করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, তাহোলে বাবু, মাইনের জন্যে কবে আসবো?

–এসো–এসো এর পরে যখন হয়। সে এখন দেখা যাবে–

ইহা যে অত্যন্ত ছেঁদো কথা হাজারির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বরং পদ্ম ঝি যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। মাহিনা ইহারা তাহাকে দিবে না। তাহার মাথায় আসিল একবার শেষ চেষ্টা করিবে। মরীয়ার শেষ চেষ্টা। বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে পিছন দিয়া হোটেলের রান্নাঘরে আসিল। সেখানে পদ্ম ঝি একটু পরে আসিতেই সে হাত জোড় করিয়া বলিল–পদ্মদিদি, গরীব বামুন–চাকুরি করচি এতকাল, একখানা রেকাবী কোন দিন চুরি করিনি। আমি বড় গরীব। তুমি একটু বলে কর্তামশাইকে আমার মাইনের ব্যবস্থা করে দেও–নইলে বাড়ীতে ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। এই আধুলিটা সম্বল, দোহাই বলচি রাধাবল্লভের–এতে আমি কি খাবো, আর রেলভাড়া কি দেব, বাড়ীর জন্যেই বা কি নিয়ে যাবো।

–আমি হোটেলের মালিক নই যে তোমায় টাকা দেবো। কর্তামশায় যা বলেছেন তার ওপর আমার কি কথা আছে?

দয়া করে পদ্মদিদি তুমি একবার বলো ওঁকে। না খেয়ে মারা যাবে ছেলেপিলে।

–কেন তোমার পেয়ারের কুসুমের কাছে যাও না, পদ্মদিদিকে কি দরকার এর বেলা?

হাজারির ইচ্ছা হইল আর একদণ্ডও সে এখানে দাঁড়াইবে না। সে চায় না যে এই সব জায়গায় যার-তার মুখে কুসুমের নাম উচ্চারিত হয়, বিশেষত পদ্ম ঝিয়ের মুখে। সে চুপ করিয়া রহিল। পদ্ম রান্নাঘর হইতে চলিয়া গেল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া সে চলিয়াই যাইতেছিল, পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল–যাচ্ছ যে? খাওয়া হয়েছে তোমার?

হাজারি অবাক হইয়া পদ্ম ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল। কখনো সে এমন কথা তাহার মুখে শোনে নাই। আমতা আমতা করিয়া বলিল–না–খাওয়া—ইয়ে–না হয় নি ধরো।

–তা হোলে বোসো। এখনও মাছটা নামে নি। মাছ নামলে ভাত খেয়ে তবে যাও। দাঁড়িয়ে কেন? বসো না পিঁড়ি একখানা পেতে।

হাজারি কলের পুতুলের মত বসিল। পদ্মদিদি তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে! পদ্মদিদির দরদ!...সাত বছরের মধ্যে একদিনও যা দেখে নাই!...আশ্চর্য্য কাণ্ডই বটে!

মাছ নামিলে নতুন ঠাকুর হাজারিকে ভাত বাড়িয়া দিল। পদ্ম ঝিকে আর এদিকে দেখা গেল না–সে এখন খরিদ্দারদের খাওয়ার ঘরে ব্যস্ত আছে। নতুন ঠাকুর যদিও হাজারিকে চেনে না তবুও ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, হাজারি হোটেলের পুরোনো ঠাকুর–চাকুরিতে জবাব হইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে হাজারিকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইল।

যাইবার সময় হাজারি পদ্মকে ডাকিয়া বলিল–পদ্মদিদি, চললাম তবে। কিছু মনে কোরো না।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে আসিয়া বলিল–হ্যাঁ দাঁড়াও ঠাকুর। এই দুটো টাকা রাখো, কর্ত্তামশায় দিয়েছেন মাইনের দরুন। এই শেষ কিন্তু–আর কিছু পাবে না বলে দিলেন তিনি।

হাজারি টাকা দুইটি লইয়া আগের আধুলিটির সঙ্গে চাদরের খুঁটে রাখিল কিন্তু সে খুব অবাক হইয়া গিয়াছে–সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে।

–আচ্ছা, তবে আসি।

–এসো। খাওয়া হয়েছে তো? আচ্ছা।

রাত সাড়ে ন'টার কম নয়।

এত রাত্রে সে কোথায় যায়!

চাকুরি গেল। তবুও হাতে আড়াইটা টাকা আছে।

বাড়ী যাইয়া কি হইবে? চাকুরি খুঁজিতে হইবেই তাহাকে। বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চাকুরি চলিয়া যাইবে–একথা হাজারি ভাবে নাই। সত্য সত্যই চাকুরি গেল শেষকালে!

সে জানে রাণাঘাটে কোনো হোটেলে তাহার চাকুরি আর হইবে না। যদু বাঁড়ুয্যে একবার তাহাকে হোটেলে লইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন চুরির অপবাদে হাজত বাস করিয়া আসিয়াছে, কেহই তাহাকে চাকুরি দিবে না।

হাজারি দেখিল সে নিজের অজ্ঞাতসারে চূর্ণী নদীর ধারে চলিয়াছে–তাহার সেই প্রিয় গাছতলাটিতে গিয়া বসিবে–বসিয়া ভাবিবে। ভাবিবার অনেক কিছু আছে।

কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা নদীর ধারে বসিয়া থাকিয়াও ভাবনার কোনো মীমাংসা হইল না। আজ রাত্রে অবশ্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুইয়া থাকিবে–কিন্তু কাল যায় কোথায়?

আড়াই টাকার মধ্যে দুটি টাকা বাড়ী পাঠাইতে হইবে। টেঁপি-টেঁপির মুখে হয়তো তাহার মা দুটি ভাত দিতে পারিতেছে না।

এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য।

না-কালই টাকা দুটি পাঠাইবে তাকে। মনি অর্ডার ফি দিবে আধুলিটা হইতে। পুরো দু'টাকা বাড়ী যাওয়া চাই।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য ঘুম হইল। ফরিদপুর লোকালের শব্দে খুব ভোরে ঘুম গেল ভাঙিয়া। তবুও সে শুইয়াই রহিল। আজ আর তাড়াতাড়ি বড় উনুনে ডেকচি চাপাইতে হইবে না-উঠিয়া কি হইবে?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে শুইয়াই রহিল। ডাউন দার্জিলিং মেল আসিল, চলিয়া গেল। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ছাড়িল। রোদ উঠিয়াছে, প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিতে আসিয়াছে ঝাড়ুদার। একখানা গাড়ীর ডাউন দিয়াছে আড়ংঘাটার দিকে। মুর্শিদাবাদ-লালগোলা প্যাজেঞ্জার।

-এই কোন্ নিদ যাতা রে, এই উঠো-হঠ যাও-ঝাড়ুদার হাঁকিল। হাজারি উঠিয়া হাই তুলিয়া কলে গিয়া হাতমুখ ধুইল।

সে কোথায় যায়- কি করে? গত ছ'সাত বছরের মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় জীবন সে

কখনো যাপন করে নাই–কাজ, কাজ, উনুনে ডেকচি চাপাও, কর্ত্তামশায়ের চায়ের জল গরম কর আগে, বাজারে আজ কার পালা? হৈ চৈ–ঝাড়া বকুনি–পদ্ম ঝিয়ের চেঁচামেচি...

বেশ ছিল। পদ্ম ঝিয়ের বকুনিও যেন এখন সুমিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। পদ্ম খারাপ লোক নয়–কাল রাত্রে খাইতে বলিয়াছিল, টাকা দিয়াছে। রতন ঠাকুরও বড় ভাল লোক। তাহার সেই ভাগিনেয়টিও বড় ভাল। সবাই ভাল লোক। রতনের সেই ভাগিনেয় তাহার টেঁপির উপযুক্ত বর। দুজনে সুন্দর মানাইত। ছেলেটিকে বড় পছন্দ হইয়াছিল। আকাশকুসুম। মিথ্যা আশা, টেঁপিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে তার বিয়ে।

গত ছ'বছরে হাজারির একটা বড় কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে–সকালে বিকালে চা খাওয়া।

এখন চা খাইতে হইবে পয়সা খরচ করিয়া–সেজন্য হাজারি চা খাওয়ার ইচ্ছাকে দমন করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত আবশ্যক। আজ সাত আট দিন কুসুমের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। চুরির জন্য হাজতে যাওয়ার সংবাদ বোধ হয় কুসুম শোনে নাই–কে তাহাকে সে খবর দিয়াছে? চা ওখানেই খাওয়া চলিতে পারে। কুসুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও করা দরকার। তাহার নিজের মাথায় কিছুই আসিতেছে না।

কুসুম কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল–আপনি জ্যাঠামশায়? এমন অসময় যে। এতদিন আসেন নি কেন?

–চলো, ভেতরে বসি। অনেক কথা আছে।

কুসুম ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। হাজারি বসিয়া বলিল–মা কুসুম, একটু চা খাওয়াবে।

–এখুনি করে দিচ্চি জ্যাঠামশায়, একটু বসুন আপনি।

চা শুধু নয়–চায়ের সঙ্গে আসিল একখানা রেকাবিতে খানিকটা হালুয়া। হাজারি চা খাইতে খাইতে বলিল–কুসুম মা, আমার চাকরি গিয়েছে।

কুসুম বিস্ময়ের সুরে বলিল -কেন?

চুরি করেছিলাম বলে।

চুরি করেছিলেন!

–ওরা তাই বলে। পাঁচ-ছ’দিন হাজতে ছিলাম।

–হাজতে ছিলেন! হ্যাঁ! মিথ্যে কথা।

কুসুম দাঁড়াইয়া ছিল–হাজারির সামনে মাটির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কৌতূহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

না কুসুম, মিথ্যে নয়, সত্যিই হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হিসেবে।

–হাজতে থাকতে পারেন জ্যাঠামশায়–কিন্তু চুরি আপনি করেন নি–করতে পারেন না। সেইটেই মিথ্যে কথা, তাই বলচি।

–আমি চুরি করতে পারি নে?

–কক্ষনো না জ্যাঠামশায়। আপনাকে আমি জানি নে? চিনি নে?

–তোমার মা, এত বিশ্বাস আছে আমার ওপর!

কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

হাজারি বঁচিল। কুসুম সত্যই তার মেয়ে বটে। তাহার বড় ভয় ছিল কুসুম জিনিসটা কি ভাবে লইবে। যদি বিশ্বাস করিয়া বসে যে সত্যিই সে চোর! জগতে তাহা হইলে হাজারির একটা অবলম্বন চলিয়া গেল।

–আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন জ্যাঠামশায়?

কাল রাত্রে স্টেশনে শুয়ে ছিলাম–যাবো আর কোথায়? সেখান থেকে উঠে আসচি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করাটা দরকার মা, হয়তো আবার কতদিন–

–কেন, আপনি যাবেন কোথায়?

–একটা কিছু হিল্লে লাগাতে তো হবে–বসে থাকলে চলবে না বুঝতেই পারো। দেখি কি করা যায়।

–এখানে আর কোনো হোটেলে–

–চুরির অপবাদ রটেছে যখন, তখন এখানকার কোনো হোটেলে নেবে না। দেখি, একবার ভাবচি গোয়াড়ি যাই না হয়– সেখানে অনেক হোটেল আছে, খুঁজে দেখি সেখানে।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল–আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। আপাতোক আপনি নেয়ে আসুন, তেল এনে দিই। তারপর রান্নার যোগাড় করে দিচ্ছি, এখানে দু'টি ভাতেভাত চড়িয়ে খান।

–না মা, ওসব হাঙ্গামে আর দরকার নেই–থাক, খাওয়ার জন্যে কি হয়েছে–আমি

তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই বসে। ভাবলাম কুসুমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি গিয়ে, তাই এলাম। একটা বুদ্ধি দাও তো মা খুঁজে–একার বুদ্ধিতে কুলোয় না–তারপর বুড়োও হয়ে পড়েছি তো!

কুসুম হাসিয়া বলিল–পরামর্শ হবে এখন। না যদি খান, তবে আমিও আজ সারাদিন দাঁতে কুটো কাটবো না বলে দিচ্ছি কিন্তু জ্যাঠামশায়। ওসব শুনবো না–আগে নেয়ে আসুন–তারপর ভাত চাপান, আমিও আপনার প্রসাদ দু'টি পাই। মেয়ের বাড়ী এসেছেন, যতই গরীব হই, আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেচেন বুঝি–ভারি টান তো মেয়ের ওপর?

অগত্যা হাজারি চূর্ণীয় ঘাটে স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া দেখিল গোয়ালঘরের এক কোণ ইতিমধ্যে কুসুম কখন লেপিয়া পুঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া ইট দিয়া উনুন পাতিয়া ফেলিয়াছে।

একটা পেতলের মাজা বোগনো দেখাইয়া বলিল, এতেই হবে জ্যাঠামশায়, না নতুন হাঁড়ি কাড়বেন?

–না নতুন হাঁড়ির দরকার নেই। ওতেই বেশ হবে এখন।

ভাত নামিবার কিছু পূর্বে একটি ছেলে গোয়ালঘরের দোরে আসিয়া উঁকি মারিয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে বাহিরে ডাকিল। হাজারি দেখিল, তাহার হাতে একখানা গামছায় বাঁধা হাটবাজার–অন্য হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ঝোলানো।

--একটুখানি দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, মাছ কুটে আনি।

হাজারি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিল কুসুমের কাণ্ড দেখিয়া। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে ডাকিয়া কুসুম কখন বাজার করিতে দিয়াছে-থাক দিয়াছে দিয়াছে-কুসুম গরীব মানুষ, এত বড় মাছ কিনিতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? নাঃ, বড় ছেলেমানুষ এখনও। এদের জ্ঞানকাণ্ড আর হবে কবে?

কুসুম হাজারির তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল-আপনার রান্না ইলিশ মাছ একদিন খেতে যদি সাধ হয়ে থাকে তবে মেয়েকে অমন করে বকতে নেই জ্যাঠামশায়।

হাজারি অপ্রসন্নমুখে বলিল-নাঃ, যতো সব ছেলেমানুষের ব্যাপার।

আহারাদির পর হাজারির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুসুম খাইতে গেল। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই-ইতিমধ্যে হাজারি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রায় বিকাল হইয়া গিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল-কাল ঘুম হয় নি মোটেই ইষ্টিশানের বেঞ্চিতে শুয়ে- তা বুঝতে পেরেচি। ঘুমিয়েচেন ভাল তো? চা ক'রে আনি, উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

চায়ের সঙ্গে কোথা হইতে কুসুম গরম জিলিপি আনাইয়া দিল। বলিলেও শোনে না, বলিল–এই তো ওই মোড়ে হারান ময়রার দোকানে এ সময় বেশ গরম জিলিপি ভাজে, চায়ের সঙ্গে বেশ লাগবে–শুধু চা খাবেন?

ইহার উপর আর কত অত্যাচার করা চলিতে পারে। আজই এখান হইতে সরিয়া না পড়িলে উপায় নাই। হাজারি ঠিক করিল চা খাইয়া আর একটু বেলা গেলেই এখান হইতে রওনা হইবে।

কুসুম পান সাজিয়া আনিয়া হাজারির সামনে মেঝেতে বসিল।–তারপর এখন কি করবেন ভেবেছেন?

–ওই তো বল্লাম গোয়াড়ি গিয়ে চাকরির চেষ্টা করি।

–যদি সেখানে না পান?

–তবে কলকাতা যাবো। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতায় যাতায়াত অভ্যাস নেই -অত বড় শহরে থাকাও অভ্যাস নেই–ভয় করে।

–আমার একটা কথা শুনবেন জ্যাঠামশায়?

–কি?

–শোনেন তো বলি।

–বল না মা কি বলবে?

–আমার সেই গহনা বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি করে আপনাকে দু'শো টাকা এনে দিই। আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পর জমে–এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কত্তির হোটেলের পাশেই খুলুন। পদ্ম চোখ টাটিয়ে মরুক। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায়–আপনার উন্নতি হবে–কোথায় যাবেন এ বয়সে পরের চাকরি করতে।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কি চমৎকার, এই অদ্ভুত মেয়ে কুসুম! মেয়েই বটে তাহার। কিন্তু তাহা হইবার নয়–নানা কারণে। কুসুমের টাকায় রাণাঘাটে হোটেল খুলিলে পাঁচজন পাঁচরকম বদনাম রটাবে উভয়ের নামে। তাহার উপকার করিয়া নিরপরাধিনী কুসুম কলঙ্ক কুড়াইতে গেল কেন? ওই পদ্ম ঝি-ই সাতরকম রটাইয়া বেড়াইবে গাত্রদাহের জ্বালায়।

তা ছাড়া যদি লোকসানই হয়, ধরো–(যদিও হাজারির দৃঢ় বিশ্বাস সে হোটেল খুলিলে লোকসান হইবে না) তাহা হইলে কুসুমের টাকাগুলি মারা পড়বে। না, তার দরকার নাই।

--মা কুসুম, একবার তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার ও টাকা নেওয়া হবে না। আবার কেন সে কথা? আমাকে এই গাড়ীতে গোয়াড়ি যেতে হবে, উঠি।

কুসুম গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–আচ্ছা, কথা দিয়ে যান যদি গোয়াড়িতে চাকুরি না জোটাতে পারেন তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন?

–তোমার কাছে মা? কেন বলো তো?

–এসে ওই টাকা নিতে হবে। হোটেল খুলতে হবে। ও টাকা আপনার হোটেলের জন্যে তোলা আছে। শুধু আপনার ভালোর জন্যেই বলচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমার স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু'পয়সা আমিও পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বাঁ?

হাজারি হাসিয়া বলিল–আচ্ছা কথা দিয়ে গেলাম। তবে আসি মা আজ। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।

–মনে রাখবেন মেয়ের কথা।

–তুমিও মনে রেখো তোমার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথা—

–ইস! আমার জ্যাঠামশায় বুড়ো বৈকি?

–না, ছ'চল্লিশ বছর বয়েস হয়েচে–বুড়ো নয় তো কি?

–দেখায় না তো বুড়োর মত। বয়েস হলেই হোলো? আসবেন আবার কিন্তু তা হোলে।

–আচ্ছা মা। হাজারি পুঁটুলি লইয়া বাটির বাহির হইল। কুসুম তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

রাণাঘাট হইতে বাহির হইয়া হাজারি হাঁটাপথে চাকদার দিকে রওনা হইল। প্রথমে ডাকঘর হইতে বাড়ীতে দু'টি টাকা মনিঅর্ডার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ডাকঘরে গিয়া দেখিল মনিঅর্ডার নেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাকঘর খোলা না থাকার জন্য পরে হাজারি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। চাকদা যাইবার মাঝপথে সেগুন-বাগানের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল। একটা সেগুন গাছের তলায় দু'খানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজন নামিয়া গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। হাজারি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সম্মুখের পূর্ণিমায় কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানের মেলা উপলক্ষ্যে উহারা মেলায় দোকান করিতে যাইতেছে। হাজারি তাহাদের সঙ্গ লইল।

রাত্রে আহারাদির পরে সবাই গাছতলায় শুইয়া রাত্রি কাটাইল–দোকানের মালিকের নাম প্রিয়নাথ ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, মনোহারি দোকান লইয়া ইহারা মেলায় যাইতেছে। হাজারির পরিচয় পাইয়া ধর মহাশয় প্রস্তাব করিল মেলায় কয়দিন তাহারা কেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এই কয়দিন হাজারি যদি রান্না করিয়া সকলকে খাওয়ায়–তবে সে দৈনিক খোরাকি ও মেলা অন্তে কয়দিনের মজুরি

স্বরূপ দুই টাকা পাইবে।

প্রিয়নাথ ধরের দোকান তিনখানি–একখানি তার নিজের, অপর দুইখানি তাহার জামাই ও ভ্রাতৃপুত্রের। কম মাহিনায় যে ওস্তাদ রাঁধুনী পাইয়াছে, হাজারির প্রথম দিনের রন্ধনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। সকলেই খুব খুশি।

মেলায় পৌঁছিয়া কিন্তু হাজারি দেখিল, রান্নার চেয়েও অধিকতর লাভের একটি ব্যবসা এই মেলাতেই তাহার অন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া তেলেভাজা কচুরি সিঙ্গাড়ার দোকান খুলিয়া বসিল ধর মহাশয়দের বাসার একপাশে। বিনামূল্যে কচুরি খাইবার লোভে ধর মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না।

কয়দিন দোকানে অসম্ভব রকমের বিক্রি হইল। মূলধন ছিল আগের সেই দুই টাকা– শেষে খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে হাজারি ধর মহাশয়ের তহবিল হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইল।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট উঠানো হইল। মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধর মহাশয়ের তহবিলের দেনা শোধ করিয়া ও সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়া হাজারি দেখিল সাড়ে তেরো টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ধর মহাশয়ের রান্নার মজুরি দুই টাকা লইয়া মোট হইল সাড়ে পনের টাকা।

প্রিয়নাথ ধর বলিলেন–ঠাকুর মশায়, আপনার রান্না যে এত চমৎকার, তা যখন

আপনাকে সেগুন বাগানে প্রথম কাজে লাগালুম, তখন ভাবি নি। আমি বড়লোক নই, বাড়ীতে মেয়েরাই রাঁধে, না হোলে আপনাকে আমি ছাড়তুম না কিছুতেই।

বাড়ীতে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাজারির মন খানিকটা সুস্থ হইল। এখন সংসারের ভাবনা সম্বন্ধে মাসখানেকের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে। এই এক মাসের মধ্যে নতুন কিছু অবশ্যই জুটিয়া যাইবে।

কালীগঞ্জ হইতে যশোর যাইবার পাকা রাস্তা বাহিয়া হাজারি আবার পথ চলিল। এই পথের দুধারে বনজঙ্গল বড় বেশী–পূর্বে গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বহু গ্রাম জন-শূন্য হইয়া যাওয়াতে অনাবাদী মাঠ ও বিধ্বস্ত পুরাতন গ্রামগুলি বনে-জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলা কালীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়াছে, যখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়-হয়, তখন একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের ছায়ায় সে আশ্রয় লইল। অল্প দূরে একখানা ক্ষুদ্র চাষাদের গ্রাম। একটি ছোট ছেলে গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল গ্রামখানার নাম নতুন পাড়া। বেশীর ভাগ গোয়ালাদের বাস।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমেই যে খড়ের বড় অটচালা ঘরখানা দেখিল তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক কাহাকেও দেখিল না। একদিকে বড় গোয়াল, অনেকগুলি বলদ

গরু বিচালির জাব খাইতেছে।

একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। হাজারি তাহাকে ডাকিয়া বলিল–খুকী শোনো-বাড়ীতে কে আছে? মেয়েটি ভয় পাইয়া কোনো উত্তর না দিয়াই বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে বাড়ীর মালিক আসিল। তাহার নাম শ্রীচরণ ঘোষ। হাজারিকে সে খুব খাতির করিয়া বসাইল, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে–সুতরাং রান্না-খাওয়া করিতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা জলচৌকি ও এক বালতি জল আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল।

ইহারাও গোয়ালঘরের একপাশে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। সেখানে বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কুসুমের কথা। কুসুমও তাহাকে সেদিন গোইয়ল ঘরেই রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল–কুসুমও গোয়ালার মেয়ে।

বোধ হয় সেই জন্যই–ইহারা গোয়ালা শুনিয়াই–হাজারি ইহাদের বাড়ী আসিয়াছিল–মনের মধ্যে কোন গোপন আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। হঠাৎ সে আশ্চর্য্য হইয়া গোয়ালঘরের দরজার দিকে চাহিল।

একটি অল্পবয়সী বৌ আধঘোমটা দিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিয়া এক চুবড়ি শাক লইয়া লাজুক ভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। শাকগুলি সদ্য জল হইতে ধুইয়া আনা–চুবড়ি দিয়া জল ঝরিয়া গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে।

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল–এস মা এস--কি ওতে?

বউটি লাজুক মুখে একটু হাসিয়া বলিল–চাঁপানটে শাক। এখানে রাখি?

বউটি কুসুমের অপেক্ষাও বয়সে ছোট। হঠাৎ একটা অকারণ স্নেহে হাজারির মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল–রাখো মা রাখো–

খানিকটা পরে বউটি আবার ঘরের মধ্যে গোটাকতক কাঁঠাল-বীচি লইয়া ঢুকিল। এবার সে যেন অনেকটা নিঃসঙ্কোচ, পিতার বয়সী এই শান্ত, প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের নিকট সঙ্কোচ করিতে তাহার বাধিতেছিল হয়তো।

হাজারিকে বলি–কাঁঠাল-বীচি খান?

–খাই মা, কিন্তু ওগুলো কুটে দেবে? আমি ডাল চড়িয়েচি, আবার কুটি কখন?

বউটি এক পাথরের বাটিতে কাঁঠাল-বীচি আনিয়াছিল। বাটিটা নামাইয়া ছুটিয়া গিয়া একখানা বঁটি লইয়া আসিল এবং বীচিগুলি কুটিতে আরম্ভ করিল। হাজারির মন তৃষিত ছিল, ইহারা সবাই মেয়ের মত, সবাই ভালবাসে, সেবা করে, মনের দুঃখ বোঝে।

হাজারি কোন কথা বলিবার আগেই বউটি বলিল–আপনার গাঁয়ে আমি কত গিইচি।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল–আমার গাঁ কোথায় তুমি কি করে জানলে? তুমি সেখানে কি করে গেলে?

--গঙ্গাধর ঘোয আমার পিসেমশাই—

–ওহো–তুমি জীবনের ভাইঝি! তা হলে কুসুমকে তো চেনো–

–কুসুমদিদিকে তার বিয়ের আগে অনেকবার দেখেছি, বিয়ের পরে আর কখনও দেখি নি। সে আজকাল কোথায় থাকে জানেন নাকি?

–সে থাকে রাণাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। তবে তোমাকে মা বলে খুব ভাল করেচি, কুসুম আমার মেয়ে।

বউটি বীচি কোটা বন্ধ রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর হইতেই প্রণাম করিল।

–এসো মা চিরজীবী হও, সাবিত্রী সমান হও।

বউটি হাসিয়া বলিল–আপনি যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, তখনই আপনাকে দেখে আমি চিনেছি। আমি শাশুড়ীকে গিয়ে বল্লাম আমার পিসিমার গাঁয়ের মানুষ উনি–তখন শাশুড়ী গিয়ে শ্বশুরকে জানালেন।

–বেশ মা বেশ। আসবো যাবো, আমার আর একটি মেয়ে হোল, তার সঙ্গে দেখাশুনা করে যাবে। ভালই হোল।

বউটি সলজ্জভাবে বলিল–আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দেবো না–থাকতে হবে এখন এখানে

–না মা, আমার থাকা হবে না।

–না তা হবে না। যান দিকি কেমন করে যাবেন? আমি জোর করতে পারিনে বুঝি?

–অবিশ্যি পারো মা, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, আবার সুদিন পেলে এসে দু'দিন থেকে যাবো–

বউটি হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল–কেন, কি হয়েছে আপনার?

হাজারির স্বভাবদুর্বল মন, সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া গলিয়া গেল। সে তাহার চাকুরি যাওয়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গেল–ডাল নামাইয়া চচ্চড়ি রাঁধিবার ফাঁকে ফাঁকে। একটু গর্ব করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না।

–রান্না যা করতে পারি মা, তোমার কাছে গোমর করে বলচি নে, অমন রান্না রাণাঘাটের কোনো হোটেলে কোনো বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে না। হয় না হয় মা

এই তোমাদের এখানে এই যে চচ্চড়ি রাঁধচি, তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেখাবো; আমি জোর করে বলতে পারি এরকম চচ্চড়ি কখনও খাও নি, আর কখনও খাবে না।

বউটি বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাজারির দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল। বলিল–তা হোলে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে খুড়োমশাই–

–একদিনের কর্ম নয় সে। শেখালেও শিখতে পারা কঠিন হবে–তোমায় ফাঁকি দেওয়া আমার ইচ্ছে নয় মা। এ শেখা এক আধ দিনে হয় কখনো?

–তা আপনি যদি অমন রাঁধুনী, আপনার আবার চাকরির ভাবনা কি? কত বড়লোকের বাড়ী ভাল মাইনে দিয়ে রাখবে

–অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় মা, কিছুতেই কিছু হয় না। হাতে টাকা থাকে দু'দিন চেষ্টা চরিত্তি করে বেড়াতে পারি। বেড়াবো কি, রেস্ত ফুরিয়ে এসেচে কি না।

–ক'টাকা লাগবে বলুন।

–কেন, তুমি দেবে নাকি?

–যদি দিই?

–সে আমি নিতে পারি নে। কুসুম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আমি নেবো কেন? তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুলি পুঁজি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চাই নে।

–আচ্ছা, আপনাকে যদি টাকা ধার দিই? আপনাকে বলি শুনুন খুড়োমশায়। আমার মার কাছ থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম। এখানে রাখবার জো নেই। একটা কথা বলবো?

এদিক ওদিক চাহিয়া সুর নীচু করিয়া বলিল–ননদ আর জা ভাল লোক নয়। এখুনি যদি টের পায় নিয়ে নেবে। আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন?

এই কুসীদ-লোভী সরলা মেয়েটির প্রতি হাজারির প্রৌঢ় মন করুণায় ও মমতায় গলিয়া গেল। সে আরও খানিক মজা দেখিতে চাহিল।

–এমনি টাকা দেবে মা? আমায় বিশ্বাস কি?

–তা বিশ্বাস না করলে কি এ কারবার চলে? আর আপনি তো চেনা লোক। আপনার গাঁ চিনি, বাড়ী চিনি।

–চিনলেই হোল? একটা লেখাপড়া করে নেবে না? কত টাকা দিতে চাও?

–আমার কাছে আছে আশি টাকা। সবই দিতে পারি আপনি যদি নেন। সুদ কত দেবেন?

–কত করে চাও?

–আপনি যা দেবেন। টাকায় দুপসা করে রেট, আপনি এক পয়সা দেবেন, কেমন তো? আপনার পায়ে পড়ি খুড়োমশায়, টাকাগুলো আলাদা আমার তোরঙ্গতে তোলা আছে। কেউ জানে না। আপনাকে এনে দিই, টাকাগুলো খাঁটিয়ে দিন আমায়। কাকে বিশ্বাস করে দেবো, কে নিয়ে আর দেবে না।

–কই, লেখাপড়ার কথা বল্লে না তো?

–আমি লেখাপড়া জানি নে–কি লেখাপড়া করে নেবো। আপনি চান একটা কিছু লিখে দিয়ে যান। কিন্তু তাতে লোক-জানাজানি হবে। সে কাজের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান। আমি দিচ্চি মিটে গেল। এর আর লেখাপড়া কি?

ইতিমধ্যে রান্নাবান্না শেষ হইয়া গেল। বউটি একঘটি দুধ আনিয়া বলিল–এই উনুনটা পেড়ে দুধটুকু জ্বাল দিয়ে খেতে বসুন–বেলা কি কম হয়েচে?

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। হাজারির কথা মিথ্যা নয়–গোয়ালাবাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, এরকম রান্না খাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য জিনিস যে খাইতে এমনধারা হয় তাহা শোনেও নাই।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া হাজারি যাইবার জন্য তৈরী হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল আর একবার বউটির সঙ্গে দেখা করে। পল্লীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পর্দা নাই সে জানে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির মেয়েদের মধ্যে। মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল উহার সরলতার জন্য এবং বোধ হয় টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথাটা আর একবার বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ইতিমধ্যে একটা মতলব মাথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। কুসুম এবং এই মেয়েটি যদি তাহাকে টাকা দেয় তবে সে তাহার চিরদিনের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলতে পারিবে। ইহাদের টাকা সে নষ্ট করিবে না–বরং অনেক গুণ বাড়াইয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। খাইতে বসিয়া হাজারি এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে।

ইহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হইলে একটা পুকুরের ধার দিয়া যাইতে হয়–একটা বড় তেঁতুল গাছ এবং তাহার চারিপাশে অন্যান্য বন্য গাছের ঝোঁপ জায়গাটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে বাহির হইতে হঠাৎ সেখানে কেহ থাকিলে তাহাকে দেখা যায় না।

পুকুরের পাড় ছাড়াইয়া হাজারি হঠাৎ দেখিল মেয়েটি তেঁতুলতলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে যেন তাহারই অপেক্ষায়।

–চল্লেন খুড়োমশায়?

–হ্যাঁ যাই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

–আপনি এই পথ দিয়ে যাবেন জানি, তাই দাঁড়িয়ে আছি। দুটো কথা আপনাকে বলবো। আপনার হাতের রান্না চচ্চড়ি খেয়ে ভাল লেগেছে খুড়োমশায়। আমরাও তো রাঁধি, রান্নার ভাল মন্দ বুঝি। অমন রান্না কখনো খাই নি। আর একটা কথা হচ্ছে আমার টাকাটার কথা মনে আছে তো? কি করলেন তার? জানেন তো মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের চেয়ে বাপের বাড়ীর লোকদের বেশী বিশ্বাস করে? এদের হাতে ও টাকা পড়লে দুদিনে উড়ে যাবে।

টাকা তোমার এখুনি নিতে পারবো না। কিন্তু আবার আমি এই পথে আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন হয়তো টাকার দরকার হবে, টাকা তখন হয়তো নিতে হবে।

–কত দিনের মধ্যে আসবেন?

–তা বলতে পারিনে, ধর মাস দুই। পুজোর পরে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

–কথা রইল তা হোলে?

–ঠিক রইল। এসো এসো, লক্ষ্মী ছোট্ট মা আমার–সাবিত্রী সমান হও, আশীর্বাদ করি তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হাজারি আবার পথ চলিতে লাগিল। গোয়ালাবাড়ীর সবাই এবেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, বউটি তো বিশেষ করিয়া। কিন্তু থাকিবার উপায় নাই, একটা কিছু যোগাড় না করা পর্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই।

মেয়েটি খুব আশ্চর্য্য ধরণের বটে। নির্বোধ হয় তো--কুসুমের মত বুদ্ধিমতী নয় ঠিকই, তবুও বড় ভাল মেয়ে।

পথের দুধারে বনজঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে–পথ নদীয়া জেলা হইতে যত যশোর জেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেছে এই বন ক্রমশ বাড়িতেছে। স্থানে স্থানে বনজঙ্গল এত ঘন যে হাজারির ভয় করিতে লাগিল দিনমানেই বুঝি বাঘের হাতে পড়িতে হয়। লোকের বসতি এসব স্থানে বেশী নাই, ভয় করিবারই কথা।

সন্ধ্যার পূর্বে বেলের বাজারে আসিয়া পৌঁছিল। আগে যখন রেল হয় নাই, তখন বেলে বাজার খুব বড় ছিল, হাজারি শুনিয়াছে তাহার গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মুখে। এখনও পূর্ব অঞ্চল হইতে চাকদহের গঙ্গায় শবদাহ করিতে আসে বহুলোক–তাহাদের জন্যই বেলের বাজার এখনও টিকিয়া আছে।

হাজারি বেলের বাজার দেখিয়া খুশী হইল ও আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও দেখে নাই। চমৎকার জায়গা বটে। এই তাহা হইলে বেলে। তাহার এক মামাতো ভাই যশোর অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে শব লইয়া চাকদহে এই পথ বাহিয়া আসিতে অসিতে বেলের বাজারের কাছে ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হয়–এ গল্প

উক্ত মামাতো ভাইয়ের মুখেই দু-তিনবার সে শুনিয়াছে।

হাজারি ঘুরিরা ঘুরিয়া বাজারের দোকানগুলি দেখিতে লাগিল। সর্বসুদ্ধ নখানা দোকান ইহারই মধ্যে চাল ডাল মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান সব। একজন দোকানদারকে বলিল–একটু তামাক খাওয়াতে পারেন মশায়?

–আপনারা?

–ব্রাহ্মণ।

-–পেরণাম হই ঠাকুর মশায়। আসুন, কোথায় যাওয়া হবে?–বন, ওরে বামুনের হুঁকোতে জল ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

দোকানখানি কিসের তাহা হাজারি বুঝিতে পারিল না। এক পাশে চিটা গুড়ের ক্যানেস্ত্রা চাল পর্য্যন্ত একটার গায়ে একটা উঁচু করিয়া সাজানো আছে–আর এক পাশে বড় বড় বস্তা। দোকানদার বৃদ্ধ, বয়স পয়ষট্টি হইতে সত্তর হইবে, রূগা একহারা চেহারা, গলায় মালা।

–নিন্ ঠাকুর মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। কোথায় যাওয়া হবে?

–যাচ্ছি কাজের চেষ্টায়, রাণাঘাট হোটেলে সাত বছর রেঁধেছি, বেচু চক্কত্তির হোটেলে। নাম শুনেছেন বোধ হয়। ভাল রাঁধুনী বলে নাম আছে–কিন্তু চাকুরিটুকু

গিয়েছে–এখন যাই তো একবার এই দিক পানে–যদি কোথাও কিছু জোটে।

দোকানদার পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রমের চোখে হাজারিকে দেখিল। নিতান্ত গ্রাম্য ঠাকুর পূজারী বামুন নয়–রাণাঘাটের মত শহর বাজারের বড় হোটেলে সাত-আট বছর সুখ্যাতির সঙ্গে রান্নার কাজ করিয়াছে, কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কত বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে — না, লোকটা সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়।

হাজারি বলিল–রাত হয়ে আসচে, একটু থাকার জায়গার কি হয় বলতে পারেন?

দোকানদার অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল–এইখানেই থাকুন, এর আর কি। আমার এই পেছন দিকে দিব্যি চালা রয়েছে, একখানা তক্তপোশ রয়েচে। চালায় রান্না করুন, তক্তপোশে শুয়ে থাকুন।

কথায় কথায় হাজারি বলিল–আচ্ছা এখানে গঙ্গাযাত্রী দিন কত যাতায়াত করে?

–সে দিন আর নেই বেলের বাজারের। আগে আট দশ দল, এক এক দলে দশ-বারো জন করে মানুষ, এ নিত্য যেতো। এখন কোনোদিন মোটেই না, কোনোদিন তিনটে, বড্ড জোর চারটে। আগে লোকের হাতে পয়সা ছিল, মড়া গঙ্গায় দিত–আজকাল হাতে নেই পয়সা–ম'লে নদীর ধারে, খালের ধারে, বিলের ধারে পুড়ায়।

হাজারি ভাবিতেছিল বেলের বাজারে একখানা ছোটখাটো হোটেল চলিতে পারে কিনা। তিন দল গঙ্গাযাত্রীতে ত্রিশটি লোক থাকিলে যদি সকলে খায়, তবে

ত্রিশজন খরিদ্দার। ত্রিশজন খরিদ্দার রোজ খাইলে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে খরচ-খরচা বাদে। সেই জায়গায় কুড়ি জন হোক, দশ জন হোক রোজ–তবুও পরের চাকুরির চেয়ে ভাল। পরের চাকুরি করিয়া পাইতেছে সাত টাকা আর অজস্র অপমান বকুনি। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা–দশ জন খরিদ্দার যে হোটেলে রোজ খায়, সেখানে অন্ততঃ বারো-তেরো টাকা মাসে লাভ থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে গোপালনগরের দিকে রওনা হইল। হাতের পয়সা এখনও যথেষ্ট--পাঁচ টাকা আছে, কোনো ভাবনা নাই। কাল রাত্রে দোকানদার চাল ডাল হাড়ি কিনিয়া আনিতে চাহিয়াছিল, হাজারি তাহাতে রাজী হয় নাই। নিজে পয়সা খরচ করিয়াছে।

দুপুরের রৌদ্র বড় চড়িল। নির্জন রাস্তা, দুধারে কোথাও ঘন বনজঙ্গল, কোথাও ফাঁকা মাঠ, লোকালয় চোখে পড়ে না, এক-আধখানা চাষাদের গ্রাম ছাড়া। ঘণ্টা দুই হাঁটিবার পরে হাজারির তৃষ্ণা পাইল। কিছুদূরে একটা ছোট পুকুর দেখিয়া তাহার ধারে বসিতে যাইবে এমন সময় একখানা খালি গরুর গাড়ী পুকুরের পাশের মেটে রাস্তা দিয়া নামিতে দেখি। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল–কাছে কোনো গ্রাম আছে বাপু? একটু জল খাবো। ব্রাহ্মণ।

গাড়োয়ান বলিল–আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর মশায়, কাছেই ছিনগর-সিমলে আমি বামুন বাড়ী যাবো। তেনাদের গাড়ী–গাড়ীতে আসুন।

হাজারি শ্রীনগর-সিমলে গ্রামের নাম শুনিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে দেখিল

এ তো গ্রাম নয়—বিজন বন। এতখানি বেলা চড়িয়াছে এখনও গ্রামের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে নাই; শুধু আম-কাঁটালের প্রাচীন বাগান, বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল।

একটা গৃহস্থ-বাড়ীর উঠানে গরুর গাড়ী গিয়া থামিল। গাড়োয়ানের ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে গৃহস্বামী আসিলেন, ম্যালেরিয়া-শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বয়স ত্রিশও হইতে পারে পঞ্চাশও হইতে পারে। তিনি বাহিরে আসিয়াই হাজারিকে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—কে রে সঙ্গে?

গাড়োয়ান বলিল—এজ্ঞে উনি পাকা রাস্তায় মুদির পুকুরের ধারে বসে ছিলেন, বল্লেন একটু জল খাবো— তা বল্লাম চলুন আমার সঙ্গে—আমার মনিবেরা ব্রাহ্মণ—সেখানে জল খাবেন, তাই সঙ্গে করে আনলাম।

গৃহস্বামী আগাইয়া আসিয়া হাজারিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। বসুন, বিশ্রাম করুন। ওরে চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোশে মাদুরটা পেতে দে—আসুন।

এসব পল্লী অঞ্চলে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। আধঘণ্টা পরে হাজারি হাত পা ধুইয়া বসিয়া গাছ হইতে সদ্য পাড়া কচি ডাবের জল পান করিয়া সুস্থ ও খোশমেজাজে হুঁকা টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর নাম বিহারীলাল বাঁড়ুয্যে। চাকুরি জীবনে কখনো করেন নাই, যথেষ্ট ধানের আবাদ আছে, গরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, আম-কাঁটালের বাগান আছে।

এসব কথা গৃহস্বামীর নিকট হইতেই হাজারি গল্পচ্ছলে শুনিল।

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিতেছিলেন, শ্রীনগর-সিমলে মস্ত গ্রাম ছিল, রাজধানী ছিল কেষ্টনগরের রাজাদের পূর্বপুরুষের। জঙ্গলের মধ্যে রাজার গড়খাই আছে, পুরোনো ইটের গাঁথুনি আছে, দেখাবো এখন ওবেলা। না না, আজ যাবেন কি? ওসব হবে না। দুদিন থাকুন, আমাদের সবই আছে আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে, তবে মানুষজনের মুখ দেখতে পাইনে এই যা কষ্ট। ছেলেবেলাতেও দেখেছি গাঁয়ে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন দাঁড়িয়েচে সাত বর মোট–তার মধ্যেও দু ঘর আছে বারোমাস বিদেশে। আপনার নিবাস কোথায় বল্লেন?

–আরে, এঁড়োশোলা-গাংনাপুর থেকে নেমে যেতে হয়।

–তবে তো আপনি আমাদের এদেশেরই লোক। আন না আমাদের গাঁয়ে? জায়গা দিচ্ছি, জমি দিচ্ছি, ধান করুন, পাট করুন, বাস করুন এখানে। তবুও এক ঘর লোক বাড়ুক গ্রামে। আসুন না?

হাজারি শিহরিয়া উঠিল। সর্বনাশ! এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করিতে আসিবে –সেইটকু অদৃষ্টে বাকী আছে বটে! শহর বাজারে থাকিয়া সে শহরের কল-কোলাহল কর্মব্যস্ততাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে–এই বনের মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইতে হয় যে বৃদ্ধ বয়সে। ছ'চল্লিশ বৎসর বয়স তার–দিন এখনও যায় নাই, এখনও যথেষ্ট উৎসাহ শক্তি তার মনে ও শরীরে। তা ছাড়া সে বোঝে হোটেলের কাজ, একটা হোটেল খুলিতে পারিলে তাহার বয়স দশ বছর কমিয়া যাইবে–নব

যৌবন লাভ করিবে সে। চাষবাসের সে কি জানে?

হোটেলের কথা হাজারি এখানে বলিল না। সে জানে হোটেলওয়ালা বামুন বলিলে অনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখে–বিশেষত এই সব পাড়াগাঁয়ে।

শ্রীনগরে হাজারির মোটেই মন টিকিতেছিল না–এত বনজঙ্গলের ন্ধকার ও নির্জনতার মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৈকালের দিকেই সে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পথে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল–বাপরে! কুড়ি বিঘে ধানের জমি দিলেও এ গাঁয়ে নয় রে বাবা! মানুষ থাকে এখানে? মানুষজনের মুখ দেখার যো নেই, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই--কুঁড়ের মতো বসে থাকে। আর গোলার ধানের ভাত খাও– সর্বনাশ!...আর কি জঙ্গল রে বাবা!...

রাস্তার ধারে একটা লোক কাঠ ভাঙিতেছিল। হাজারি তাহাকে বলিল–সামনে কি বাজার আছে বাপু?

লোকটা একবার হাজারির দিকে নীরবে চাহিয়া দেখিল। পরে বলিল–আপনি কি আলেন সিমলে থে?

–হ্যাঁ।

–এখানে আপনাদের এত্ম্য-কুটুম্ব আছেন বুঝি? আপনারা?

–ব্রাহ্মণ।

–পেরণাম হই। কোথায় যাবেন আপনি?

হাজারি জানে পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে এই সব শ্রেণীর লোক তাহাকে অকারণে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া মারিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব। হাজারিও পূর্বে এই রকম ছিল–কিন্তু রাণাঘাট শহরে এতকাল থাকিয়া বুঝিয়াছে অপরিচিত লোককে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই বা করিলে লোকে চটে। হাজারি বর্তমান প্রশ্নকর্তার হাত এড়াই বার জন্য সংক্ষেপে দু-একটি কথার উত্তর দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল–সামনে কি বাজার পড়বে বাপু?

–এজ্ঞে যান, গোপালনগরের বড় বাজার পড়বে–কোশ দুই আর আছেন।

গোপালনগরের নাম হাজারির কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এদিকের বড় গঞ্জ গোপালনগর, সকলেই নাম জানে।

মধ্যাহ্নভোজনটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, রাতে খাইবার আবশ্যক নাই। একটু আশ্রয় পাইলেই হইল। সুতরাং হাজারির মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। এ কয়দিন সে যেন নূতন জীবন যাপন করিতেছে–সকালে উঠিবার তাড়া নাই, পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া নাই–বেচু চক্কত্তির কাছে বাজারের হিসাব দিতে যাওয়া নাই–দশ সের কয়লাজ্বলা অগ্নিকুণ্ডের তাতে বসিয়া সকাল হইতে বেলা একটা এবং ওদিকে সন্ধ্যা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত হাতাখুন্তি নাড়া নাই, বাঁচিয়াছে সে।

পথের ধারে একটা গাছতলায় পাকা বেল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাজারি সেটা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাল সকালে খাওয়া চলিবে।

সব ভাল–কিন্তু তবু হাজারির মনে হয়, এ ধরণের ভবঘুরে জীবন তাহার পছন্দসই নয়। বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি হইবে? চাকুরি জোটে তো ভাল। নতুবা এ ধরণের জীবন সে কতকাল কাটাতে পারে?...একমাসও নয়। সে চায় কাজ, পরিশ্রম করিতে সে ভয় পায় না, সে চায় কর্মব্যস্ততা, দু-পয়সা উপার্জন, নাম, উন্নতি। ইহার উহার বাড়ী খাইয়া বেড়াইয়া, পথে পথে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

গোপালনগর বাজারে পৌঁছিতে বেলা গেল। বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি ছোট দোকান, ভাল ব্যবসার জায়গা বটে। হাজারি একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনের টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুইয়া লইল। নিকটে একটা কালীমন্দির–মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া সম্ভবত মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হুঁকা টানিতেছে দেখিয়া হাজারি তামাক খাইবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–একবার তামাক খাওয়াবেন?

–আপনারা?

–ব্রাহ্মণ।

–বসুন, এই নিন।

–আপনি কি মন্দিরে মায়ের পূজা করেন?

–আজ্ঞে হাঁ। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্চে?

–আমার বাড়ী গাংনাপুরের সন্নিকট এঁড়োশোলা। রাঁধুনীর কাজ করি–চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়েছি। এখানে কেউ রাঁধুনী রাখবে বলতে পারেন?

–একবার এই বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন। ওঁরা বড়লোক, রাঁধুনী ওঁদের বাড়ীতে থাকেই–বাবুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে আছে, যদি এ সময় নতুন লোকের দরকার টরকার পড়ে–ওঁ জাতে তিলি, বাজারের সেরা ব্যবসাদার, ধনী লোক।

হাজারি কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া দেখিল একজন শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার লোক গদির উপর বসিয়া আছে। সেই লোকটিই যে দোকানের মালিক, ইহা কেহ বলিয়া না দিলেও বোঝা যায়। হাজারিকে ঢুকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল–আসুন, কি চাই? ওদিকে যান–ওহে, দেখ ইনি কি নেবেন–

বলিয়া লোকটি দোকানের অন্য যে অংশে অনেকগুলি কর্মচারী কাজ-কর্ম ও কেনাবেচা করিতেছে সে দিকটা দেখাইয়া দিল।

হাজারি বলিল–বাবু, দরকার আপনার কাছে। আমি রান্না করি, ব্রাহ্মণ–শুনলাম

আপনার বাড়ীতে রাঁধুনী রাখবেন—তাই-

–ও। আপনি রান্না করবেন? রাঁধতে জানেন ভাল? কোথায় ছিলেন এর আগে?

–আজ্ঞে রাণাঘাট হোটেলে ছিলাম সাত বছর।

–হোটেলে? হোটেলের কাজ আর বাড়ীর কাজ এক নয়। এ খুব ভাল রান্না চাই। আপনি কি তা পারবেন? কলকাতা থেকে কুটুম্ব আসে প্রায়ই—

হাজারি হাসিয়া ভাবিল–তুমি আর কি রান্না খেয়েছ জীবনে, কাপড়ের দোকান করেই মরেছ বই তো নয়। তেমন রান্না কখনো চোখেও দেখনি।

মুখে বলিল–বাবু, একদিনের জন্যে রেখে দেখুন না হয়। রান্না ভাল না হয়, এমনি চলে যাব। কিছু দিতে হবে না।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসাদার, লোক চেনে। হাজাবির কথার ধরণ দেখিয়া বুঝিল এ বাজে কথা বলিতেছে না। বলিল–আচ্ছা আপনি আমাদের বাড়ী যান। এই সামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে দেখবেন বড় বাড়ী-ওরে নিতাই, তুই বাপু এক বার যা তো, ঠাকুর মশায়কে বাড়ীতে শশধরের হাতে তুলে দিয়ে আয়। বলগে, ইনি এ থেকে রাঁধবেন। বুঝলি? নিয়ে যা–মাইনে-টাইনে কিন্তু, ঠাকুর মশায়, পরে কাজ দেখে ধার্য্য হবে। হ্যাঁ–সে দু-চারদিন পরে তবে–নিয়ে যা।

প্রথম দিনের কাজেই হাজারি নাম কিনিয়া ফেলিল। বাড়ীর কর্তা দশ টাকা বেতন ধার্য করিয়া দিলেন। তাঁহার গৃহিণী অসুস্থ প্রায় বারোমাস, উঠিতে বসিতে পারলেও সংসারের কাজকর্ম বড় একটা দেখেন না–দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা থাকে শ্বশুরবাড়ী একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে, আর একটি আট বছরের ছোট মেয়ে।

বাড়ীর সকলেই ভাল লোক–এতদিন চাকুরি করিয়া হাজারির যে খারাপ ধারণা হইয়াছিল পরের চাকুরি সম্বন্ধে, এখানে আসিয়া তাহা চলিয়া গেল। ইহারা জাতিতে গন্ধবণিক, বাড়ীর সকলেই ব্রাহ্মণকে খাতির করিয়া চলে–হাজারির মৃদু স্বভাবের জন্যও সে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

মাসখানেক কাজ করিবার পর হাজারি প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই বাড়ী যাইবার ছুটি চাহিল।

অনেকদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই–টেঁপিকে কত কাল দেখে নাই। দোকানের মালিক ছুটিও দিলেন।

.

গোপালনগর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী আসিতে প্রায় তিন আনা ট্রেন ভাড়া লাগে। মিছামিছি তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া লাভ নাই। হাঁটাপথে মাত্র সাত-

আট ক্রোশ হাজারিদের গ্রাম–হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। টেঁপি ছুটিয়া আসিয়া বলিল–বাবা, এসো, এসো। কোত্থেকে এলে এখন?

তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বসিয়া গেল। হাজারির মনে হইল তার সারা দেহ-মন জুড়াইয়া গেল টেঁপির হাতের পাখার বাতাসে। টেঁপির জন্য খাটিয়া সুখ–যত কষ্ট যত দুঃখ রানাঘাট হোটেলের–সব সে সহ্য করিয়াছে টেঁপির জন্য। ভবিষ্যতে আরও করিবে।

যদি বংশীধর ঠাকুরের ভাগিনেয় সেই ছেলেটির সঙ্গে—

যাক সে সব কথা।

টেঁপি বলিল–বাবা, অতসীদিদি একদিন তোমার কথা বলচিল–

–আমার কথা? হরিচরণবাবুর মেয়ে?

–হ্যাঁ বাবা, বলচিল তুমি অনেকদিন আসো নি। চল না আজ, যাবে? ওখানে গিয়ে চা খাবে এখন। কলের গান শুনবে।

এই সময় টেঁপির মা ঘাট হইতে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিল। হাসিমুখে বলিল–কখন

এলে?

হাজারি–এই তো খানিকক্ষণ। ভাল তো সব? টাকা পেয়েছিলে?

–হ্যাঁ। ভাল কথা, ওদের বাড়ীর সতীশ বলচিল রাণাঘাট থেকে পাঠানো নয় টাকা। তুমি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

–রাণাঘাটের চাকরি করিনে তো। এখন আছি গোপালনগরে। বেশ ভাল জায়গায় আছি, বুঝলে? গন্ধবণিকের বাড়ী, ব্রাহ্মণ বলে ভক্তিছেদ্দা খুব। খাওয়া-দাওয়া ভাল। কাপড়ের মস্ত দোকান, দিব্যি জলখাবার দেয় সকালে বিকেলে।

টেঁপি বলিল–কি জলখাবার দেয় বাবা!

–এই ধরো কোন দিন মুড়ি নারকেল, কোন দিন হালুয়া।

টেঁপির মা বলিল–বোসো, জিরোও; চা নেই, তা হলে করে দিতাম। টেঁপি, যাবি মা, সতীশদের বাড়ী চা আছে—(এই কথা বলিবার সময় টেঁপির মা ভুরু দুটি উপরের দিকে তুলিয়া এমন একটি ভঙ্গি করিল, যাহা শুধু নির্বোধ মেয়েরা করিয়া থাকে)– দুটো চেয়ে নিয়ে আয়।

টেঁপি বলিল–দরকার কি মা–আমি নিয়ে যাই না কেন বাবাকে অতসী দিদিদের বাড়ী? সেখানে চা হবে এখন –জলখাবার হবে এখন–

দু-দু'বার টেঁপি অতসীদের বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছে সুতরাং হাজারি মেয়ের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না। টেঁপির ইচ্ছা তাহার নিকট অনেকের হুকুমের অপেক্ষ শক্তিমান।

হরিচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন–হাজারিকে যত্ন করিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

এসো এসো হাজারি, কবে এলে? ও টেঁপি, যা তো অতসীদিদিকে বলগে আমাদের চা দিয়ে যেতে। আমিও এখনো চা খাই নি–

–বাবু, ভাল আছেন?

–হ্যাঁ। তুমি ভাল ছিলে? তোমার সেই হোটেলের কি হল? রাণাঘাটেই আছ তো?

হাজারি সংক্ষেপে রাণাঘাটের চাকুরি যাওয়া হইতে গোপালনগরে পুনরায় চাকুরি পাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা করিল।

এক সময় অতসী ও টেঁপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের সামনের ছোট গোল টেবিলটাতে চা ও খাবার রাখিল। খাবার মাত্র এক ডিশ–শুধু হাজারির জন্য, হরিচরণবাবু এখন কিছু খাইবেন না।

হাজারি বলিল–বাবু, আপনার খাবার?

–ও তুমি খাও, তুমি খাও। আমার এখন খেলে অম্বল হয়, আমি শুধু চা খাবো।

হাজারি ভাবিল–এত বড়লোক, এত ভাল জিনিস ঘরে কিন্তু খাইলে অম্বল হয় বলিয়া খাইবার জো নাই এই বা কেমন দুর্ভাগ্য। বয়স ছচল্লিশ হইলে কি হয়, অম্বল কাহাকে বলে সে কখনো জানে না। ভুতের মত খাটুনির কাছে অম্বল-টম্বল দাঁড়াইতে পারে না। তবে খাবার জোটে না এই যা দুঃখ।

অতসী কিন্তু বেশ বড় রেকাবি সাজাইয়া খাবার আনিয়াছে–ঘি দিয়া চিঁড়া ভাজা, নারকেল-কোরা, দুখানা গরম গরম বাড়ীর তৈরী কচুরী ও খানিকটা হালুয়া, বড় পেয়ালার এক পেয়ালা চা। অতসী এটুকু জানে যে টেঁপির বাবা তাহার বাবার মত অল্পভোজী প্রাণী নয়, খাইতে পারে এবং খাইতে ভালবাসে। অবস্থাও উহাদের যে খুব ভাল, তাহাও নয়। সুতরাং টেঁপির বাবাকে ভাল করিয়াই খাওয়াইতে হইবে।

হরিচরণবাবু বলিলেন–তোমার হাজারিকাকাকে প্রণাম করেছ অতসী।

হাজারি ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অতসী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতে সে চিঁড়াভাজা চিবাইতে চিবাইতে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না। অতসী কিন্তু চলিয়া গেল না, সে হাজারির সামনে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। টেঁপি গল্প করিয়াছে তাহার বাবা একজন পাকা রাঁধুনী, অতসীর কৌতূহলের ইহাই প্রধান কারণ।

হরিচরণবাবু বলিলেন–এখন ক'দিন বাড়ীতে আছ?

–আজ্ঞে, পরশু যাবো। পরের চাকরি, থাকলে তো চলে না।

–তোমার সেই হোটেল খোলার কি হোল?

–এখনও কিছু করতে পারি নি বাবু। টাকার যোগাড় না করতে পারলে তো–বুঝতেই পারছেন

–তা হোলে ইচ্ছে আছে এখনও?

–ইচ্ছে আছে খুব। শীতকালের মধ্যে যা হয় করে ফেলবো।

অতসী বলিল–কাকা গান শুনবেন?

হরিচরণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ–আমি ভুলে গিয়েছি একদম। শোন না হাজারি, অনেক নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। নিয়ে এসো তো অতসী–শুনিয়ে দাও তোমার হাজারিকাকাকে।

হাজারি ভাবিল, বেশ আছে ইহারা। তাহার মত খাটিয়া খাইতে হয় না, শুধু গান আর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যা হইয়াছে, এ সময় উনুনে আঁচ দিয়া ধোঁয়ার মধ্যে ছোট

রান্নাঘরে বসিয়া মনিব-গৃহিণীর ফর্দ মত তরকারি কুটিতেছে সে অন্য অন্য দিন। বারো মাসই তাহার এই কাজ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বারো মাস বলিয়াই পথে বাহির হইলেই তাহার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হইতেছে আজ, এমন চমৎকার সাজানো বৈঠকখানা, বড় আয়না, বেতমোড়া কেদারায় সে বসিয়া চা খাইতেছে, পাশে টেঁপি, টেঁপির বন্ধু কিশোরী মেয়েটি, কলের গান...যেন সব স্বপ্ন।

কতদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই। আজ রাণাঘাট ছাড়িয়াছে প্রায় চারি মাসের উপর, এই চারি মাস কুসুমকে সে দেখে নাই। টেঁপি মেয়ে, কুসুমও মেয়ে।

আর নতুন পাড়ার সেই বউটি! সে-ও আর এক মেয়ে। আজ কলের গানের সুমধুর সুরের ভাবুকতায় তাহার মন সকলের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলের গান বাজিল। হরিচরণবাবু মধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর কি কাজে উঠিয়া গেলেন, তখন রহিল অতসী আর টেঁপি। বাবার সামনে বোধ হয় অতসী বলিতে সাহস করিতেছিল না, হরিচরণবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে হাজারিকে বলিল কাকাবাবু, আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন?

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল–তা কেন দেব না মা? কিন্তু তুমি রান্না জানো নিশ্চয়। কি কি রাঁধতে পারো?

অতসী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝিল যাহার সহিত কথা বলিতেছে, রান্নার সম্বন্ধে সে একজন ওস্তাদ শিল্পী। সঙ্গীতের তরুণী ছাত্রী যেমন সঙ্কোচের সহিত তাহার যশস্বী সঙ্গীত শিক্ষকের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে কথা বলে--তেমনি সঙ্কোচে বলিল–তা পারি সব, শুক্তুনি, চচ্চড়ি, ডাল, মাছের ঝোল–মা তো বড় একটা রান্নাঘরে যেতে পারেন না, তার মন খারাপ, আমাকেই সব করতে হয়। টেঁপি বলচিল আপনি নিরিমিষ রান্না বড় চমৎকার করেন, আমায় দেবেন শিখিয়ে কাকাবাবু?

–টেঁপি বুঝি এই সব বলে তোমার কাছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার, ওর কথা বাদ দাও

–না কাকাবাবু, আমি অন্য জায়গাতেও শুনেছি আপনার রান্নার সুখ্যাতি। সবাই তো বলে।

পরে আবারের স্বরে বলিল–আমাকে শেখাতে হবে কাকাবাবু–আমি ছাড়চি নে, আমি টেঁপিকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, আপনি কবে আসবেন আমি খোঁজ নিই–ও বলেনি আপনাকে? না কাকাবাবু, আমায় শেখান আপনি। আমার বড় শখ ভাল রান্না শিখি।

হাজারি বলিল–ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্ততঃ ঝাড়া দু'মাস তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে–তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরে দেবো, এ না হলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপির মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে

ফাঁকি দেবো না মা, ছেলেমানুষ, শিখতে চাই শিখিয়ে দিতে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি করে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা!

অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মুখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা–বাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ, আনাড়ির কথাও নয়। তাহার চোখে হাজারি দরিদ্র রাঁধুনী বামুন পিতা নয়–যে ব্যবসায় সে ধরিয়াছে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ, পাকা শিল্পী।

হাজারির প্রতি তাহার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

.

পরদিন হাজারি ঘুম হইতে উঠিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অতসীকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইল। বড়মানুষের মেয়ে অতসী, অসময়ে কি মনে করিয়া তাহার মত গরীব মানুষের বাড়ী আসিল?

টেঁপি বাড়ী ছিল না, টেঁপির মা-ও অতসীকে আসিতে দেখিয়া খুব অবাক হইয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, সেই ভাবে জমিদার-বাটীর মেয়ের অভ্যর্থনা করিল।

অতসী বলিল–কাকাবাবু বাড়ী নেই খুড়ীমা?

টেঁপির মা বলিল –হ্যাঁ মা, এসো আমার সঙ্গে, ঐ কোণের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে।

–টেঁপি কোথায়?

–সে মূলোর বীজ আনতে গিয়েছে সদগোপ-বাড়ীতে। এল বলে, বসো, বসো। দাঁড়াও আসনখানা পেতে–

অতসী টেঁপির মার হাত হইতে আসনখানা ক্ষিপ্র ও চমৎকার ভঙ্গিতে কাড়িয়া লইয়া কেমন একটা সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিল–রাখুন আসন খুড়ীমা, ভারি আমি একেবারে গুরুঠাকুর এলুম কিনা– তা আবার যত্ন করে আসন পেতে দিতে হবে —

এই হাসি ও এই ভঙ্গিতে সুন্দরী মেয়ে অতসীকে কি সুন্দরই দেখাইল!–টেঁপির মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতসীর দিকে। ইতিমধ্যে হাজারি সে স্থানে আসিয়া বলিল–কি মনে করে সকালে লক্ষ্মী-মা?

অতসী হাজারির কাছে গিয়া বলিল–আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

–কি কথা মা?

–চলুন ওদিকে, একটু আড়ালে বলব।

হাজারি ভাবিয়াই পাইল না, এমন কি গোপনীয় কথা অতসী তাহাকে আড়ালে বলিতে আসিয়াছে এই সকালবেলায়। দাওয়ায় ছাঁচতলার দিকে গিয়া বলিল–কি কথা মা?

অতসী বলিল–কাকাবাবু, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—

হাজারি বিস্মিত মুখে বলিল–বলবো না মা, বলো তুমি।

–আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, কিন্তু সে তো এবার নয়, সেবার। তোমায় কে বললে এসব কথা?

–সে সব কিছু বলব না। আমি আপনাকে টাকা দেবো, আপনি হোটেল খুলুন—

–তুমি কোথায় পাবে?

অতসী হাসিয়া বলিল–আমার কাছে আছে। দুশো টাকা দিতে পারি–আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দোবো কিন্তু, বাবা যেন জানতে না পারেন। কেউ জানতে না পারে।

হাজারির চোখে জল আসিল।

এ পর্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে তাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে — তিনজনেই সমান সরলা, তিনজনেই অনাত্মীয়া–তবে অতসী জমিদারবাড়ীর সুন্দরী, শিক্ষিত মেয়ে, সে যে এতখানি টান টানিবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরণের আশ্চর্য ঘটনা!

হাজারি বলিল–কিন্তু তুমি একথা শুনলে কোথায় বলতে হবে মা।

অতসী হাসিয়া বলিল–সে কথা বলবো না বলেছি তো।

–তা হোলে টাকাও নেবো না। আগে বলো কে বলেছে?

–আচ্ছা, নাম করলে তাকে কি বলবেন না বলুন–

–কাকে কি বলবো বুঝতে পারছি নে তো? বলাবলি কথা কি আছে এর মধ্যে? আচ্ছা, বলবো না। বলো তুমি।

–টেঁপি বলেছিল, বাবার ইচ্ছে একটা হোটেল খোলেন, আমার বাবার কাছে নাকি টাকা চেয়েছিলেন ধার–তা বাবা দিতে পারেন নি। দেখুন কাকাবাবু, দাদা মারা যাওয়ার পরে বাবার মন খুব খারাপ। ওঁকে বলা না বলা দুই সমান। আমি ভাবলাম আমার হাতে তো টাকা আছে–কাকাবাবুকে দিই গে–ওঁদের উপকার হবে। আমার কাছে তো এমনি পড়েই আছে। আপনার হোটেল নিশ্চয়ই খুব ভাল

চলবে, আপনারা বড়লোক হয়ে যাবেন। টেঁপিকে আমি বড় ভালবাসি, ওর মনে যদি আহ্লাদ হয় আমার তাতে তৃপ্তি। টাকা বাক্সে তুলে রেখে কি হবে?

–মা, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারি নে।

অতসী যেন বড় দমিয়া গেল। হাজারির সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ছেলেমানুষী তর্ক করিল, বাবাকে না জানাইয়া টাকা লইলে দোষ কি!

শেষে বলিল–আমি টেঁপিকে এ টাকা দিচ্ছি।

–তা তুমি দিতে পারো না। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই মা। তুমি তো লেখাপড়া জানো, ভেবে দেখ।

–আচ্ছা, আমায় লাভের অংশ দেবেন তা হোলে?

হাজারির হাসি পাইল। কুসুম, গোয়ালা-বাড়ীর সেই বউটি, অতসী–সবাই এক কথা বলে। ইহারা সকলেই মহাজন হইয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। মজার ব্যাপার বটে!

–না মা, সে হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্বাদ করি রাজরাণী হও, তখন তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুকে যা খুশি দিও, এখন না।

অতসী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

হাজারির ইচ্ছা হইল টেঁপিকে ডাকিয়া বকিয়া দেয়। এসব কথা অতসীর কাছে বলিবার তাহার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু অতসীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে, টেঁপিকে ইহা লইয়া কিছু বলিলেই অতসীর কানে গিয়া পৌঁছাইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

.

সেদিন বিকালে গোয়ালপাড়ায় বেড়াইতে গিয়া কুসুমের বাপের বাড়ীতে শুনিল রাণাঘাটে কুসুমের অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল, কোনোরূপে এযাত্রা সামলাইয়া গিয়াছে। সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই, কথায় কথায় কুসুমের কাকা ঘনশ্যাম ঘোষ বলিল–মধ্যে রানাঘাটে পনেরো দিন ছেলাম দাদাঠাকুর, ছানার কাজ এ মাসটা বড্ড মন্দা।

হাজারি বলিল–পনেরো দিন ছিলে? কেন হঠাৎ এ সময়—

তারপরেই ঘনশ্যাম কুসুমের কথাটা বলিল।

হাজারির কেবল মনে হইতে লাগিল কুসুমের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নাই–একবার তাহার সহিত দেখা করিতে গেলে কেমন হয়? মনটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে তাহার অসুখের খবর শুনিয়া। জীবনে ওই একটি মেয়ের উপর তাহার

অসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

ইচ্ছা হইল কুসুমের সম্বন্ধে ঘনশ্যামকে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহা করা চলিবে না। সে মনের আকুল আগ্রহ মনেই চাপিয়া শুধু কেবল উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল

–এখন সে আছে কেমন?

–তা এখন আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে সেরে উঠেছে–তবে বড় কষ্ট যাচ্ছে সংসারের, দুধ-দই বেচে তো চালাতো, আজ মাসখানেকের ওপর শয্যাগত অবস্থা। ইদিকি আমার সংসারের কাণ্ড তো দেখতেই পাচ্চেন–কোত্থেকে কি করি দাদাঠাকুর–

হাজারি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। যেন কুসুমের সম্বন্ধে তাহার সকল আগ্রহ ফুরাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে হাজারি ভাবিল রাণাঘাটে তাহাকে যাইতেই হইবে। কুসুমের অসুখ শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কালই একবার সে রাণাঘাট যাইবে।

পথে অতসীর পিতা হরিবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন–এই যে হাজারি, কোথা থেকে ফিরচো? তা এসো আমার এখানে, চলো চা খাবে।

বৈঠকখানায় হাজারিকে বসাইয়া হরিবাবু বলিলেন–বসো, আমি বাড়ীর ভেতর থেকে আসছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে যতদিন বাড়ী আছ, আসা-যাওয়া একটু করো হে, কেউ আসে না, একলাটি সারাদিন বসে বসে আর সময় কাটে না। দাঁড়াও আসছি–

হরিবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতসী একখানা রেকাবিতে খানকতক লুচি, বেগুনভাজা এবং একটু আখের গুড় লইয়া আসিল। হাজারির সামনের টেবিলে রেকাবি রাখিয়া বলিল–আপনি ততক্ষণ খান কাকাবাবু, চা দিয়ে যাচ্ছি।

হাজারি বলিল–বাবু আসুন আগে

–বাবা তো খাবার খাবেন না, তিনি খাবেন শুধু চা। আপনি খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নিন। চা একসঙ্গে দেবো—

অতসী চলিয়া গেল না, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। হাজারি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিবার কিছু খুলিয়া না পাইয়া বলিল–টেঁপি আজ আসে নি মা?

–না, এ বেলা তো আসে নি।

হাজারি আর কিছু কথা না পাইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল অতসী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অতসী সুন্দরী মেয়ে, টেঁপির বন্ধু হইলেও বয়সে টেঁপির অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের বড়–এ বয়সের সুন্দরী মেয়ের সহিত নির্জন ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইবার অভিজ্ঞতাও হাজারির নাই–সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অতলী হঠাৎ বলিল–কাকাবাবু আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল–রাগ? রাগ কিসের মা–

–ওবেলার ব্যাপার নিয়ে?

–না না, এতে আমার রাগ হবার কিছু নেই, বরং তোমারই–

–না শুনুন কাকাবাবু, আমি তারপর ভেবে দেখলাম আপনি আমার টাকা নিলে খুব ভাল করতেন। জানেন, আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমি কেবলই ভাবি দাদা বেঁচে থাকলে বাবার বিষয় আমি পেতাম না, এখন কিন্তু আমি পাবো। কিন্তু ভগবান জানেন কাকাবাবু, আমি এক পয়সা চাইনে বিষয়ের। দাদা বিষয় ভোগ করতো তো করতো–নয় তো বাবা বিষয় যা খুশি করে যান, উড়িয়ে যান, পুড়িয়ে যান, দান করুন–আমার যেন এ না মনে হয় আজ দাদা থাকলে এ বিষয় আমি

পেতাম না দাদাই পেতো। বিষয়ের জন্যে যেন দাদার ওপর কোনোদিন–আমার নিজের হাতে যা আছে তাও উড়িয়ে দেবো।

অতসীর চোখ জলে টলটল করিয়া আসিল, সে চুপ করিল।

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল–না মা, ও সব কথা কিছু ভেবো না। তোমার বাবা মাকে তুমিই বুঝিয়ে রাখবে, তুমিই ওঁদের একমাত্র বাঁধন–তুমি ওরকম হোলে কি চলে? ছি—মা–

হাজারি সত্যই অবাক হইয়া গেল, ভাবিল–এইটুকু মেয়ে, কি উঁচু মন দ্যাখো একবার। বড় বংশ নইলে আর বলেছে কাকে? এ কি আর বেচুবাবুর হোটেলের পদ্মঝি?

হাজারি বলিল–আচ্ছা মা আমাকে টাকা দেবার তোমার ঝোঁক কেন হোল বল তো? তোমরা মেয়েরা যদি ভাল হও তো খুবই ভাল, আর মন্দ হও তো খুবই মন্দ।–আমায় তুমি বিশ্বাস কর মা?

–আপনি বুঝে দেখুন। না হোলে আপনাকে টাকা দিতে চাইব কেন?

–তোমার বাবাকে না জানিয়ে দেবে?

–বাবাকে জানালে দিতে দেবেন না। অথচ আমার টাকা পড়ে রয়েছে, আপনার

উপকার হবে, আমি জানি আপনাদের সংসারের কষ্ট। টেঁপির বিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাবেন টাকা, কোথায় পাবেন কি! আপনার রান্নার যেমন সুখ্যাতি, আপনার হোটেল খুব ভাল চলবে। ছ-বছরের মধ্যে আমার টাকা আপনি আমায় ফেরত দিয়ে দেবেন।

হাজারি মুগ্ধ হইয়া গেল অতসীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া। বলিল–আচ্ছা তুমি দিও টাকা, আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলবো–তোমার মুখ দিয়ে ভগবান এ কথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবান কথা কন।

অতলী হাসিয়া বলিল–তা হোলে নেবেন ঠিক?

–ঠিক বলচি। এবার ঘুরে জায়গা দেখে আসি। রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকালেই, হয় সেখানে, নয় তো গোয়াড়ির বাজারে জায়গা দেখবো। খবর পাবে তুমি, আবার ঘুরে আসচি তিন-চার দিনের মধ্যেই।

অতসী বলিল–বাবার আহ্নিক করা হয়ে গিয়েছে, বাবা আসবেন, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি। শুনুন কাকাবাবু, আপনি যেদিন বাবার কাছে হোটেলের জন্যে টাকা চান, আমি সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলাম। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি আমার যা টাকা জমানো আছে আপনাকে তা দেবে।

–আচ্ছা বল তো মা একটা সত্যি কথা–আমার ওপর তোমার এত দয়া হোল কেন?

–বলবো কাকাবাবু? আপনার দিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হোত আপনি খুব সরল লোক আর ভালো লোক। আমার মনে বড় কষ্ট হয় আপনাকে দেখলে সত্যি বলচি–তবে দয়া বলছেন কেন? আমি আপনার মেয়ের মত না?

বলিয়াই অতসী এক প্রকার কুণ্ঠা ও লজ্জা মিশ্রিত হাসি হাসিল।

হাজারি বলিল–তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে তাই দয়ার কথা বলচি। নইলে কি সন্তানের ওপর এত মমতা হয়? তুমি সুখে থাকো, রাজরাণী হও–এই আশীর্বাদ করচি। আমি তোমার গরীব কাকা, এর বেশী আর কি করতে পারি।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল এবং আর একটুও না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রে সারারাত্রি হাজারি ঘুমাইতে পারিল না। অতসীর মত বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের স্নেহ আদায় করার মধ্যে একটা নেশা আছে, হাজারিকে সে নেশায় পাইয়া বসিল। তাহার জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা।

সকালে উঠিয়া সে রাণাঘাটে রওনা হইল। বেশী নয় পাঁচ ছ’ মাইল রাস্তা, হাঁটিয়া বেলা সাড়ে আটটার সময় স্টেশনের নিকটে সেগুন-বনে গিয়া পৌঁছিল।

রেল-বাজারের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার ইচ্ছা হইল একবার তাহার পুরাতন কর্ম্মস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়। আজ প্রায় পাঁচ মাস সে রাণাঘাট ছাড়া। দূর হইতে বেচু চক্রবর্ত্তীর হোটেলের সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহার মন উত্তেজনায় ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গত ছয় বৎসরের কত স্মৃতি জড়ানো আছে ওই টিনের চালওয়ালা ঘরখানার সঙ্গে।

হোটেলের গদিঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে বেচু চক্কত্তির সম্মুখে পড়িয়া গেল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা, খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেচু চক্কত্তি পুরোনো দিনের মত গদিঘরে তক্তপোষের উপর হাতবাক্সের সামনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হাজারি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন–আরে এই যে হাজারিঠাকুর! কি মনে করে? কোথায় আছ আজকাল? ভাল আছ বেশ?

হাজারি এক মুহূর্তে আবার যেন বেচু চক্রবর্তীর বেতনভুক রাঁধুনী বামুনে পরিণত হইল, তেমনি ভয়, সঙ্কোচ ও মনিবের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব তার সারা দেহমনে হঠাৎ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া ভর করিল।

সে পুরোনো দিনের মত কাঁচুমাচু ভাবে বলিল–আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় এক রকম– আজ্ঞে, তা বাবু বেশ ভাল আছেন?

–আজকাল আছ কোথায়?

–আজ্ঞে গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ীতে আছি।

–বাড়ীর কাজ? কদ্দিন আছ?

–এই চার মাস আছি বাবু।

–তা বেশ, তবে সেখানে মাইনে আর কত পাও? হোটেলের মত মাইনে কি করে দেবে গেরস্ত ঘরে?

বেচু চক্কত্তির এই কথার মধ্যে হাজারি এক ধরণের সুরের আঁচ পাইল। ব্যাপার কি? বেচু চক্কত্তি কি আবার তাহাকে হোটেলে রাখিতে চান? তাহার কৌতূহল হইল শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি দাঁড়ায়।

সে বিনীত ভাবে বলিল–ঠিক বলেছেন বাবু, তা তো বেশী নয়। গেরস্তবাড়ী কোথা থেকে বেশী মাইনে দেবে?

–তারপর কি এখন আমাদের এখানে এসেছ ঠাকুর?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

–কি মনে করে বলো তো? থাকবে এখানে?

হাজারি কিছুমাত্র না ভাবিয়াই বলিল–সে বাবুর দয়া।

–তা বেশ বেশ, থাকো না কেন, পুরোনো লোক, বেশ তো। যাও কাজে লেগে যাও। তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ? কই?

–না বাবু, আগে থেকে কি করে আনি। সে সব গোপালনগরে রয়েছে। চাকুরিতে দয়া করে রাখবেন কি না রাখবেন না জেনে কি করে সে-সব–

–আচ্ছা আচ্ছা, যাও ভেতরে যাও। রতন ঠাকুরের অসুখ করেছে, বংশী একা আছে, তুমি কাজে লাগো এবেলা থেকে। ভাঙা ভাংটো এ মাসের ক'টা দিনের মাইনে তুমি আগাম নিও।

হাজারি কৃতজ্ঞতার সহিত বেচু চক্কত্তিকে আর একবার ঘাড় খুব নীচু করিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কলের পুতুলের মত রান্নাঘরের দিকে চলিল।

সামনেই বংশীঠাকুর।

তাহাকে দেখিয়া বংশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল–বাবু ডেকে বহাল করলেন যে ফের! ভাল আছ বংশী? তোমার সেই ভাগ্নেটি ভাল আছে?

বংশী বলিল–আরে এস এস হাজারি-দা! তোমার কথা প্রায়ই হয়। তুমি বেশ ভাল আছ? এতদিন ছিলে কোথায়?

–ডেকে কি চাপিয়েছ? সরো, হাতাটা দাও। এখনও মাছ হয়নি বুঝি? যাও, তুমি গিয়ে মাছটা চড়িয়ে দাও! তেলের বরাদ্দ সেই রকমই আছে না বেড়েচে?

বংশী বলিল–একবার টেনে নিও একটু। অনেক দিন পরে যখন এলে। দাঁড়াও ডালটায় নুন দেওয়া হয়নি এখনও–দিয়ে দাও।

বলিয়া সে দরমার আড়ালে গাঁজা সাজিতে গেল।

চুপি চুপি বলিল–তোমায় বহাল করেছে কি আর সাধে? এদিকে তুমি চলে যাওয়াতে হোটেলের ভয়ানক দুর্নাম। সেই কলকাতার বাবুরা দু'তিন দল এসেছিল, যেই শুনলে তুমি এখানে নেই–তারা বল্লে সেই ঠাকুরের রান্না খেতেই এখানে আসা। সে যখন নেই, আমরা রেলের হোটেলে খাবো। হাটুরে খদ্দেরও অনেক ভেঙ্গে গিয়েছে–যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। তোমায় বাবু বহাল করলেন কেন জান? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তোমাকে পেলে লুফে নেয় এক্ষুনি। তোমার অনেক খোঁজ করেছে ওরা।

বংশীর হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া দম মারিয়া হাজারি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি হইতে কি হইয়া গেল! চাকুরি লইতে সে তো রাণাঘাট

আসে নাই। কিন্তু পুরাতন জায়গায় পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সে বুঝিয়াছে এতদিন তাহার মনে সুখ ছিল না। এই বেচু চক্কত্তির হোটেল, এই দরমার বেড়া দেওয়া রান্নাঘর, এই পাথুরে কয়লার স্তূপ, এই হাতাবেড়ি এই তার অতি পরিচিত স্বর্গ। ইহাদের ছাড়িয়া কোথায় সে যাইবে? ভগবান এমন সুখের দিনও মানুষের জীবনে আনিয়া দেন?

বংশীর হাতে কলিকা ফিরাইয়া দিয়া সে খুশির সহিত বলিল–নাও, আর একবার টান দিয়ে নাও। ডালে সম্বরা দিই গে–এবেলা এখনও বাজার আসে নি নাকি?

বংশী বলিল–মাছটা কেবল এসেছে। তরকারিপাতি এল বলে, গোবরা গিয়েছে। গোবরা নতুন চাকর–বেশ লোক, আমার ওপর ভারি ভক্তি। এলে দেখো এখন।

এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া জন দুই খরিদ্দার খাইবার ঘরে ঢুকিতেই হাজারি অভ্যাস মত পুরাতন দিনের ন্যায় হাঁকিয়া বলিল–বসুন বাবু, জায়গা করাই আছে–নিয়ে যাচ্ছি। বসে পড়ুন। মাছ এখনও হয়নি এত সকালে কিন্তু–শুধু ডাল আর ভাজা–বংশী ভাত নিয়ে এস হে–ডালটায় সম্বর দিয়ে নিই– বেলাও এদিকে প্রায় দশটা বাজে। কেষ্টনগরের গাড়ী আসবার সময় হোল। আজকাল ইষ্টিশনের খদ্দের আনে কে?

হাজারি যেন দেহে-মনে নতুন বল ও উৎসাহ পাইয়াছে। হাজার হোক, শহর বাজার জায়গা রাণাঘাট, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া –এখানে একবার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে?

একটা জায়গার মত জায়গা।

এমন সময় একজন কালোমত ছোকরা চাকর তরকারি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় রান্নাঘরে নীচু হইয়া ঢুকিল—পিছনে পিছনে পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিতে বলিতে আসিতেছিল—বাবাঃ, বেগুন আর কেনবার জো নেই রাণাঘাটের বাজারে। আট পয়সা করে বেগুনের সের ভূভারতে কে শুনেছে কবে—যত ব্যাটা ফড়ে জুটে বাজার একেবারে আগুন করে রেখেচে—সব চল্লো কলকেতা, সব চল্লো কলকেতা—তা গরীব গুরবো লোক কেনেই বা কি আর খায়ই বা কি—ও বংশী, ঝুড়িটা ধরে নামাও ওর মাথা থেকে—দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে সম্মুখে থালায় অন্নপরিবেশনরত হাজারিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে যেন কাঠ হইয়া গেল।

হাজারি পদ্মঝিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া গেল। তাহার পুরাতন ভয় কোথা হইতে সেই মুহূর্তেই আসিয়া জুটিল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আমতা আমতা সুরে বলিল—এই যে পদ্মদিদি ভাল আছ বেশ? হে-হে-আমি—

পদ্মঝি বিস্ময়ের ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বংশী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল—ঝুড়িটা নামিয়ে নেও না ঠাকুর? ও সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল ঝুড়ি মাথায়—মাছ হোল? তারপর হাজারির দিকে তাচ্ছিল্যের ভাবে চাহিয়া বলিল—কখন এলে?

—আজই এলাম পদ্মদিদি।

–আজ এবেলা এখানে থাকবে?

বংশী ঠাকুর বলিল–হাজারিকে যে বাবু বহাল করেছেন আবার। ও এখানে কাজ করবে।

পদ্মঝি কঠিন মুখে বলিল–তা বেশ। রান্নাঘরে আর না দাঁড়াইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

বংশী ঠাকুর অনুচ্চস্বরে বলিল–পদ্মদিদি চটেছে–বাবুর সঙ্গে এইবার একচোট বাধবে–

পদ্মকে সারাদুপুর আর রান্নাঘরের দিকে দেখা গেল না। হাজারির মন ছটফট করিতে ছিল, কতক্ষণে কাজ সারিয়া কুসুমের সঙ্গে গিয়া দেখা করবে। সে দেখিল সত্যই হোটেলের খরিদ্দার কমিয়া গিয়াছে–পূর্বে যেখানে বেলা আড়াইটার কমে কাজ মিটিত না, আজ সেখানে বেলা একটার পরে বাহিরের খরিদ্দার আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হাজারি বলিল–হ্যাঁ বংশী, থার্ড ক্লাসের টিকিট মোট ত্রিশখানা! আগে যে সত্তর-পঁচাত্তর খান একবেলাতেই হোত? এত খদ্দের গেল কোথায়?

বংশী বলিল–তবুও তো আজকাল একটু বেড়েছে। মধ্যে আরও পড়ে গিয়েছিল,

কুড়িখান থার্ড ক্লাসের টিকিট হয়েছে এমন দিনও গিয়েছে। লোক সব যায় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। ওদের এবেলা একশো ওবেলা ষাট-সত্তর খদ্দের। হাটের দিন আরও বেশ। আর খদ্দের থাকে কোথা থেকে বলো! মাছের মুড়ো কোনোদিন খদ্দেররা চেয়েও পাবে না। বড় মাছ কাটা হোলেই মুড়ো নিয়ে যাবেন পদ্মদিদি। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। তার ওপর আজকাল যা চুরি শুরু করেছে পদ্মদিদি–সে সব কথা এরপর বলবো এখন। খেয়ে নাও আগে।

হোটেল হইতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হাজারি বাহির হইয়া মোড়ের দোকানে এক পয়সার বিড়ি কিনিয়া ধরাইল। চূর্ণীর ধারে তাহার সেই পরিচিত গাছতলাটায় কতদিন বসা হয় নাই–সেখানে গিয়া আজ বসিতে হইবে। পথে রাধাবল্লভতলায় সে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। আজ তাহার মনে যথেষ্ট আনন্দ, রাধাবল্লভ ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এমন দিনও তাহাকে জুটাইয়া দিয়াছেন! আজ ভোরে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সে কি ইহা ভাবিয়াছিল? অস্বপনের স্বপন। চোর বলিয়া বদনাম রটাইয়া যাহারা তাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই কিনা যাচিয়া তাহাকে চাকুরিতে বহাল করিল।

চূর্ণী নদীর ধারে পরিচিত গাছতলাটায় বসিয়া সে বিড়ি টানতে টানিতে এক পয়সার বিড়ি শেষ করিয়া ফেলিল মনের আনন্দে। কুসুমের বাড়ী এখন সব ঘুমাইতেছে, গৃহস্থ বাড়ীতে দেখাশুনা করিবার এ সময় নয়–বেলা কখন পড়িবে? অন্ততঃ চারটা না বাজিলে কুসুমের ওখানে যাওয়া চলে না। এখনও দেড় ঘণ্টা দেরি।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী হইতে তাহার কাপড়ের পুঁটুলিটা এক দিন গিয়া আনিতে হইবে। গত মাসের মাহিনা বাকি আছে, দেয় ভালো, না দিলে আর কি করা যাইবে?

আজ একটু রাত থাকিতে উঠিবার দরুন ভাল ঘুম হয় নাই–তাহার উপরে অনেক দিন পরে হোটেলের খাটুনি, পাঁচক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া স্বগ্রাম হইতে রাণাঘাট আসা প্রভৃতির দরুন হাজারির শরীর ক্লান্ত ছিল–গাছতলার ছায়ায় কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল চারিটা বাসিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কুসুমের বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়ল।

কুসুম নিজে আসিয়াই খিল খুলিল এবং হাজারিকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল– জ্যাঠা মশায়! কোথা থেকে? আসুন—আসুন–

তার পরেই সে নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করল। হাজারি হাসিমুখে বলিল–এস এস মা, কল্যাণ হোক। ছেলেপিলে সব ভাল তো? এত রোগা হয়ে গিয়েছ, ইস। তোমার কাকার মুখে তোমার বড্ড অসুখের কথা শুনলাম।

কুসুম বাড়ীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া বসাইল। বলিল–ভয় নেই জ্যাঠামশায় মরচি নে অত শীগগির। আপনি সেই যে গেলেন,

আর কোনো খবর নেই। অসুখের সময় আপনার কথা কত ভেবেছি জানেন জ্যাঠামশায়? মরেই যদি যেতাম, দেখা হোত আর? অখদ্দে আপদ না হোলে মরেই তো–

–ছি ছি, মা, ও রকম কথা বলতে আছে?

–কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি? আজ কোথা থেকে এলেন?

–এঁড়োশোলা থেকে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল–হেঁটে এসেছেন বুঝি? খাওয়া হয়নি?

হাজারি হাসিয়া বলিল–ব্যস্ত হয়ো না মা। বলচি সব। সকালে বেরিয়েছিলাম এঁড়োশোলা থেকে, বলি যাই একবার রাণাঘাট, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব হোল। বেল বাজারে যেমন বাবুর হোটেলে দেখা করতে যাওয়া, অমনি বাবু বহাল করলেন কাজে। সেখানে কাজ সাঙ্গ করে চূর্ণীর ধারে বেড়িয়ে এই আসছি।

–ওমা আমার কি হবে? ওরা আবার আপনাকে ডেকে বহাল করেছে। তবে মিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়েছিল কেন? পদ্ম আছে তো?

–পদ্ম নেই তো যাবে কোথায়? আছে বলে আছে! খুব আছে।

পরে গর্বের সুরে বলিল–আমায় না নিলে হোটেল যে ইদিকে চলে না। খদ্দেরপত্তর তো আদ্ধেক ফর্সা। সব উঠেছে গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের হোটেলে।

হাজার হোক, হোটেলের মালিক, সুতরাং তাহার মনিবের সমশ্রেণীর লোক। হাজারি যদু বাঁড়ুয্যের নামটা সমীহ করিয়াই মুখে উচ্চারণ করিল।

কুসুম যেন অবাক হইয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল–বসুন, জ্যাঠামশায়, আসছি আমি–

–না, না, শোনো। এখন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যেন কিছু কোরো না

–আপনি বসুন তো। আসছি আমি–

কোনো কথাই খাটিল না। কুসুম কিছুক্ষণ পরে এক বাটি গরম দুধ ও দু-খানি বরফি সন্দেশ রেকাবিতে করিয়া আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল–একটু জল সেবা করুন।

–ওই তো তোমাদের দোষ, বারণ করে দিলেও শোনো না—

কুসুম হাসিমুখে বলিল–কথা শুনবো এখন পরে–দুধটা সেবা করুন সবটা–ভালো দুধ–বাড়ীর গরুর। ঘন করে জ্বাল দিয়েছি, দুপুর থেকে আকার ওপর বসানো ছিল।

–তুমি বড় মুশকিলে ফেললে দেখচি মা!...নাঃ

হাজারিকে পান সাজিয়া দিয়া কুসুম বলিল–জ্যাঠামশায় হোটেল ভাল লাগছে?

–তা মন্দ লাগছে না। আজ বেশ ভালই লাগলো। তবে ভাবছি কি জানো মা, এই রেল বাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

–শুধু বেশ চলে না। জ্যাঠামশায়, খুব ভাল চলে। আপনার নিজের নামে হোটেল দিলে সব হোটেল কানা পড়ে যাবে।

–তোমার তাই মনে হয় মা?

–হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। খুলুন আপনি হোটেল।

–আর একজনও একথা বলেছে কালই। তোমার মত সেও আর এক মেয়ে আমার। আমাদের গাঁয়েই–

–কে জ্যাঠামশায়?

–হরিবাবুর মেয়ে, অতসী ওর নাম, টেঁপির বন্ধু। খুব ভাব দুজনে। সে আমায় কাল বলচিল–

আমাদের বাবুর মেয়ে? আমি দেখিনি কখনো। বয়েস কত?

–ওরা নতুন এসেছে গাঁয়ে, কোথা থেকে দেখবে। বয়েস ষোল-সতেরো হবে। বড় ভাল মেয়েটি।

–সবাই যখন বলছে, তাই করুন আপনি। টাকা আমি দেব–

–অতসীও দেবে বলেছে। দু-জনের কাছে টাকা নিলে জাঁকিয়ে হোটেল দেবে। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আধুলি নিয়ে শেষে যদি লোকসান যায়, তবে একুল ওকূল দুকুল গেল। বরং অতসী বড় মানুষের মেয়ে–তার দুশো টাকা গেলে কিছু তার আসে যাবে না–

–না, আমার টাকাও খাটিয়ে দিতে হবে। সে শুনছি নে।

–আমি দুজনের টাকাই নেবো। কাল থেকে জায়গা দেখছি রও। তবে টাকা গেলে আমায় দোষ দিও না।

–জ্যাঠামশায়, আপনি হোটেল খুললে টাকা ডুববে না–আমি বলচি। এর পরেও যদি ডোবে, তবে আর কি হবে। আপনার দোষ দেবো না।

উঠিবার সময় কুসুম বলিল, জ্যাঠামশায়, পরশু সংক্রান্তির দিন বাড়ীতে

সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবো ভাবছি, আপনি এখানে রাত্রে সেবা করবেন।

–তা কি করে হবে মা? আমি রাতে বারটার কম ছুটি পাবো না!

–তবে তার পর দিন দুপুরে? বেলা একটার সময় আসবেন। আমি লুচি ভেজে রাখবো, আপনি এসে তরকারি করে নেবেন। কথা রইলো, আসতেই হবে কিন্তু জ্যাঠামশায়।

হোটেলে ফিরিয়া সে বড় ডেকে রান্না চাপাইয়া দিল। বংশী ঠাকুর এবেলা এখনো আসে নাই, হাজারি অত্যন্ত খুশির সহিত চারদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল–সেই অত্যন্ত পরিচিত পুরাতন রান্নাঘর, এমন কি একখানা পুরানো লোহার খুন্তি পাঁচমাস আগে টিনের চালের বাতার গায়ে সেই গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিল এখনও সেখান সেই স্থানেই মরিচা-পড়া অবস্থায় গোঁজাই রহিয়াছে। সেই বংশী, সেই রতন, সেই পদ্মদিদি।

বংশী আসিয়া ঢুকিল। হাজারি বলিল–আজ পেঁপে কুটিয়ে দাও তো বংশী, একবার পেঁপের তরকারী মন দিয়ে রাঁধি অনেক দিন পরে। একদিনে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের হোটেল কানা করে দেবো।

গদির ঘরে পদ্মঝিয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া বংশী বলিল–ও পদ্মদিদি, শোনো ইদিকে–ও পদ্মদিদি—

পদ্মঝি থার্ডক্লাসের খাওয়ার ঘর পার হইয়া রান্নাঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া বলিল–কি হয়েছে?

বংশী বলিল–কি কি রান্না হবে এবেলা? হাজারি বলেছে পেঁপের তরকারি রাঁধবে ভাল করে। দু-একটা ভালমন্দ আমাদের দেখাতে হবে আজ থেকে। পেঁপে তো রয়েছে কি বল?

পদ্মঝি বলিল–না পেঁপে কাল হবে। আজ এবেলা বিলিতি কুমড়ো হোক। আর কুচো মাছের ঝাল করো। সাত আনা সের চিংড়ি ওবেলা গিয়েছে–এবেলা দেখি কি মাছ পাওয়া যায়।

হাজারি বলিল–পদ্মদিদি, আজ একটু মাংস হোক না?

পদ্মঝি এতক্ষণ পর্যন্ত হাজারির সঙ্গে সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করে নাই। সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল–মাংস বুধবার হয়ে গিয়েছে। আজ আর হবে না–বরং শনিবার দিনে হবে।

হাজারি অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল পদ্ম তাহার সহিত কথা বলাতে এবং পুলকের প্রথম মুহূর্ত কাটিতে না কাটিতে তাহাকে একেবারে বিস্মিত ও চকিত করিয়া দিয়া পদ্মঝি জিজ্ঞাসা করিল–এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি সাগ্রহে বলিল–আমার কথা বলছ পদ্মদিদি?

–হ্যাঁ।

–গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম–তারপর রাণাঘাটে আজ এসেছিলাম বেড়াতে। তা বাবু বল্লেন–

–হুঁ, বেশ থাকো না। তবে বাইরে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি। ওসব একদম বন্ধ করে দিয়েছেন বাবু। যা পারো এখানে খেও–বুঝলে?

–না বাইরে নিয়ে যাবো কেন পদ্মদিদি? তা নিয়ে যাবো না।

–তোমার সেই কুসুম কেমন আছে? দেখা করতে যাওনি? পদ্মঝিয়ের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও শ্লেষের আভাস।

হাজারি লজ্জিত ও অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল–কুসুম? হ্যাঁ তা কুসুম—ভালই–

পদ্মঝি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় যেন হাসিল। অন্ততঃ হাজাবির তাহাই মনে হইল। পদ্মঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বংশী বলিল–যাক চাকরি তোমার পাকা হয়ে গেল হাজারিদা–দুপুরের পর আমরা চলে গেলে বোধ হয় কর্ত্তা-গিন্নীতে পরামর্শ হয়েছে–চলো এক ছিলিম সাজা যাক।

হাজারি হাসিল। সব দিকেই ভালো, কিন্তু পদ্মদিদি কুসুমের কথাটা তুলিল কেন

আবার ইহার মধ্যে? ভারি ছোট মন—ছিঃ।

বংশী বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিল–ও হাজারিদা, এসো--টেনে নাও একটান–

গাঁজায় কষিয়া দম মারিয়া হাজারি আসিয়া আবার রান্নাঘরে বসিতেই হঠাৎ অতসীর মুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে অতসী। কি মনটি চমৎকার। তাহার কাকাবাবু গাঁজা খায়, অতসী যদি দেখিত। ওই জন্যেই তো গ্রামে সে কখনো গাঁজা খায় না। ছেলেপিলের সামনে বড় লজ্জার কথা।

অতসী টাকা দিতে চাহিয়াছে, হোটেল তাহাকে খুলিতে হইবেই। কথাটা একবার বংশীকে বলিবে? বংশী ও রতন ভাল লোক দু-জনেই, তাহাদের বিশ্বাস করা যায়। দুজনেই তাহাকে ভালবাসে।

বংশীকে বলিল–আজকাল রাত্তিরে টক হয়?

–সব দিন হয় না। এখন নেবু সস্তা, নেবু দেওয়া হয়। পয়সায় ছ’সাতটা পাতিনেবু।

-একটা কিছু করে দেখাতে হবে তো? বড়ির টক্ করবো ভেবেছিলাম–

–তুমি ভাবলে কি হবে? পদ্মদিদি পাস করলে তবে তো হাঁড়িতে উঠবে। ভুলে

গেলে নাকি আইনকানুন, হাজারি?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলল–বংশী, একটু চা করে খেয়ে নিলে হোত না? আছে তোড়জোড়?

বংশী বলিল–খাবে? আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। ডাল চড়িয়ে গরম জল এই ঘটিতে কেটে রেখো হাতা দিয়ে। চিনি আছে, চা আনিয়ে নিচ্ছি–মনে আছে আর বছর আমাদের চা খাওয়া? আদার রস করেও দেবে এখন–

আধঘণ্টার মধ্যে হাজারি ও বংশী মনের আনন্দে কলাইকরা বাটি করিয়া চা খাইতেছিল। ভূতগত খাটুনির মধ্যেও ইহাতেই আনন্দ কি কম? হাজারি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল–যেখানেই যার মন টেকে, বুঝলে বংশী। গোপালনগরে সন্দেবেলা রোজ ওদের মন্দিরে ঠাকুরের শেতল হয়–তার সন্দেশ, ফল কাটা, মুগের ডাল ভিজে খেতে দিত আমাকে। চা আমি করে নিতাম উনুনে। কিন্তু তাতে কি এমন মজা ছিল। একা একা বসে রান্নাঘরে চা আর খাবার খেতাম, মন হু হু করতো। খেয়ে সুখ ছিল না–আজ শুধু চা খাচ্ছি, তাই যেন কত মিষ্টি!

রাত হইয়াছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া হাজারি বলিল–ও বংশী, কেষ্টনগর এলো যে। ডালে কাঁটা দিয়ে নাও–

সঙ্গে সঙ্গে গোবরা চাকর খাবার ঘর হইতে হাঁকিল–থাড কেলাস দু-থালা–

উত্তেজনায় হাজারির সারাদেহ কেমন করিয়া উঠিল। কি কাজের ভিড়, কি লোকজনের হৈ চৈ, কি ব্যস্ততা–ইহার মধ্যেই তো মজা। তা নয়, গোপালনগরের মত পাড়াগাঁ জায়গায় কুণ্ডুদের বৃহৎ নিস্তব্ধ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধ রান্নাঘরের কোণে বসিয়া কড়িকাঠ গুনিতে গুনিতে আর বাড়ীর পিছনের বাগানের তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলা ডালপালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রান্না করা–সে কি তাহার পোষায়! সে হইল শহরের মানুষ।

.

সংক্রান্তির পরের দিন কুসুমের বাড়ী বেলা প্রায় বারোটার সময় সে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। বংশী ঠাকুরকে বলিয়া একটু সকাল সকাল হোটেল হইতে বাহির হইল।

কুসুম গোয়ালঘরের নতুন উনুনে আলাদা করিয়া কপির ডালনা রাঁধিতেছে–একখানা কলার পাতায় খানকতক বেগুন ভাজা ও একটা পাথরের খোরায় ছোলার ডাল। শুদ্ধাচারে সব করিতে হইতেছে বলিয়াই পাথরের খোরা ও কলাপাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা–হাজারি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল–কুসুমের কাণ্ড দ্যাখো! থাকি হোটেলে–কত ছোঁয়ালেপা হয়ে যায় তার নেই ঠিক–ও আবার নেয়ে ধুয়ে ধোয়া কাপড় পরে গুরুঠাকুরের মত যত্ন করে রাঁধতে বসেচে।

কুসুম সলজ্জ হাসিয়া বলিল–জ্যাঠামশায়, এখনও হয়নি। একটু দেরি আছে–আমি কিন্তু তরকারি সব রেঁধেছি–আপনি শুধু বসে যাবেন–

হাজারি বলিল–তুমি তরকারি রাঁধলে যে বড়! সে কথা তো ছিল না। আমি তোমার তরকারি খাবো কেন?

–ঠকাতে পারবেন না জ্যাঠামশাই। কোনো তরকারিতে নুন দিইনি। নুন না দিলে খেতে আপনার আপত্তি কি? ভাবলাম আপনি অত বেলায় এসে তরকারি রাঁধবেন সে বড় কষ্ট হবে–লুচি ভাজা আর কি হাঙ্গামা, দেরিই তো হবে তরকারি রাঁধতে। তাই নিয়ে এসে–

–নুন দাওনি। না মা তুমি হাসালে দেখচি। আলুনি তরকারি খাওয়াবে তোমার বাড়ী?

–আর গোয়ালার মেয়ে হয়ে আমি নিজের হাতের রান্না তরকারি খাইয়ে আপনার জাত মেরে দেবো–নরকে পচতে হবে না আমাকে তার জন্যে?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! বলিল, দাও ময়দাটা। মেখে নিই ততক্ষণ–

–সব ঠিক আছে জ্যাঠামশাই। কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি বরং শুধু নেচি কেটে লুচিগুলো বেলে দিন–কপিটা হয়ে গেলেই চাটন রাঁধব–তারপর লুচি ভেজে গরম গরম–ওতে কি জ্যাঠামশায়? ও কি?

হাজারি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিতে

করিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল–এই কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ–আজ পয়লা তারিখে ও মাসের ক'দিনের মাইনেটা দিলে কি না–তাই ভাবলাম একটুখানি মিষ্টি–

কুসুম রাগ করিয়া বলিল–এ আপনার বড্ড অন্যাই কিন্তু জ্যাঠামশায়। আপনার এই সবে চাকুরির মাইনে–আমার জন্যে খরচ করে সন্দেশ না কিনলে আর চলতো না? আপনার দণ্ড করতে আমার এখানে সেবা করতে বলেছি?...না, এসব কি ছেলেমানুষী আপনার–

হাজারি শালপাতার ঠোঙাটি দাওয়ার প্রান্তে অপরাধীর মত সঙ্কোচের সহিত নামাইয়া রাখিয়া বলিল–আমার কি ইচ্ছে করে না মা, তোমার জন্যে কিছু আনতে? বাবা মেয়েকে খাওয়ায় না বুঝি?

হাজারির রকম-সকম দেখিয়া কুসুমের হাসি পাইলেও সে হাসি চাপিয়া রাগের সুরেই বলিল–না ভারি চটে গিয়েছি–-পয়সা হাতে এলেই অমনি খরচ করার জন্যে হাত সুড়সুড় করে বুঝি? ভারী বড়লোক হয়েছেন বুঝি? ও মাসের সাতটা দিন কাজ করে কত মাইনে পেয়েছেন যে এক ঢাকার সন্দেশ আনলেন অমনি? হাজারি চুপ করিয়া অপ্রতিভ মুখে বসিয়া রহিল।

–আসুন ইদিকে, এই আসনখানায় বসুন, ময়দাটা নেচি করুন এবার—

মা কাহাকে অত বকিতেছে দেখিতে কুসুমের ছেলে মেয়ে কোথা হইতে আসিয়া

সামনে উঠানে দাঁড়াইতেই হাজারি ঠোঙা হইতে সন্দেশ লইয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু দিয়া বলিল যাক, নাতিনাতনী তো আগে খাক–মেয়ে খায় না খায় বুঝবে পরে–

পরে কুসুমের দিকে ফিরিয়া বলিল–নাও হাত পাতো, আর রাগ করে না—

কুসুম এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল–আমি রাঁধতে রাঁধতে খাব?

–কেন আলগোছে?

–না।

–কেন?

–আমি বুড়ো মাগী, ভোগের আগে পেসাদ পেয়ে বসে থাকি আর কি!

হাজারি বুঝিল তাহার খাওয়া না হইয়া গেলে কুসুম কিছুই খাইবে না। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে লুচির ময়দা লইয়া বসিয়া গেল।......

কুসম বলিল–হোটেল খুলবার কি করলেন?

–গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। দেখেচ ঘরখানা?

কুসুম উৎফুল্ল হইয়া বলিল–কবে খুলবেন?

–সামনের মাসে। টাকা দেবে তো?

কুসুম গলার সুর নীচু করিয়া বলিল–আস্তে আস্তে। কেউ শুনবে–

–তোমার শাশুড়ী কই?

–আমি যেতে পারলাম না বাইরে, তাই দুধ নিয়ে বেরিয়েছে–এল বলে।

–বাত সেরেছে?

–মরচের মাদুলী নিয়ে এখন ভাল আছে। আগে মধ্যে দিনকতক পঙ্গু হয়ে পড়েছিল– তার চেয়ে ঢের ভাল। আপনার জায়গা করে দিই–ওগুলো ভেজে ফেলুন–গরম গরম দেবো–

হাজারি খাইতে বসিল। কুসুম কাছে বসিয়া কখনও লুচি, কখনও তরকারি দিতে দিতে বলিল–আপনি তরকারিতে বেশী করে নুন মেখে খান–

–রান্না চমৎকার হয়েছে মা–

–থাক আপনার আর–

–হোটেল যেদিন খুলবো, সেদিন তোমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবো–

–না। ও সব করতে দেবে না। বুঝেসুঝে চলতে হবে না? টাকা নিয়ে ভূতোনন্দি কাণ্ড করবেন?

–কি করবো না! তুমি চেন না আমায়।

–আমার জন্যে এক পয়সা খরচ করতে পাবেন না আপনি বলে দিচ্ছি। তাহলে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবো–ঠিক।

.

পনেরো দিন পরে হাজারি গ্রামে সংসারের খরচপত্র দিতে গেল। বৈকালে হরিবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিল হরিবাবু বৈঠকখানায় আরও দুটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন–এই যে এস হাজারি, বসো বসো। এরা এসেছেন কলকাতা থেকে অতসীকে দেখতে–তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। রাত্রে আমার এখানে খেও আজ–

অতসীর তাহা হইলে বিবাহ? যদি ইতিমধ্যে তার বিবাহ হইয়া যায়, সে শশুরবাড়ী চলিয়া গেলে টাকাকড়ির ব্যাপার চাপা পড়িয়া যাইবে। হাজারি একটু দমিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে হরিবাবু বলিলেন–আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে আসি–আপনাদের ততক্ষণ চা দিয়ে যাক।

ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন–তিনি ফিরিয়া আসিলে একত্রে চা খাওয়া যাইবে। তাঁহারা ততক্ষণ একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই অতসী আসিয়া বৈঠকখানায় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা হইতে একবার সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

–এসো, এসো মা। ভাল আছ?

–আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু? গোপালনগর থেকে আসছেন?

–না মা। আমি গোপালনগরে আর নেই তো? রাণাঘাটের সেই হোটেলে কাজ আবার নিয়েছি যে। ওরা ডেকে বহাল করলে।

–করবে না? আপনার মত লোক পাবে কোথায়? আমায় এবার একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে যান, কাকাবাবু। আপনার নাম করবো চিরকাল।

–মা, এ হাতেকলমের জিনিস। বলে দিলে তো হবে না, দেখিয়ে দিতে হবে। তার সুবিধে হবে কি? আমি এর আগেও তোমাকে তো বলেছি একথা।

–কাল আপনার বাড়ী যাবো এখন। টেঁপিকে বলবেন। তাকে নিয়ে এলেন না কেন? তাকে নিয়ে আসবেন, সেও আমাদের এখানে রাত্রে খাবে।

অতসী একটু পরেই চলিয়া গেল, কারণ আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে।

পরদিন সকালে টেঁপির মা উঠান ঝাঁট দিতেছে এমন সময়ে অতসী বাড়ীর উঠানের মাচাতলা হইতে ডাকিল–টেঁপি, ও টেঁপি–

টেঁপির মা তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের মেয়ে অতসী গ্রামের কাহারও বাড়ী বড় একটা যায় না, তাহাদের মত গরীব লোকের বাড়ী যে যাতায়াত করিতেছে–ইহা ভাগ্যের কথাও বটে, গর্ব্ব করিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত কথাও বটে।

হাসিয়া বলিল–টেঁপি বাসন নিয়ে পুকুরে গিয়েছে–এসো বসো মা।

–কাকাবাবু কোথায়?

হাজারি কাল রাত্রে অতসীদের বাড়ী গুরুতর আহার করিলেও আজ হাঁটিয়া তিন

ক্রোশ পথ রাণাঘাট যাইবে, এই ওজুহাতে বড় এক বাটি চালভাজা নুন লঙ্কা সহযোগে ঘরের ওদিকে দাওয়ায় বসিয়া চর্বণ করিতেছিল–অতসী পাছে এদিকে আসিয়া পড়ে এবং তাহার চালভাজা খাওয়া দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে বাটিটা সে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া চাপা দিল।

অতসী আসিয়া বলিল–কই কাকাবাবু কোন্ দিকে বসে?

ওঃ, খুব সময়ে চালভাজার বাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সে।...অতসী তাহাকে রাক্ষস ভাবিত–রাত্রের ওই ভীষণ খাওয়ার পরে সকাল হইতে না হইতেই–

–এই যে মা–কি মনে করে এত সকালে?

–আপনি আমাদের বাড়ী দুপুরে খাবেন তাই বলতে বলে দিলেন বাবা–

–না মা আমি এখুনি বেরুচ্ছি রাণাঘাট–ছুটি তো নেই–আর কাল রাতে যে খাওয়া হয়েছে তাতে–

–তবে টেঁপি আর খুড়ীমা খাবেন–ওঁদের নেমন্তন্ন–আমি বলে যাচ্ছি ওঁদের। বলিয়া অতসী দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই পিড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল দেখিয়া হাজারি প্রমাদ গণিল। একে সময় নাই, দশটার মধ্যে হোটেলে পৌঁছিয়া রান্না চাপাইতে হইবে। এক বাটি চালভাজা চিবাইতেও তো সময় লাগে! হতভাগা মেয়েটা সব মাটি করিল!...বাটিটা লুকাইয়া বসিয়া থাকাই বা কতক্ষণ চলে?

অতসী বলিল–কাকাবাবু, আমার সঙ্গে যদি আপনার আর দেখা না হয়?

–কেন দেখা হবে না?

অতসী লাজুক মুখে বলিল–ধরুন যদি আমি–এখান থেকে যদি–

–বুঝেছি মা, ভালই তো, আনন্দের কথাই তো।

–আপনারা তাড়াতে পারলে বাঁচেন তা জানিই। মার মুখেও সেই এক কথা, বাবার মুখেও সেই এক কথা। সে যা হয় হবে আমি তা বলচি নে। আমি বলচি আপনি আজ থেকে যান, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে–সেই টাকা, মনে আছে তো? আপনাকে তা আজ দিয়ে দিই। যদি বলেন তো এখুনি আনি। আমার মনের ভার কমে যায়, তারপর যেখানে আপনারা আমায় বিদেয় করে দেন দেবেন

–ওকি মা। বিদেয় তোমায় কেউ করচে না। অমন কথা বলতে নেই।... কিন্তু টাকা নিতান্তই দেবে তাহলে?

–যখন বলেছি, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন কাকাবাবু আমি মিথ্যে বলছি?

–তা ভাবিনি--আচ্ছা ধরো এমন তো হতে পারে, আমি হোটেল খুলে লোকসান দিলাম, তখন তোমার টাকা তো শোধ দিতে পারবো না?

–আমি তো বলেছি, না দিতে পারেন তাই কি?...আপনি বসুন, আমি টাকা নিয়ে আসি।

আধঘণ্টার মধ্যে অতসী ফিরল। সন্তর্পণে আঁচলের গেরো খুলিয়া তাহাকে দুইশত টাকার খুচরা নোট গুনিয়া দিতে দিতে বলল–এই রইল। আমার টাকা ফেরত দিতে হবে না। টেঁপির বিয়ে দেবেন সে টাকায়। আমি যাই, লুকিয়ে চলে এসেছি, বাবা খুঁজবেন আবার।

.

রাণাঘাট যাইতে সারাপথ হাজারি অন্যমনস্কভাবে চলিল...

বেশ মেয়ে অতসী, ভগবান ওর ভাল করুন। তাহার মন বলিতেছে ওর হাত দিয়া যে টাকা আসিয়াছে–সে টাকায় ব্যবসা খুলিলে লোকসান খাইবে না। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তাহার হাতে আসিয়া টাকা গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।...

হোটেলে পৌঁছিয়া সে দেখিল রান্নাঘরে বংশী ঠাকুর ডাল চাপাইয়া একা বসিয়া। তাহাকে দেখিয়া বলিল–আরে এসো হাজারি-দা, বড্ড বেলা করলে যে! বড় ডেকে ভাতটা চাপাও– নেবে নাকি একটু দম দিয়ে?

–তা নাও না? সাজো গিয়ে–আমি ডাল দেখচি—

একটু পরে গাঁজার কলিকাটি হাজারির হাতে দিয়া বংশী বলিল–একটা বড় কাজেয় বায়না এসেছে, নেবে? আন্দুলের ঘোষেদের বাড়ী রাস হবে-সাতদিনের ঠিকে কাজ। বঁদে ভিয়েন, সন্দেশ ভিয়েন, রান্না এই সব। দু'টাকা মজুরি দিন–খোরাকি বাদে।

হাজারি বলিল–বংশী একটা কথা বলি তোমায়। আমি হোটেল খুলছি রাণাঘাটের বাজারে। কাউকে বোলো না কথাটা। তোমাকে আসতে হবে আমার হোটেলে।

কথাটা ঠিক শুনিয়াছে বলিয়া বংশীর যেন মনে হইল না। সে অবাক হইয়া উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল–হোটেল খুলবে? তুমি।?

–হাঁ, আমি না কে? তোমার বেহাই?

বংশী বলিল–কি পাগলের মত বলছ হাজারি-দা? কলকে রাখো, আর টান দিও না। রেলবাজারে একটা হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে তুমি জানো?

–কত টাকা বলে তোমার মনে হয়?

–পাঁচশো টাকার কম নয়।

–চারশোতে হয় না?

–আপাততঃ চলবে–কিন্তু কে তোমায় চারশো টাকা–

উত্তরে কোঁচার কাপড়ের গেরো খুলিয়া হাজারি বংশীকে নোটের তাড়া দেখাইয়া বলিল এই দেখছো তো দুশো টাকা এতে আছে। যোগাড় করে এনেছি। এখন লাগো গাছকোমর বেঁধে–তোমার অংশ থাকবে যদি প্রাণপণে চালাতে পারো–তোমায় ফাঁকি দেবো না। আজ থেকেই বাড়ী দেখ–পনেরো টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবো–আর দুশো টাকাও যোগাড় আছে।

বংশী ঠাকুর মুখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ কবিয়া বলিল–ভ্যালা আমার মানিক রে। হাজারি-দা, এসো তোমায় কোলে করে নাচি। এক অস্ত্রে বেচু চক্কত্তি বধ, পদ্মদিদি বধ, যদু বাঁড়ুয্যে বধ–

–চুপ, চুপ,–চলো ছুটির পর দুজনে ঘর দেখা যাক। তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। জায়গাটা ভাল। আচ্ছা, বাজার কেমন, বংশী?

–বাজার ভালো। নতুন আলু সস্তা হোলে আরও সুবিধে হবে। নতুন আল উঠলো বলে। কেবল মাছটা এখনও আক্রা–

–ঘর দেখার পর একটা ফর্দ করে ফেলা যাক এসো। থালা বাসন, বালতি, জালা, শিলনোড়া, বঁটি–

–আজ খাওয়াও হাজারি-দা। মাইরি, একটা কাজের-মত কাজ করলে। আচ্ছা টাকা পেলে কোথায় বল না?

–পরে বলব সব। তার ঢের সময় আছে। এখন আগেকার কাজ আগে করো।

পদ্মঝি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল–বেশ তো দুটিতে বসে খোসগল্প চলছে। উদিকে মাছ ডাঙায়, তরকারি ডাঙায়–এখুনি লোক খেতে আসবে—

গোবরা চাকর হাঁকিল–থাড কেলাস একথালা–

পদ্মঝি বলিল—ওই! এলো তো? এখন মাছ ভাজা পর্যন্ত হোল না যে তাই দিয়ে ভাত দেবে। এদিকে গাঁজার ধোঁয়ায় তো রান্নাঘর অন্ধকার–সব তাড়াতে হবে তবে হোটেল চলবে। কর্তার খেয়েদেয়ে নেই কাজ তাই যত হাড়হাভাতে উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আবার জুটিয়ে এনে হাতাবেড়ি হাতে দিয়েছে–

বংশী ঠাকুর বলিল–রাগ করো কেন পদ্মদিদি, কাল রাতের বাসি মাছ ভেজে রেখেছি– থাড কেলাসের খদ্দের যারা সকালে খায়, তাই চিরকাল খেয়ে আসছে।

হাজারি বংশীর দিকে চাহিয়া বলিল–না বংশী দই এনে দাও সেও ভাল। বাসি মাছ দিও না–ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়–ও থাক।

পদ্মঝি ঝাঁজের সহিত বলিল–দইয়ের পয়সা তুমি দিও তবে ঠাকুর। হোটেল থেকে

দেওয়া হবে না। তুমি বেলা করে বাড়ী থেকে এলে বলেই মাছ হোল না। বংশী ঠাকুর একা কত দিকে যাবে?

হাজারি চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলের ছুটির পর হাজারি চূর্ণীঘাটে যাইবার পথে রাধাবল্লভতলায় বার বার নমস্কার করিয়া গেল। ঠাকুর রাধাবল্লভ এতদিন পরে যেন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাহার সেই প্রিয় গাছটির তলায় বসিয়া হাজারি কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। অতসী টাকা দিয়া দিয়াছে, তাহার বাড়ী বহিয়া আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে–হয়তো সে হোটেল খুলিতে দেরি করিত, কিন্তু আর দেরি করা চলিবে না। অতসী-মায়ের কাছে কথা দিয়াছে, সেকথা রাখিতে হইবেই তাহাকে।

রাণাঘাট বেশ লাগে তাহার, বেচুবাবুর হোটেল তো একমাত্র জায়গা যেখানে তাহার মন ভাল থাকে, জীবনটা শান্তিতে কাটাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই রাণাঘাটের রেলবাজার ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এখানেই হোটেল খুলিবে, অন্যত্র নয়।

বৈকালের দিকে সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম বলিল–আজকে এলেন? আসুন, বসুন।

হাজারি হাসিমুখে বলিল–একটা জিনিস রাখতে হবে মা।

–কি?

হাজারি পেট-কোঁচড় হইতে দু'শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল–রেখে দাও।

কুসুম অবাক হইয়া বলিল–কোথায় পেলেন?

–ভগবান দিয়েছেন। হোটেল খুলবার রেস্ত জুটিয়ে দিয়েছেন এতদিন পরে–এই দু'শো, আর তোমার দু'শো, সামনের মাসেই খুলবো ভাবছি।

–এ টাকা কে দিলে জ্যাঠামশায় বললেন না আমায়?

–তোমার মত আর একটি মা।

–আমি চিনিনে?

–আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ে অতসী। বলবো সে সব কথা আর একদিন, আজ বেলা যাচ্ছে, আমি গিয়ে ডেক চাপাই গে–টাকা রেখে দাও এখন।

হোটেলে আসিয়া বংশীকে বলিল–তোমার ভাগ্নেটিকে চিঠি লিখে আনাও বংশী। তাকে গদিতে বসতে হবে। লেখাপড়ার কাজ তো আমায় বা তোমায় দিয়ে হবে না।

বংশী বলিল–সে তো বসেই আছে হাজারি-দা। একটা কাজ পেলে বেঁচে যায়। আমি আজই লিখছি আর ঘর আমি দেখে এসেছি–তামাকের দোকানের পাশে ঘরটা ভাল–ওইটেই নাও। লেগে যাও দুর্গা বলে।

দিন দুই পরে একদিন সকালে পদ্মঝি বলিল–ও ঠাকুর, শুনে রাখো, আজ কোথাও যেও না সব ছুটির পরে। আজ ও-বেলা সত্যনারায়ণের সিন্নি–খদ্দেরদের ভাত দেবার সময় বলে দিও ও-বেলা যেন থাকে–আর তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে সত্যনারায়ণের বাজার করতে।

বংশী ঠাকুর হাজারির দিকে চাহিয়া হাসিল–অবশ্য পদ্মঝি চলিয়া গেলে।

ব্যাপারটা এই, হোটেলের এই যে সত্যনারায়ণের পূজা, ইহা ইহাদের একটি ব্যবসা। যাহারা মাসিক হিসাবে হোটেলে খায় তাহাদের নিকট হইতে পূজার নাম করিয়া চাঁদা বা প্রণামী আদায় হয়। আদায়ী টাকার সব অংশ ব্যয় করা হয় না বলিয়াই হাজারি বা বংশীর ধারণা। অথচ, সত্যনারায়ণের প্রসাদের লোভ দেখাইয়া দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা তাহাদেরও রাত্রে আনিবার চেষ্টা করা হয়–কারণ এমন অনেক নগদ খরিদ্দার আছে, যাহারা একবেলা হোটেলে খাইয়া যায়, দু-বেলা আসে না।

বংশী ঠাকুর পরিবেশনের সময় প্রত্যেক ঠিকা খরিদ্দারকে মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিতে লাগি—আজ্ঞে বাবু, ও-বেলা সত্যনারাণ হবে হোটেলে, আসবেন ও-বেলা–অবিশ্যি করে আসবেন–

বাহিরে গদির ধরে বেচু চক্কত্তিও খরিদ্দারদিগকে ঠিক অমনি বলিতে লাগিল।

বংশী ঠাকুর হাজারিকে আড়ালে বলিল–সব ফাঁকির কাজ, এক চিলতে কলার পাতার আগায় এক হাত করে গুড় গোলা আটা আর তার ওপর দুখানা বাতাসা–হয়ে গেল এর নাম তোমার সত্যনারাণের সিন্নি। চামার কোথাকার–

সন্ধ্যার সময় পূর্ণ ভটচাজ সত্যনারায়ণের পূজা করিতে আসিলেন। বাসনের ঘরে সত্য নারায়ণের পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। হোটেলের দুই চার মিলিয়া ঘড়ি ও কাঁসর পিটাইতেছে, পদ্মঝি ঘন ঘন শাঁকে ফুঁ পাড়িতেছে–খানিকটা খরিদ্দার আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেও বটে।

স্টেশনে যে চাকর 'হি-ই-ই-ন্দু হো-টে-ল-ল' বলিয়া চেঁচায়, তাহাকেও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে যাত্রীদের প্রত্যেককে বলিতেছে–'আসুন বাবু, সিমি পেশাদ হচ্চেন হোটেলে, খাওয়ার বড্ড জুৎ আজগে–আসুন বাবু–'

যাহারা নগদ পয়সার খরিদ্দার, তাহারা ভাবিতেছে–অন্য হোটেলেও তো পয়সা দিয়া খাইবে যখন তখন সত্যনারায়ণের প্রসাদ ফাউ যদি পাওয়া যায়, বেচু চকত্তির হোটেলেই যাওয়া যাক না কেন। ফলে যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা, তাহারাও অনেকে আসিয়া জুটিতেছে এই হোটেলে। এদিকে নগদ খরিদ্দারদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের সিন্নি খাইতে দেওয়া হইবে ভাতের পাতে অর্থাৎ টিকিট কিনিয়া ভাত খাইতে ঢুকিলে তবে। নতুবা

সিন্নিটুকু খাইয়া লইয়াই যদি খরিদ্দার পালায়?

মাসিক খরিদ্দারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা। তাঁহারা চাঁদা দিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের খাতির করাও দরকার। পূজা সাঙ্গ হইলে তাহাদের সকলকে একত্র বসাইয়া প্রাসাদ খাইতে দেওয়া হইল–বেচু চক্কত্তি নিজে প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহারা আর একটু করিয়া প্রসাদ লইবে কি না।

যখন ওদিকে মাসিক খরিদ্দাগণকে সিন্নি বিতরণ করা হইতেছে, সে সময় হাজারি দেখিল রাস্তার উপর যতীন মজুমদার দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। সেই যতীন...

হাজারির মনে হইল লোকটার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন অনাহার-শীর্ণ চেহারা। সে ডাকিয়া বলিল–ও যতীনবাবু, কেমন আছেন?

যতীন মজুমদার অবাক হইয়া বলিল–কে হাজারি নাকি? তুমি আবার কবে এলে এখানে।

–সে অনেক কথা বলবো এখন। আসুন না—আসুন—

যতীন ইতস্ততঃ করিয়া রান্নাঘরের পাশে বেড়ার গায়ের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিয়া রান্নাঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি দেখিল তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে অতি মলিন উড়ানি, পরনের ধুতিখানিও তদ্রূপ। আগের চেয়ে রোগাও হইয়া গিয়াছে লোকটা। দারিদ্র্য ও অভাবের ছাপ চোখে মুখে বেশ পরিস্ফূট।

যতীন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল–আরে, তোমাদের এখানে বুঝি সত্যনারায়ণ হচ্চে আজগে? আগে আমিও কত এসেছি খেয়েছি–

–তা খাবেন না? আপনি তো ছিলেন বারোমাসের বাঁধা খদ্দের–তা আসুন পেরসাদ খেয়ে যান–

যতীন ভদ্রতা করিয়া বলিল–না না, থাক থাক–তার জন্যে আর কি হয়েচে–

হাজারি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোনোদিকে নাই। সবাই খাবার ঘরে মাসিক খরিদ্দারের আদর আপ্যায়ন করিতে ব্যস্ত–সে কলার পাত পাতিয়া যতীনকে বসাইল এবং পাশে বাসনের ঘর হইতে বড় বাটির একবাটি সত্যনারায়ণের সিন্নি, একমুঠা বাতাসা ও দুটি পাকা কলা আনিয়া যতীনের পাতে দিয়া বলিল–একটু পেরসাদ খেয়ে নিন–

যতীন মজুমদার দ্বিরুক্তি না করিয়া সিন্নির সহিত কলাদুটি চটকাইয়া মাখিয়া লইয়া যেভাবে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল, তাহাতে হাজারিরও মনে হইল লোকটা সত্যই যথেষ্ট ক্ষুধার্ত ছিল, বোধ হয় ওবেলা আহার জোটে নাই। তিন চার গ্রাসে অতখানি সিন্নি সে নিঃশেষে উড়াইয়া দিল।

হাজারি বলিল–আর একটু নেবেন?

যতীন পূর্বের মত ভদ্রতার সুরে বলিল–না না, থাক থাক আর কেন–

হাজারি আরও এক বাটি সিন্নি আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিতে যতীনের মুখচোখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার খাওয়া অর্ধেক হয়েছে এমন সময় পদ্মঝি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া হাজারিকে কি একটা বলতে গেল এবং গোগ্রাসে ভোজনরত যতীন মজুমদারকে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল বলিল–ও কে?

হাজারি হাসিয়া বলিল–ও যতীনবাবু, চিনতে পাচ্ছ না পদ্মদিদি? আমাদের পুরোনো বাবু। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তা আমি বল্লাম আজ পুজোর দিনটা একটু পেরসাদ পেয়ে যান বাবু–

পদ্মঝি বলিল—বেশ–বলিয়াই সে ফিরিয়া আবার গিয়া মাসিক খরিদ্দারদের খাবার ঘরে ঢুকিল।

যতীন ততক্ষণ পদ্মঝিকে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না তাহার। সে খাওয়া শেষ করিয়া এক ঘটি জল চাহিয়া লইয়া খাইয়া চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গোবরা চাকর আসিয়া বলিল–ঠাকুর, কর্ত্তা তোমাকে ডাকছেন—

হাজারি বুঝিয়াছিল কর্তা কি জন্য তাহাকে জরুরী তলব দিয়াছেন। সে গিয়া বুঝিল তাহার অনুমান সত্য–কারণ পদ্মঝি মুখ ভার করিয়া গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির সামনে দাঁড়াইয়া। বেচু চক্কত্তি বললেন–হাজারি, তুমি যতনেটাকে হোটেলে ঢুকিয়ে তাকে বসিয়ে সিন্নি খাওয়াচ্ছিলে?

পদ্মঝি হাত নাড়িয়া বলিল–আর খাওয়ানো বলে খাওয়ানো! এক এক গামলা সিন্নি দিয়েছে তার পাতে–ইচ্ছে ছিল নুকিয়ে খাওয়াবে, ধর্মের ঢাক বাতাসে নড়ে, আমি গিয়ে পড়েছি সেই সময় বড় ডেক নামলো কি না তাই দেখতে–আমায় দেখে–

হাজারি বিনীত ভাবে বলিল–সত্যনারাণের পেশাদ বলেই বাবু দিয়েছিলাম–আমাদের পুরোনো খদ্দের–

বেচু চক্কত্তি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন–পুরোনো খদ্দের? ভারি আমার পুরোনো খদ্দের রে? হোটেলের একটি মুঠো টাকা ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, ভারি খদ্দের আমার! চার মাস বিনি পয়সায় খেয়ে গেল একটি আধলা উপুড়-হাত করলে না, পয়লা নম্বরের জুয়াচার কোথাকার-খদ্দের! তুমি কার হুকুমে তাকে হোটেলে ঢুকতে দিলে শুনি?

পদ্মঝি বলিল–আমি কোনো কথা বল্লেই তো পদ্ম বড় মন্দ। এই হাজারি ঠাকুর কি

কম শয়তান নাকি–বাবু? আপনি জানেন না সব কথা, সব কথা আপনার কানে তুলতেও আমার ইচ্ছে করে না। নুকিয়ে নুকিয়ে হোটেলের আদ্ধেক জিনিস ওঠে ওর এয়ার বকশীদের বাড়ী। যতনে ঠাকুর ওর এয়ার, বুঝলেন না আপনি? বহাল করেন লোক, তখন আমি কেউ নই– কিন্তু হাতে হাতে ধরে দেবার বেলা এই জনা না হোলেও দেখি চলে না–এই দেখুন আবার চুরি-চামারি শুরু যদি না হয় হোটেলে, তবে আমার নাম–

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–এটা তোমার নিজের হোটেল নয় যে তুমি হাজারি ঠাকুর এখানে যা খুশি করবে। নিজের মত এখানে খাটালে চলবে না জেনো। তোমার আট আনা জরিমানা হোল।

হাজারি বলিল–বেশ বাবু, আপনার বিচারে যদি তাই হয়, করুন জরিমানা। তবে যতীন বাবু আমার এয়ারও নয় বা সে সব কিছুই নয়। এই হোটেলেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ–ওঁকে দেখিনিও কতদিন। পদ্মদিদি অনেক অনেয্য কথা লাগায় আপনার কাছে–আমি আসছে মাস থেকে আর এখানে চাকরি করবো না।

পদ্মঝি এ কথায় অনর্থ বাধাইল। হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল–লাগায়? লাগায় তোমার নামে? তুমি যে বড় লাগাবার যুগ্যি লোক। তাই পদ্ম লাগিয়ে লাগিয়ে বেড়াচ্ছে তোমার নামে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তোমার মত লোককে পদ্ম গেরায্যির মধ্যে আনে না তা তুমি ভাল করে বুঝো ঠাকুর। যাও না, তুমি আজই চলে যাও। সামনের মাসে কেন, মাইনেপত্তর চুকিয়ে আজই বিদেয় হও না–তোমার মত ঠাকুর রেল-বাজারে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে–

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–চুপ চুপ পদ্ম, চুপ করো। খদ্দেরপত্র আসচে যাচ্চে, ওকথা এখন থাক। পরে হবে–আচ্ছা তুমি যাও এখন হাজারি ঠাকুর–

অনেক রাতে হোটেলের কাজ মিটিল।

শুইবার সময় হাজারি বংশীকে বলিল–দেখলে তো কি রকম অপমানটা আমার করলে পদ্মদিদি? তুমিও ছাড়, চল দুজনে বেরিয়ে যাই। দ্যাখো একটা কথা বংশী, এই হোটেলের ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, মুখে বলি বটে যাই যাই–কিন্তু যেতে মন সরে না। কতকাল ধরে তুমি আর আমি এখানে আছি ভেবে দ্যাখো তো? এ যেন আপনার ঘর বাড়ী হয়ে গিয়েছে–তাই না? কিন্তু এরা–বিশেষ করে পদ্মদিদি এখানে টিকতে দিলে না–এবার সত্যিই যাবো।

বংশী বলিল–যতীনকে তুমি ডেকে দিলে না ও আপনি এসেছিল?

–আমি ডেকেছিলাম। ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েচে, আজকাল খেতেই পায় না। তাই ডাকলাম। বলি পুরোনো খদ্দের তো, কত লোক খেয়ে যাচ্চে, ও একটু সিন্নি খেয়ে যাক। এই তো আমার অপরাধ।

.

পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের

দোকানের পাশেই নূতন হোটেলটা খুলিল! টিনের সাইনবোর্ড লেখা আছে—

আদর্শ হিন্দু-হোটেল
হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।
ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।
আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

বেচু চক্কত্তির হোটেলের অনুকরণে সামনেই গদির ঘর। সেখানে বংশী ঠাকুরের ভাগ্নে সেই ছেলেটি কাঠের বাক্সের উপর খাতা ফেলিয়া খরিদ্দারগণের আনাগোনার হিসাব রাখিতেছে। ভিতরে রান্না করিতেছে বংশী ও হাজারি–বেচু চক্কত্তির হোটেলের মতই তিনটি শ্রেণী করা হইয়াছে, সেই রকম টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়।

তা নিতান্ত মন্দ নয়। খুলিবার দিন দুপুরের খরিদ্দার হইল ভালই! বংশী খাইবার ঘরে ভাত দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া হাজারিকে বলিল–থাড কেলাস ত্রিশ খানা। প্রথম দিনের পক্কে যথেষ্ট হয়েছে। ওবেলা মাংস লাগিয়ে দাও।

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিয়াছেন। হাজারি এখন হোটেলের মালিক। বেচু চক্কত্তির সমান দরের লোক সে আজ। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যত জানাশোনা পরিচিত লোক যে যেখানে আছে–সকলকেই কথাটা বলিয়া বেড়ায়। মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া বৈকালে কুসুমের বাড়ী গিয়া হাজির হইল।

কুসুম বলিল–কেমন চললো হোটেল জ্যাঠামশায়?

–বেশ খদ্দের পাচ্চি। আমার বড্ড ইচ্ছে তুমি একবার এসে দেখে যাও–তুমি তো অংশীদার–

–যাবো এখন। কাল সকালে যাবে। আপনার মনিব কি বল্লে?

–রেগে কাই। ও মাসের মাইনে দেয় নি–না দিকগে, সত্যিই বলচি কুসুম মা, আমার বয়েস কে বলে আটচল্লিশ হয়েচে? আমার যেন মনে হচ্চে আমার বয়েস পনের বছর কমে গিয়েচে। হাতপায়ে বল এসেচে কত! তুমি আর আমার অতসী মা–তোমরা আর জন্মে আমার কি ছিলে জানিনে—তোমাদের–

কুসুম বাধা দিয়া বলিল–আবার ওই সব কথা বলছেন জ্যাঠামশায়? আমার টাকা দিইচি সুদ পাবো বলে। এ তো ব্যবসায় টাকা ফেলা–টাকা কি তোরঙ্গের মধ্যে থেকে আমার স্বগগে পিদিম দিতো? বলি নি আমি আপনাকে? তবে হ্যাঁ, আমাদের বাবুর মেয়ের কথা যা বল্লেন, সে দিয়েছে বটে কোন খাঁই না করে। তার কথা, হাজার বার বলতে পারেন। তার বিয়ের কি হোল?

–সামনের সোমবার বিয়ে। চিঠি পেয়েছি–যাচ্ছি ওদিন সকালে।

–আমার কাকার সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে এসব টাকাকড়ির কথা যেন বলবেন না সেখানে।

–তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না মা, যতবার দেখা হয়েচে তোমার নামটি পর্যন্ত কখনো সেখানে ঘূণাক্ষরে করি নি। আমারও বাড়ী এঁড়োশোলা, আমায় তোমার কিছু শেখাতে হবে না।

কথামত পরদিন সকালে কুসুম হোটেল দেখতে গেল। সে দুধ দই লইয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়– তাহার পক্ষে ইহা আশ্চর্যের কথা কিছুই নহে।

হাজারি তাহাকে রান্নাঘরে যত্ন করিয়া বসাইতে গেল–সে কিন্তু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল–আমি গুরুঠাকরুন কিছু আসি নি যে আসন পেতে যত্ন করে বসাতে হবে।

হাজারি বলিল–তোমারও তো হোটেল কুসুম-মা–তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভাল করে দেখে শোনো। কি হচ্ছে না হচ্চে তদারক করো–এতে লজ্জা কি? বংশী, চিনে রাখো এ একজন অংশীদার।

এ কথায় কুসুম খুব খুশি হইল–মুখে তাহার আহ্লাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন–এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে। এ ভাবে ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। হাজারি বলিল–আজ মাছ রান্না হয়েছে বেশ পাকা রুই। তুমি একটু বোসো মা, মুড়োটা নিয়ে যাও।

–না না জ্যাঠামশায়।–ওসব আপনাকে বারণ করে দিইচি না! সকলের মুখ বঞ্চিত

করে আমি মাছের মুড়ো খাবো–বেশ মজার কথা!

–আমি তোমার বুড়ো বাবা, তোমাকে খাইয়ে আমার যদি তৃপ্তি হয়, কেন খাবে না বুঝিয়ে দাও।

হোটেলের চাকর হাঁকিল–থাড কেলাস তিন থালা--

হাজারি বলল–খদ্দের আসছে বোসো মা একটু। আমি আসছি, বংশী ভাত বেড়ে ফেলো।

আসিবার সময় কুসুম সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত হাজারির দেওয়া এক কাঁসি মাছ তরকারি লইয়া আসিল।

.

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারি এঁড়োশোলা হইতে গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট ফিরিতেছে, সঙ্গে টেঁপির মা, টেঁপি ও ছেলেমেয়ে। তাহার হোটেলের কাজ আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাণাঘাটে বাসা না করিলে আর চলে না।

টেঁপির মা বলিল–আর কতটা আছে হ্যাঁ গা?

–ওই তো সেগুন বাগান দেখা দিয়েছে–এইবার পৌঁছে যাবো

টেঁপি বলিল–বাবা, সেখানে নাইবো কোথায়? পুকুর আছে না গাঙ?

–গাঙ আছে, বাসায় টিউব কল আছে।

টেঁপির মা বলিল–তাহোলে জল টানতে হবে না পুকুর থেকে। বেঁচে যাই–

ইহারা কখনো শহরে আসে নাই–টেঁপির মার বাপের বাড়ী এঁড়োশোলার দু ক্রোশ উত্তরে মণিরামপুর গ্রামে। জন্ম সেখানে, বিবাহ এঁড়োশোলায়, শহর দেখিবার একবার সুযোগ হইয়াছিল অনেকদিন আগে, অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের য়েদের সঙ্গে একবার নবদ্বীপে রাস দেখিতে গিয়াছিল।

হোটেলের কাছেই একখানা একতলা বাড়ী পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টেঁপির মা বাড়ী দেখিয়া খুব খুশি হইল। চিরকাল খড়ের ঘরে বাস করিয়া অভ্যাস, কোঠাঘরে বাস এই তাহার প্রথম।

–কখানা ঘর গা? রান্নাঘর কোন্ দিকে? কই তোমার সেই টিউকল দেখি? জল বেশ ও তো? ওরে টেঁপি, গাড়ীর কাপড়গুলো আলাদা করে রেখে দে–একপাশে। ও-সব নিয়ে ছিষ্টি ছোঁয়ানেপা করো না যেন, বস্তার মধ্যে থেকে একটা ঘটি আগে বের করে দাও না গো, এক ঘটি জল আগে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে কুসুম আসিয়া ঢুকিয়া বলিল–ও জেঠিমা, এলেন সব? বাসা পছন্দ হয়েছে তো?

টেঁপির মা কুসুমকে চেনে। গ্রামে তাহাকে কুমারী অবস্থা হইতেই দেখিয়াছে। বলিল– এসো মা কুসুম, এসো এসো! ভাল আছ তো? এসো এসো কল্যেণ হোক।

হোটেলের চাকর রাখাল এই সময় আসিল। তাহার পিছনে মুটের মাথায় এক বস্তা পাথুরে কয়লা। হাজারিকে বলিল–কয়লা কোনদিকে নামাবো বাবু?

হাজারি বলিল–কয়লা আনলি কেন রে? তোকে যে বলে দিলাম কাঠ আনতে? এর কয়লার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম বলিল–কয়লার উনুন আছে? আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি। আর শিখে নিতে তো হবে জেঠিমাকে। কয়লা সস্তা পড়বে কাঠের চেয়ে এ শহর-বাজার জায়গায়। আমি একদিনে শিখিয়ে দেবো জেঠিমাকে।

রাখাল কয়লা নামাইয়া বলিল–বাবু, আর কি করতে হবে এখন?

হাজারি বলিল–তুই এখন যাসনে–জলটলগুলো তুলে দিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে?

–এসেছে বাবু।

–তা থেকে এবেলার মত মাছ-তরকারি চার-পাঁচ জনের মত নিয়ে আয়। ওবেলা আলাদা বাজার করলেই হবে। আগে জল তুলে দে দিকি।

টেঁপির মা বলিল–ও কে গো?

–ও আমাদের হোটেলের চাকর। বাসার কাজও ও করবে, বলে দিইছি।

টেঁপির মা অবাক হইল। তাহাদের নিজেদের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' সম্বোধন করিতেছে–এ সব ব্যাপার এতই অভিনব যে বিশ্বাস করা শক্ত। গ্রামের মধ্যে তাহারা ছিল অতি গরীব গৃহস্থ, বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত বাসন-মাজা, জল-তোলা, ক্ষার-কাঁচা, এমন কি ধান ভানা পর্যন্ত সর্বরকম গৃহকর্ম্ম সে একা করিয়া আসিয়াছে। মাস চার পাঁচ হইল দুটি সচ্ছল অন্নের মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে, নতুবা আগে আগে পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাওয়াও সব সময় ঘটিত না।

আর আজ এ কি ঐশ্বর্যের দ্বার হঠাৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল। কোঠাবাড়ী, চাকর, কলের জল–এ সব স্বপ্ন না সত্য?

রাখাল আসিয়া বলিল–দেখুন তো মা এই মাছ-তরকারিতে হবে না আর কিছু আনবো?

বড় বড় পোনা মাছের দাগা দশ-বারো খানা। টেঁপির মা খুশির সহিত বলিল–না বাবা আর আনতে হবে না। রাখো ওখানে।

–ওগুলো কুটে দিই মা?

মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে! এ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ছিল।

হাজারি বলিল–আগে জল তুলে দে তারপর কুটবি এখন। আগে সব নেয়ে নিই।

কুসুম কয়লার উনুনে আঁচ দিয়া আসিয়া বলিল–জেঠিমা আপনিও নেয়ে নিন। ততক্ষণ আঁচ ধরে যাক। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রান্না চড়িয়ে দেবার আর দেরি করবার দরকার কি? আমি এবার যাই।

টেঁপির মা বলিল–তুমি এখানে এবেলা খাবে কুসুম।

কুসুম ব্যস্তভাবে বলিল–না না, আপনারা এলেন তেতেপুড়ে এই দুপুরের সময়। এখন কোনোরকমে দুটো ঝোলভাত রেঁধে আপনারা এবেলা খেয়ে নিন–তার মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাংনামায়–

–কিছু হাংনামা হবে না মা। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না। ভাল বেগুন এনেছি গাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না–বেগুন পোড়াবো এখন। বাপের বাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ। কাল শুটকে যাবে।

হাজারি স্নান সারিয়া বলিল–আমি একবার হোটেলে চল্লাম। তোমরা রান্না চাপাও। আমি দেখে আসি।

আধঘণ্টা পরে হাজারি ফিরিয়া দেখিল টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনে উনুনে পরিত্রাহি ফুঁ পাড়িতেছে। আঁচ নামিয়া গিয়াছে, তনও মাছের ঝোল বাকি।

টেঁপির মা বিপন্নমুখে বলিল–ওগো, এ আবার কি হোল, উনুন যে নিবে আসছে। কি করি এখন?

কুসুম বাড়ীতে স্নান করিতে গিয়াছে, রাখাল গিয়াছে হোটেলে, কারণ এই সময়টা সেখানে খরিদ্দারের ভিড় অত্যন্ত। এবেলা অন্ততঃ একশত জন খায়। বেচু চক্কত্তি ও যদু বাঁড়ুয্যের হোটেল কানা হইয়া পড়িয়াছে। হাজারি নিজের হাতে রান্না করে, তাহার রান্নার গুণে–রেলবাজারের যত খরিদ্দার সব ঝুঁকিয়াছে তাহার হোটেলে। তিনজন ঠাকুর ও চারিজন চাকরে হিমসিম খাইয়া যায়। ইহারা কেহই কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া দূরের কথা, কয়লার উনুনই দেখে নাই। আঁচ কমিয়া যাইতে বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া হাজারির হাসি পাইল। বলিল-শেখো, পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়ে কতকাল থাকবে? সরে দিকি? ওর ওপর আর চাট্টি কয়লা দিতে হয়–এই দেখিয়ে দিই।

টেঁপির মা বলিল–আর তুমি বড্ড শহুরে মানুষ! তবুও যদি এঁড়োশোলা বাড়ী না হোত!

–আমি? আমি আজ সাত বছর এই রাণাঘাটের রেলবাজারে আছি। আমাকে পাড়াগেঁয়ে বলবে কে? ওকথা তুলে রাখোগে ছিকেয়।

টেঁপি বলিল–বাবা এখানে টকি আছে? তুমি দেখেছ?

হাজারি বিশ হাত জলে পড়িয়া গেল। টকি বাইস্কোপ এখানে আছে বটে কিন্তু বাইস্কোপ দেখার শখ কখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু টেঁপি আধুনিকা, এঁড়োশোলায় থাকিলে কি হয়, বাংলার কোন্ পাড়াগাঁয়ে আধুনিকতার ঢেউ যায় নাই?...বিশেষত অতসী তার বন্ধু...অতসীর কাছে অনেক জিনিস সে শুনিয়াছে বা শিখিয়াছে যাহা তাহার বাবা (মা তো নয়ই) জানেও না।

টেঁপির মা বলিল–টকি কি গা?

হাজারি আধুনিক হইবার চেষ্টায় গম্ভীর ভাবে বলিল–ছবিতে কথা কয়, এই। দেখেছি অনেকবার। দেখবো না আর কেন? হুঁ–

বলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে সবটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল–কিন্তু টেঁপি পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিল–কি পালা দেখেছিলে বাবা?

–পালা! তা কি আর মনে আছে। লক্ষণের শক্তিশেল বোধহয়, হাঁ–লক্ষণের শক্তিশেল।

মনের মধ্যে বহু কষ্টে হাতড়াইয়া ছেলেবেলায় দেখা এক যাত্রার পালার নামটা হাজারি করিয়া দিল। টেঁপি বলিল–লপের শক্তিশেল আবার কি পালার নাম? ওর নাম তো টকি, পালার থাকে না? তাদের নাম আমি শুনেছি অতসীদির কাছে, সে তো

–হাঁ হাঁ–তুই আর অতসীদি ভারি সব জানিস আর কি! যা–সর দিকি–ওই কয়লার ঝুড়িটা–

–ও মামাবাবু, খাওয়া-দাওয়া হোল–বলিয়া বংশীর ভাগ্নে সেই সুন্দর ছেলেটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই টেঁপির মা, পাড়াগেঁয়ে বউ, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। টেঁপি কিন্তু নবাগত লোকটির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল–এসো বাবা এসো–ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হোল বংশীর ভাগ্নে। আমার হোটেলে খাতাপত্র রাখে। ছেলেমানুষ–ওকে দেখে আবার ঘোমটা–

বংশীর ভাগিনেয় আসিয়া টেঁপির মার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি মেয়েকে বলিল–তোর নরেন দাদাকে প্রণাম কর টেঁপি। এইটি আমার মেয়ে, বাবা নরেন। ও বেশ লেখাপড়া জানে–সেলাইয়ের কাজটাজ ভাল শিখেছে আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ের কাছে।

টেঁপির হঠাৎ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। ছেলেটি দেখিতে যেমন, এমন চেহারার ছেলে সে কখনো দেখে নাই–কেবল ইহার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায় অতসীদি’র বরের। অনেকটা মুখের আদল যেন সেই রকম।

বংশীর ভাগ্নেও তাহার স্বচ্ছন্দ হৃদ্যতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাওয়া যেন একটু কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। টেঁপির দিকে তো তেমন চাহিতেই পারিল না।

হাজারি বলিল–মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক’জন নামলো আজ?

–নেমেছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিনজনকে বেচু চক্কত্তির চাকর একরকম হাত ধরে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। বাকি সাতজন আমরা পেয়েছি–আর বনগাঁর ট্রেন থেকে এসেছিল পাঁচজন।

–ইস্টিশানে গিয়েছিল কে।

–ব্রজ ছিল, রাখালও ছিল বনগাঁর গাড়ীর সময়। ব্রজ বল্লে বেচু চক্কত্তির চাকরের সঙ্গে খদ্দের নিয়ে তার হাতাহাতি হয়ে যেতো আজ।

–না না, দরকার নেই বাবা ওসব। হাজার হোক, আমার পুরোনো মনিব। ওদের খেয়েই এতকাল মানুষ–হোটেলের কাজ শিখেছিও ওদের কাছে। শুধু রাঁধতে জানলে তো হোটেল চালানো যায় না বাবা, এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট-

বাজার করতে হয়, কি করে খদ্দের তুষ্ট করতে হয়, কি করে হিসেবপত্র রাখতে হয়–এও তো জানতে হবে। আমি দু'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম ওরা কি করে চালাচ্ছে। দেখে দেখে শেখা। এখন সব পারি।

বংশীর ভাগ্নে বলি–আচ্ছা মামীমা, খাওয়া দাওয়া করুন, আমি আসবো এখন ওবেলা।

হাজারি বালল–তুমি কাল দুপুরে হোটেলে খেও না–বাসাতে খাবে এখানে। বুঝলে?

বংশীর ভাগ্নে চলিয়া গেলে টেঁপির অনুপস্থিতিতে হাজারি বলিল–কেমন ছেলেটি দেখলে?

–বেশ ভাল। চমৎকার দেখতে।

–ওর সঙ্গে টেঁপির বেশ মানায় না?

–চমৎকার মানায়। তা কি আর হবে। আমাদের অদৃষ্টে কি অমন ছেলে জুটবে?

–জুটবে না কেন, জুটে আছে। ওকে আনিয়ে রেখেচি হোটেলে তবে কি জন্যে? তোমাদের রাণাঘাটের বাসায় আনলাম তবে কি জন্যে?...টেঁপিকে যেন এখন কিছু–বোঝ তো? কাল ওকে একটু যত্ন-আত্যি করো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপির–তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থা বেশ ভাল,

ছেলেটাও ম্যাট্রিক পাস। বিয়ে দিয়ে হোটেলেই বসিয়ে দেবো–থাক আমার অংশীদার হয়ে। কাজ শিখে নিক–টেঁপিও কাছেই রইল আমাদের–বুঝলে না, অনেক মতলব আছে।

টেঁপির মা বোকাসোকা মানুষ–অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

.

সন্ধ্যার পরে খবর আসিল স্টেশনে বেচু চক্কত্তির হোটেলের লোকের সঙ্গে হাজারির চাকরে খরিদ্দার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে। হাজারির চাকর নাথনি বলিল–বাবু, ওদের হোটেলের চাকর খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি করে– আমাদের খদ্দের, আমাদের হোটেলে আসচে–তার হাত ধরে টানবে আর আমাদের হোটেলের নিন্দে করবে। তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গিয়েছে।

–খদ্দের কোথায় গেল?

–খদ্দের সেচে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের ওপর আকচ আছে, আমরাই সব খদ্দের পাই, ওরা পায় না–এই নিয়েই ঝগড়া বাবু। ওদের হোটেলের হয়ে এল বাবু। একটা গাড়ীতেও খদ্দের পায় না।

রাত আটটার সময়ে হাজারি সবে মাছের ঝোল উনুনে চাপাইয়াছে, এমন সময়

বংশী বলিল–হাজারি-দা, জবর খবর আছে। তোমার আগের কর্তা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন দেখে এসো গে। বোধ হয় মারামারি নিয়ে–

–ঝোলটা তুমি দেখো। আমি এসে মাংস চাপাবো–দেখি কি খবর।

অনেকদিন পরে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই পুরোনো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাঁধুনী বামুন, বেচু চক্কত্তি আজও মনিব।

বেচু চক্কত্তি তাহাকে দেখিয়া খাতির করিবার সুরে বলিলেন–আরে এস এস হাজারি এস–এখানে বসো।

বলিয়া গদির এক পাশে হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিলেন, যদিও ঝড়িবার কোন আবশ্যক ছিল না। হাজারি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল–না বাবু, আমি বসবো না। আমায় ডেকেচেন কেন?

–এসো, বসোই এসে আগে। বলচি।

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল–না বাবু, আপনি আমার মনিব ছিলেন এতদিন। আপনার সামনে কি বসতে পারি? বলুন, কি বলবেন–আমি ঠিক আছি।

হাজারির চোখ আপনা-আপনি খাওয়ার ঘরের দিকে গেল। হোটেলের অবস্থা

সত্যই খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। রাত ন'টা বাজে, আগে আগে এসময় খরিদ্দারের ভিড়ে ঘরে জায়গা থাকিত না। আর এখন লোক কই? হোটেলের জলুসও আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–না, বোসো হাজারি। চা খাও, ওরে কাঙালী, চা নিয়ে আয় আমাদের।

হাজারি তবুও বসিতে চাহিল না। চাকর চা দিয়া গেল, হাজারি আড়ালে গিয়া চা খাইয়া আসিল।

বেচু চক্কত্তি দেখিয়া শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। হাজারির মাথা ঘুরিয়া যায় নাই হঠাৎ অবস্থাপন্ন হইয়া। কারণ অবস্থাপন্ন যে হাজারি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি এতদিন হোটেল চালানোর অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিতে পারেন।

হাজারি বলিল–বাবু, আমায় কিছু বলচিলেন?

–হ্যাঁ-বলচিলাম কি জানো, এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের তখন তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই তো–তোমার চাকর আজ আমার চাকরকে মেরেছে ইস্টিশনে। এ কেমন কথা?

এই সময় পদ্মঝি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের চাকরও আসিল।

হাজারি বলিল–আমি তো শুনলাম বাবু আপনার চাকরটা আগে আমার চাকরকে মারে। নাথনি খদ্দের নিয়ে আসছিল এমন সময়–

পদ্মঝি বলিল–হ্যাঁ তাই বৈকি! তোমাদের নাথনি আমাদের খদ্দের ভাগাবার চেষ্টা করে–আমাদের হোটেলে আসছিল খদ্দের, তোমাদের হোটেলে যেতে চায় নি–

একথা বিশ্বাস করা যেন বেচু চক্কত্তির পক্ষেও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন–যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া করে কি হবে হাজারির সঙ্গে। হাজারি তো সেখানে ছিল না, দেখেও নি, তবে তোমায় বল্লাম হাজারি, যাতে আর এমন না হয়–

হাজারি বলিল–বাবু, বেশ আমি রাজী আছি। আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ করলে চলবে না। আপনি আমার পুরোনো মনিব। আসুন, আমরা গাড়ী ভাগ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইস্টিশানে চাকর পাঠাবেন, আমার হোটেলের চাকর সে সময় যাবে না।

বেচু চক্কত্তি বিস্মিত হইলেন। ব্যবসা জিনিসটাই রেষারেষির উপর, আড়াআড়ির উপর চলে–তিনি বেশ ভালই জানেন। মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন তিনি এই ব্যবসা করিয়া। এস্থলে হাজারির প্রস্তাব যে কতদূর উদার, তাহা বুঝিতে বেচুর বিলম্ব হইল না। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন–না তা কেন, ইস্টিশান তো আমার একলার নয়–

–না বাবু, এখন থেকে তাই রইল। মুর্শিদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি

কি নেবেন বলুন মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? আমি সে সময় চাকর পাঠাবো না ইস্টিশানে।

পদ্মঝি দোর হইতে সরিয়া গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন–তা তুমি যেমন বলো। মুর্শিদাবাদখানাই তবে রাখো আমার। তা আর একটু চা খেয়ে যাবে না?–আচ্ছা, এসো তবে।

হাজারি মনিবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

পদ্মঝি পুনরায় দোরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবু, কি বলে গেল?

–গাড়ী ভাগ করে নিয়ে গেল। মুর্শিদাবাদখানা আমি রেখেছি। যা কিছু লোক আসে, মুর্শিদাবাদ থেকেই আসে–বনগাঁর গাড়ীতে কটা লোক আসে? লোকটা বোকা, লোক মন্দ নয়। দুষ্টু নয়।

–আমি আজ সাত বছর দেখে আসছি আমি জানিনে? গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, হোটেলের ছাই দেখাশুনো করে। রেঁধেই মরে, মজা লুটচে বংশী আর বংশীর ভাগ্নে। ক্যাশ তার হাতে। আমি সব খবর নিইচি তলায় তলায়। বংশীকে আবার এখানে আনুন বাবু, ও হোটেল এক দিনে ভুস্যিনাশ হয়ে বসে রয়েচে। বংশীকে ভাঙাবার লোক লাগান আপনি–আর ওর ভাগ্নেটাকেও—

.

পরদিন দুপুরে বংশীর ভাগ্নে সসঙ্কোচে হাজারির বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। হাজারি হোটেল হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল বটে, কিন্তু নিজে তখন আসিতে পারিল না, অত্যন্ত ভিড় লাগিয়াছে খরিদ্দারের, কারণ সেদিন হাটবার।

মায়ের আদেশে টেঁপিকে অতিথির সামনে অনেকবার বাহির হইতে হইল। কখনও বা আসন পাতা, কখনও জলের গ্লাসে জল দেওয়া ইত্যাদি। টেঁপি খুব চটপটে চালাকচতুর মেয়ে, অতসীর শিষ্যা–কিন্তু হঠাৎ তাও কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল এই সুন্দর ছেলেটির সামনে বার বার বাহির হইতে।

বংশীর ভাগ্নেটিও একটু বিস্মিত হইল। হাজারি-মামারা পাড়াগাঁয়ের লোক সে জানে– অবস্থাও এতদিন বিশেষ ভাল ছিল না। আজই না হয় হোটেলের ব্যবসায়ে দু-পয়সার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু হাজারি-মামার মেয়ে তো বেশ দেখিতে, তাহার উপর তার চালচলন ধরন-ধারণ যেন স্কুলে পড়া আধুনিক মেয়েছেলের মত। সে কাপড় গুছাইয়া পরিতে জানে, সাজিতে গুজিতে জানে, তার কথাবার্তার ভঙ্গিটাও বড় চমৎকার।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় হাজারি আসিল। বলিল–খাওয়া হয়েছে বাবা, আমি আসতে পারলাম না–আজ আবার ভিড় বড্ড বেশী।

–ও টেঁপি আমায় একটু তেল দে মা, নেয়ে নিই, আর তোর ঐ দাদার শোওয়ার

জায়গা করে দে দিকি--পাশের ঘরটাতে একটু গড়িয়ে নাও বাবা।

বংশীর ভাগ্নে গিয়া শুইয়াছে–এমন সময় টেঁপি পান দিতে আসিল। পানের ডিবা নাই, একখানা ছোট রেকাবিতে পান আনিয়াছে। ছেলেটি দেখিল চুন নাই রেকাবিতে। লাজুক মুখে বলিল–একটু চুন দিয়ে যাবেন?

টেঁপির সারা দেহ লজ্জার আনন্দে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রথম কারণ তাহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই হইল প্রথম। জীবনে ইতিপূর্বে তাহাকে কেহ ‘আপনি’ ‘আজ্ঞে’ করিয়া কথা বলে নাই। দ্বিতীয়ত: কোনও অনাত্মীয় তরুণ যুবকও তাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কথা বলে নাই। বলে নাই কি একেবারে! গাঁয়ের রামু-দা, গোপাল-দা, জহর-দা-ইহারাও তাহার সঙ্গে তো কথা বলিত! কিন্তু তাহাতে এমন আনন্দ তাহার হয় নাই তো কোনোদিন? চুন আনিয়া রেকাবিতে রাখিয়া বলিল–এতে হবে?

–খুব হবে। থাক ওখানেই–ইয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন?

টেঁপির বেশ লাগিল ছেলেটিকে। কথাবার্তার ধরন যেমন ভাল, গলার সুরটিও তেমনি মিষ্ট। যখন জলের গ্লাস আনিল, তখন ইচ্ছা হইতেছিল ছেলেটি তাহার সঙ্গে আর একবার কিছু বলে। কিন্তু ছেলেটি এবার আর কিছু বলল না। টেঁপি জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, বৈকাল অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে –টেঁপি তখন একবার

উঁকি মারিয়া দেখিল, ছেলেটি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ টেঁপির কেমন একটা অহেতুক স্নেহ আসিল ছেলেটির প্রতি।

আহা, হোটেলে কত রাত পর্যন্ত জাগে। ভাল ঘুম হয় না রাত্রে!

টেঁপি আসিয়া মাকে বলিল–মা সেই লোকটা এখনও ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেবো, না ঘুমুবে।

টেঁপির মা বলিল–ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। ডাকবার দরকার কি? চাকরটা কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। খাবার আনতে দিতাম। উনিও তো বাড়ী নেই।

টেঁপি বলিল–লোকটা চা খায় কিনা জানিনে, তাহলে ঘুম থেকে উঠলে একটু চা করে দিতে পারলে ভাল হোত।

টেঁপির মা চা নিজে কখনো খায় নাই, করিতেও জানে না। আধুনিকা মেয়ের এ প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না।

মেয়েকে বলিল–তুই করে দিতে পারবি তো?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল–তুমি যে কি বল মা, হেসে প্রাণ বেরিয়ে

যায়– পরে কেমন একটি অপূর্ব ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিভরা মুখের চিবুকখানি বার বার উঠাইয়া-নামাইয়া বলিতে লাগিল–চা কই? চিনি কই? কেটলি কই? চায়ের জল ফুটবে কিসে? ডিস-পেয়ালা কই? সে সব আছে কিছু?

টেঁপির মায়ের বড় ভাল লাগিল টেঁপির এই ভঙ্গি। সে সস্নেহে মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে এমন সুন্দর ভঙ্গিতে কথা টেঁপি আর কখনও বলে নাই।

এই সময় হাজারি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, হোটেলেই ছিল। বলিল–নরেন কোথায়? ঘুমুচ্ছে নাকি?

টেঁপির মা বলিল–তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওকে একটু খাবার আনিয়ে দিতে হবে। আর টেঁপি বলছে চা করে দিলে হোত।

হাজারির বড় স্নেহ হইল টেঁপির উপর। সে না জানিয়া যাহাকে আজ যত্ন করিয়া চা খাওয়াইতে চাহিতেছে, তাহারই সঙ্গে তার বাবা-মা যে বিবাহের ষড়যন্ত্র করিতেছে–বেচারী কি জানে?

বলিল–আমি সব এনে দিচ্ছি। হোটেলেই আছে। হোটেলে বড় ব্যস্ত আছি, কলকাতা থেকে দশ-বারো জন বাবু এসেছে শিকার করতে। ওর। অনেকদিন আগে একবার এসে আমার রান্না মাংস খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। সেই আগের হোটেলে গিয়েছিল, সেখানে নেই শুনে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। ওরা রাত্রে

মাংস আর পোলাও খাবে। তোমরা এবেলা রান্না কোরো না–আমি হোটেল থেকে আলাদা করে পাঠিয়ে দেবো এখন। নরেনকে যে একবার দরকার, বাবুদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইতে হবে, সে তো আমি পারবো না, নরেনকে ওঠাই দাঁড়াও–

টেঁপির মা বলিল–ঘুম থেকে উঠিয়ে কিছু না খাইয়ে ছাড়া ভাল দেখায় না। টেঁপি চায়ের কথা বলচিল–তা হোলে সেগুলো আগে পাঠিয়ে দেওগে, এখন জাগিও না।

.

বৈকালের দিকে নরেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। অত্যন্ত বেলা গিয়াছে, পাঁচিলের ধারে সজনে গাছটার গায়ে রোদ হলদে হইয়া আসিয়াছে। নরেনের লজ্জা হইল– পরের বাড়ী কি ঘুমটাই ঘুমাইয়াছে। কে কি–বিশেষ করিয়া হাজারি-মামার মেয়েটি কি মনে করিল। বেশ মেয়েটি। হাজারি-মামার মেয়ে যে এমন চালাক-চতুর, চটপটে, এমন দেখিতে, এমন কাপড়-চোপড় পরিতে জানে তাহা কে ভাবিয়া ছিল?

অপ্রতিভ মুখে সে গায়ে জামা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল–আপনি উঠেছেন? মুখ ধোবার জল দেবো?

নরেন থতমত খাইয়া বলিল–না, না, থাক আমি হোটেলেই–

–মা বললে আপনি চা খেয়ে যাবেন, আমি মাকে বলে আসি—

ইতিমধ্যে হাজারি চায়ের আসবাব হোটেলের চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, টেঁপি নিজেই চা করিতে বসিয়া গেল। তাহার মা জলখাবারের জন্য ফল কাটিতে লাগিল।

টেঁপি বলিল–মা চায়ের সঙ্গে শসা-টসা দেয় না। তুমি বরং ঐ নিমকি আর রসগোল্লা দাও রেকাবিতে–

–শসা দেয় না? একটা ডাব কাটবো? বাড়ীর ভাব আছে—

টেঁপি হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি। মুখে আঁচল চাপা দিয়া বলিল–হি হি, তুমি মা যে কি!...চায়ের সঙ্গে বুঝি ডাব খায়?

টেঁপির মা অপ্রসন্ন মুখে বলিল–কি জানি তোদের একেলে ঢং কিছু বুঝিনে বাপু। যা বোঝো তাই করো। ঘুম থেকে উঠলে তো নতুন জামাইদের ডাব দিতে দেখেছি চিরকাল দেশেঘরে-

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই টেঁপির মা মনে মনে জিভ কাটিয়া চুপ করিয়া গেল। মানুষটা একটু বোকা ধরনের, কি ভাবিয়া কি বলে, সব সময় তলাইয়া দেখিতে জানে না।

টেঁপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল–নতুন জামাই? কে নতুন জামাই?

–ও কিছু না; দেশে দেখেছি তাই বলচি। তুই নে, চা করা হোল?

টেঁপির মনে কেমন যেন খটকা লাগিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, তাহার উপর নিতান্ত ছেলে মানুষটিও নয়, যখন চা ও খাবার লইয়া পুনরায় ছেলেটির সামনে গেল তখন তাহার কি জানি কেন যে লজ্জা করিতেছে তাহা সে নিজেই ভাল ধরিতে পারিল না।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল–ও কি! এই এত খাবার কেন এখন, চা একটু হোলেই–

টেঁপি কোনো রকমে খাবারের রেকাবি লোকটার সামনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলে যেন বাঁচে।

ছেলেটি ডাকিয়া বলিল–পান একটা যদি দিয়ে যান—

পান সাজিতে বসিয়া টেঁপি ভাবিল–বাবা খাটিয়ে মারলে আমায়! চা দেও–পান সাজো–আমার যেন যত গরজ পড়েছে, বাবার হোটেলের লোক তা আমার কি?

টেঁপি একটা চায়ের পিরিচে পান রাখিয়া দিতে গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ কিন্তু। কথাবার্তা বেশ, হাসি-হাসি মুখ। কি কাজ করে হোটেলে কে জানে?

পান লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল–মামীমা আমি যাচ্ছি, কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না। এত ঘুমিয়েছি, বেলা আর নেই আজ।

বেশ ছেলেটি।

নতুন জামাই? কে নতুন জামাই? কাহাদের নতুন জামাই?

মা এক-একটা কথা বলে কি যে, তার মানে হয় না।

.

টেঁপির মা কখনও এত বড় শহর দেখে নাই।

এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ইস্টিশানে বিদ্যুতের আলো, লোকজনই বা কত! আর তাদের এঁড়োশোলায় দিনমানেই শেয়াল তাকে বাড়ীর পিছনকার ঘন বাঁশবনে। সেদিন তো দিনদুপুরে জেলেপাড়ার কেষ্ট জেলের তিন মাসের ছেলেকে শেয়ালে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুসুম আসিয়া একদিন উহাদের বেড়াইতে লইয়া গেল। কুসুমের সঙ্গে তাহার রাধাবল্লভতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চূর্ণীর ঘাট, পালচৌধুরীদের বাড়ী–সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। পালচৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া টেঁপির মা ও টেঁপি দু-জনেই

অবাক। এত বড় বাড়ী জীবনে তাহারা দেখে নাই। অতসীদের বাড়ীটাই এতদিন বড়লোকের বাড়ীর চরম নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে যাহারা, তাহাদের পক্ষে অবাক হইবার কথা বটে।

টেঁপির মা বলিল–না, শহর জায়গা বটে কুসুম! গায়ে গায়ে বাড়ী আর সব কোঠাবাড়ী এদেশে। সবাই বড়লোক। ছেলেমেয়েদের কি চেহারা, দেখে চোখ জুড়ায়। হাঁরে, এদের বাড়ী ঠাকুর হয় না? পুজোর সময় একদিন আমাদের এনো মা, ঠাকুর দেখে যাবো।

সে আর ইহার বেশী কিছুই বোঝে না।

একটা বাড়ীর সামনে কত কি বড় বড় ছবি টাঙানো, লোকজন ঢুকিতেছে, রাস্তার ধারে কি কাগজ বিলি করিতেছে। টেঁপির মনে হইল এই বোধ হয় সেই টকি যাকে বলে, তাহাই। কুসুমকে বলিল–কুসুম দি, এই টকি না?

–হ্যাঁ দিদি। একদিন দেখবে?

--এক দিন এনো না আমাদের। মা-ও কখনো দেখে নি–সবাই আসবো।

একখানা ধাবমান মোটর গাড়ীর দিকে টেঁপির মা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যতক্ষণ সেখানা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইয়া গেল।

কুসুম বলিল–আমার বাড়ী একটু পায়ের ধূলো দিন এবার জ্যাঠাইমা

কুসুমের বাড়ী যাইতে পথের ধারে রেলের লাইন পড়ে। টেঁপির মা বলিল–কুসুম, দাঁড়া মা একখানা রেলের গাড়ী দেখে যাই–

বলিতে বলিতে একখানা প্রকাণ্ড-মালগাড়ী আসিয়া হাজির। টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ী চলিয়াছে তো চলিয়াছে–তাহার আর শেষ নাই।

উঃ, কি বড় গাড়ীটা!

কুসুম বলিল–জ্যাঠাইমা, রাণাঘাট ভাল লাগছে?

-লাগচে বৈকি, বেশ জায়গা মা।

আসলে কিন্তু এঁড়োশোলার জন্য টেঁপির মায়ের মন কেমন করে। শহরে নিজেকে সে এখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। সেখানকার তালপুকুরের ঘাট, সদা বোষ্টমের বাড়ীর পাশ দিয়া যে ছোট নিভৃত পথটি বাঁশবনের মধ্য দিয়া বাঁড়ুয্যে-পাড়ার দিকে গিয়াছে, দুপুর বেলা তাহাদের বাড়ীর কাছে বড় শিরীষ গাছটায় এই সময় শিরীষের সুঁটি শুকাইয়া ঝুন ঝুন শব্দ করে, তাহাদের উঠানের বড় লাউমাচায় এতদিন কত লাউ ফলিয়াছে, পেঁপে গাছটায় কত পেঁপের ফুল ও জালি দেখিয়া আসিয়াছিল–সে সবের জন্য মন কেমন করে বৈকি।

তবে এখানে যাহা সে পাইয়াছে টেঁপির মা জীবনে সে রকম সুখের মুখ দেখে নাই। চাকরের ওপর হুকুম চালাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সকলে মানে, খাতির করে–অমন সুন্দর ছেলেটি তাহাদের হোটেলের মূহুরী– এ ধরনের ব্যাপারে কল্পনাও কখনও সে করিয়াছিল?

কুমের বাড়ী সকলে গিয়া পৌঁছিল। কুসুম ভারি খুশি হইয়া উঠিয়াছে–তাহার বাপের বাড়ী দেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারকে এখানে পাইয়া। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া টেঁপির মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–আমাদের বড্ড ভাগ্যি মা, আপনাদের চরণ-ধূলো পড়লো এ বাড়ীতে।

টেঁপির মাকে এত খাতির কবিয়া কেহ কখনো কথা বলে নাই–এত সুখও তাহার কপালে লেখা ছিল! হায় মা ঝিটকিপোতার বনবিবি, কি জাগ্রত দেবতাই তুমি! সেবার ঝিটকিপোতায় চৈত্র মাসে মেলায় গিয়া টেঁপির মা বনবিবিতলায় স-পাঁচ আনার সিন্নি দিয়া স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়াছিল, এখনও যে বছর পার হয় নাই! তবুও লোকে ঠাকুর দেবতা মানিতে চায় না।

কুসুম সকলকে জলযোগ করাইল। পান সাজিয়া দিল। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া কতক্ষণ গল্পগুজব করিল। কুসুম গ্রামের কথাই কেবল শুনিতে চায়। কতদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, বাবা-মা মরিয়া গিয়াছে, জ্যাঠামশায় আছে, কাকারা আছে– তাহারা কোনো দিন খোঁজও নেয় না। খোঁজ করিত অবশ্যই, যদি তাহার নিজের অবস্থা ভাল হইত। গরীব লোকের আদর কে করে?...এই সব অনেক দুঃখ

করিল। আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে কুসুম উহাদের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

হাজারির হোটেলে রাত্রে এক মজার ব্যাপার ঘটিল সেদিন।

দশ-পনেরোটি লোক একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে–হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল–ঠাকুর, এই যে ভাতটা দিলে, এ দেখছি ও বেলার বাসি ভাত।

বংশী ঠাকুর ভাত দিতেছিল, সে অবাক হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু সে কি? আমাদের হোটেলে ওরকম পাবেন না। আধ মণ চাল এক-একবেলা রান্না হয়, তাতেই কুলোয় না– বাসি ভাত থাকবে কোথা থেকে?

–আলবাৎ এ ও-বেলার ভাত। আমি বলচি এ ও-বেলার ভাত–

গোলমাল শুনিয়া হাজারি আসিয়া বলিল–কি হয়েছে বাবু?...বাসি ভাত? কক্ষনো না। আপনি নতুন লোক, কিন্তু এঁরা যাঁরা খাচ্ছেন তাঁরা আমায় জানেন–আমার হোটেল না চলে না চুলক কিন্তু ওসব পিরবিত্তি ভগবান যেন আমায় না দেন—

লোকটা তখন তর্কের মোড় ঘুরাইয়া ফেলিল। সে যেন ঝগড়া করিবার জন্যই তৈরী হইয়া আসিয়াছে। পাত হইতে হাত তুলিয়া চোখ গরম করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল তবে তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?

হাজারি নরম হইয়া বলিল–না বাবু তা তো আমি বলচি না। কিন্তু আপনার ভুলও

তো হতে পারে। আমি দিব্যি করে বলচি বাবু, বাসি ভাত আমার হোটেলে থাকে না–

–থাকে না? বড্ড নবাবী কথা বলছ যে। বাসি ভাত আবার এ বেলা হাঁড়িতে ফেলে দাও না তুমি?

–না বাবু।

–পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– আবার তবুও না বলছ? দেখবে মজা?

এই সময়ে নরেন ও হোটেলের আরও দু একজন সেখানে আসিয়া পড়িল। নরেন গরম হইয়া বলিল–কি মজা দেখাবেন আপনি?

–দেখবে? সরে এসো দেখাচ্ছি–জোচ্চোর সব কোথাকার–

এই কথায় একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। পুরানো খরিদ্দাররা সকলেই হাজারির পক্ষ অবলম্বন করিল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল–রাস্তার সমবেত জনতার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল–শুনুন মশাই সব বলি। এই এর হোটেলে বাসি ভাত দিয়েছিল খেতে–ধরে ফেলেছি কিনা তাই এখন আবার আমাকে মারতে আসছে–পুলিশ ডাকবো এখুনি–স্যানিটারি দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে তবে ছাড়বো–জোচ্চোর কোথাকার–লোক মারবার মতলব তোমাদের?

এই সময় হোটেলের চাকর শশী হাজারিকে ডাকিয়া বলিল–বাবু, এই লোকটাকে যেন আমি বেচু চক্কত্তির হোটেলে দেখেছি। সেখানে যে ঝি থাকে, তার সঙ্গে বাজার করে নিয়ে যেতে দেখেছি–

নরেনের সাহস খুব। সে হোটেলের রোয়াকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল–মশাই, আপনি বেচু চক্কত্তির হোটেলের পদ্মঝিয়ের কে হন?

তবুও লোকটা ছাড়ে না। সে হাত-পা নাড়িয়া প্রমাণ করিতে গেল পদ্মঝিয়ের নামও সে কোনোদিন শোনে নাই। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের তেজ যেন তখন কমিয়া গিয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল–এইবার মানে মানে সরে পড় বাবা, কেন মার খেয়ে মরবে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

এই ঘটনার পরে অনেক রাত্রে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলে গিয়া হাজির হইল। বেচু চক্কত্তি তহবিল মিলাইতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল–কি, হাজারি যে? এসো এসো। এত রাত্রে কি মনে করে?

হাজারি বিনীতভাবে বলিল–বাবু, একটা কথা বলতে এলাম।

–কি–বল?

–বাবু আপনি আমার অন্নদাতা ছিলেন একসময়ে–আজও আপনাকে তাই বলেই ভাবি। আপনার এখানে কাজ না শিখলে আজ আমি পেটের ভাত করে খেতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা আছে বলে আমি তো ভাবিনে।

–কেন, কেন, একথা কেন?

হাজারি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল–বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার মনিব। আমাকে এভাবে বিপদে না ফেলে যদি বলেন হাজারি তুমি হোটেল উঠিয়ে দাও, তাই আমি দেবো। আপনি হুকুম করুন–

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলিল–আমি তো এর কোনো খবর রাখিনে– আচ্ছা, তুমি যাও আজ, আমি তদন্ত করে দেখে তোমায় কাল জানাবো। আমাদের কোন লোক তোমার হোটেলে যায় নি এ একেবারে নিশ্চয়। কাল জানতে পারবে তুমি।... তারপর হাজারি চলচে-টলচে ভাল?

–একরকম আপনার আশীর্বাদে–

–রোজ কি রকম বিক্রীসিক্রি হচ্ছে? রোজ তবিলে কি রকম থাকে। তুমি কিছু মনে কোরো না–তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলেই জিজ্ঞেস করচি।

–এই বাবু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা–ধরুন না কেন আজ রাত্তিরের বিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা স'বারো আনা।

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য্য হইলেন মনে মনে। মুখে বলিলেন–বেশ, বেশ। খুব ভালো–শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, তাহলে এসো আজগে। কাল খবর পাবে।

হাজারি চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মঝিকে ডাকাইলেন। পদ্ম আসিয়া বলিল–হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি? কি বলচিল?

বেচু চক্কত্তি বলিলেন –ও পদ্ম, হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল। রাণাঘাটের বাজারে হোটেল করে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার দাঁড়া-তবিল, এ তো কখনো শুনি নি। তার মানে বুঝচো? দাঁড়া-তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাত-আট টাকা দৈনিক লাভ, ফেলে-ঝেলেও। মাসে হোল আড়াইশো টাকা। দুশো টাকার তো মার নেই–হ্যাঁ পদ্ম?

পদ্মঝি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল–গুল দিয়ে গেল না তো?

–না, গুল দেবার লোক নয় ও। সাদাসিধে মানুষটা–আমায় বড্ড মানে এখনও। ও গুল দেবে না, অন্তত আমার কাছে। তা ছাড়া দেখছ না রেলবাজারে কোন হোটেলে আর বিক্রী নেই। সব শুষে নিচ্ছে ওই একলা।

–আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবু ওর হোটেলে। খুব খানিকটা রাউ করে দিয়েও এসেছে নাকি। খুব চেঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে। আর কিছু হোক না হোক লোকে শুনে তো রাখলে?

–যদু বাঁড়ুয্যেরাও আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল, ওর হোটেল ভাঙতেই হবে। নইলে রেলবাজারে কেউ আর টিকবে না। এই কথা যদু বাঁড়ুয্যেও বললে। কিন্তু তাতে কি হবে না–ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো। নৃসিংহ আছে?

–না বেরিয়ে গেল। পুলিশে সেই যে খবর দেবার কি হোল?

–দেখ পদ্ম, আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই। হাজারি লোকটা ভালো–আজ এসেছিল, এমন হাত জোড় করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর ওপর রাগ থাকে না।

–খ্যাংরা মারি ওর ভালমানষেতার মুখে–ভিজে বেড়ালটি, মাছ খেতে কিন্তু ঠিক আছে –পুলিশের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদুবাবু, তাই তুমি করো এবার। ওর হোটেল না ভাঙলে চলবে না। নয়তো আমাদের পাততাড়ি গুটুতে হবে এই আমি বলে দিলাম–এবেলা তবিল কত?

বেচু চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন–মোট ছ'টাকা সাড়ে তিন আনা–

পদ্মঝি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল–দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী ওদিকে। কাল

বলেছে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে হৈ চৈ বাধাবে। ভাড়া দেবে কোত্থেকে?

–দেখি।

–তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকী পাঁচ মাস। সে বলছে আর কাজ করবে না, তার কি করি?

–বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা। দেখি সামনের মাসে কি রকম হয়—

পদ্মঝি রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল–আমার ভাতটা বেড়ে দাও ঠাকুর, রাত হয়েছে অনেক, বাড়ী যাই।

তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ছন্নছাড়া অবস্থা, ওই বড় দশ সেবী ডেকচিটা আজ তিন-চার মাস তোলা আছে–দরকার হয় না। আগে পিতলের বালতি করিয়া সরিষার তৈল আসিত, এখন আসে ছোট ভাঁড়ে–বালতি দরকার হয় না। এমন দুরবস্থা সে কখনো দেখে নাই হোটেলের।

তাহার মনটা কেমন করিয়া ওঠে।...

নানারকমে চেষ্টা করিয়া এই হোটেলটা সে আর কর্তা দুজনে গড়িয়া তুলিয়া ছিল। এই হোটেলের দৌলতে যথেষ্ট একদিন হইয়াছে। ফুলেনবলা গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল, সেখানে তার ভাই এখনও আছে– চাষবাস করিয়া খায়–

আর সে এই রাণাঘাটের শহরে সোনাদানাও পরিয়া বেড়াইয়াছে একদিন–এই হোটেলের দৌলতে। এই হোটেল তার বুকের পাঁজর। কিন্তু আজ বড় মুশকিলের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কোথা হইতে এক উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আসিয়া জুটিল হোটেলে–হোটেলের সুলুকসন্ধান জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শীলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছে। এত যত্নের, এত সাধ-আশার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে! যাহার জন্য আজ হোটেলের এই দুরবস্থা,–ইচ্ছা হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে, যদি বাগে পায়। তাহার উপর আবার দয়া কিসের? কর্তা ওই রকম ভালমানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই তো আজ পথের কুকুর সব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।—দয়া!

.

একদিন রাণাঘাটের স্টেশন মাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাজারি নিজে যাইতে রাজী নয়–কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব, সে জানে। নরেন যাওয়াই ভাল। অবশেষে তাহাকেই যাইতে হইল। নরেন সঙ্গে গেল।

সাহেব বলিলেন–টোমার নাম হাজারি? হিণ্ডু হোটেল রাখো বাজারে?

-হ্যাঁ হুজুর।

–টুমি প্ল্যাটফর্মে কেটার করবে? হিণ্ডু ভাত, ডাল, মাছ, দহি?

হাজারি নরেনের মুখের দিকে চাহিল। সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না। নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুঝাইল। রেলযাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হিন্দু ভাতের হোটেল খুলিতে চায়। সাহেব হাজারির নামডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। আপাততঃ দেড়শো টাকা জমা দিলে উহারা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচে হোটেলের ঘর বানাইয়া দিবে।

হাজারি সাহেবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজী আছে।

স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেণ্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলি পুরাইয়া হাজারির নাম সই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোর কমপিটিশন চলিল। নৈহাটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালা টেণ্ডার দিল এবং ওপর ওয়ালা কর্মচারীদের নিকট তদ্বিরতাগাদাও শুরু করিল।

নিজ রাণাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না–শেষের দিকে, অর্থাৎ যখন টেণ্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী, যদু বাঁড়ুয্যে কথাটা শুনিল। স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটেলে খায়, সেই কি করিয়া জানিতে পারিয়া যদুকে বলিল–একটু চেষ্টা করুন না। আপনি–টেণ্ডার দিন। হয়ে যেতে পারে।

যত্ন চুপি চুপি টেণ্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেণ্ডারের জন্য জমা দিয়া আসিল।

সেদিন বেচু চক্কত্তি সবে হোটেলের গদিতে আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় পদ্মঝি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল–শুনেছ গো? শুনে এলাম একটা কথা–

–কি?

–ইস্টিশানে ভাতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি, দরখাস্ত দাও না কর্তা।

–ইস্টিশানে? ছোঃ, ওতে খদ্দের হবে না। দূরের যাত্রীদের মধ্যে কে ভাত খাবে? সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে–

–তোমার এই সব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা-উজীর মারা; সবাই দূরের যাত্রী থাকে না –যারা গাড়ী বদলে খুলনে লাইনে যাবে, তারা খাবে, দুপুরে যে সব গাড়ী কলকাতায় যায়–তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই খেয়ে যাবে। শুনলাম বাঁড়ুধ্যে মশায় নাকি দরখাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে–

বেচু চক্কত্তির চমক ভাঙিল। যদু বাঁড়ুয্যে যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে, তবে এ দুধে সর আছে, কারণ যদু বাঁড়ুয্যে ঘুঘু হোটেলওয়ালা। পয়সা আছে না বুঝিয়া সে টেণ্ডারের পাঁচ টাকা জমা দিত না। বেচু বলিল–যাই, একবার দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে–

পদ্মঝি বলিল–কেরানী বাবুদের কিছু খাইয়ে এস–নইলে কাজ হবে না। আমাদের হোটেলে সেই যে শশধরবাবু খেতো, তার শালা ইষ্টিশানের মালবাবু, তার কাছে সুলুকসন্ধান নিও। না করলে চলবে কি করে? এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

–কেন ওবেলা খদ্দের তো মন্দ ছিল না?

পদ্মঝি হতাশার সুরে বলিল–ওকে ভাল বলে না কর্তা। সতেরো জন থাড কেলাসে আর ন'জন বাধা খদ্দেরে টাকা দিচ্ছে তবে হোটেল চলছে–নইলে বাজার হোত না। মুদি ধার দেওয়া বন্ধ করবে বলে শাসিয়েছে, তারই বা দোষ কি–একশো টাকার ওপর বাকী।

বেচু বলিল–টেণ্ডারের দরখাস্ত দিতে গেলে এখুনি পাঁচটা টাকা চাই, তবিলে আছে দেখছি এক টাকা সাড়ে তের আনা মোট, ওবেলার দরুন। তার মধ্যে কয়লার দাম দেবো বলা আছে ওবেলা, কয়লাওয়ালা এল বলে। টাকা কোথায়?

পদ্মঝি একটু ভাবিয়া বলিল–ও-থেকে একটা টাকা নাও এখন। আর আমি চার টাকা যোগাড় করে এনে দিচ্ছি। আমার লবঙ্গফুল থাকে এপাড়ায় তার কাছ থেকে। কয়লা-ওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো–

–বুঝিয়ে রাখবে কি, সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে। তুমি পাঁচ টাকাই এনে দ্যাও–

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেচুও গিয়া টেণ্ডার দিয়া আসিল। পদ্মঝি সাগ্রহে গদির ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, এখনও খরিদ্দার আসা শুরু হয় নাই। বলিল–হয়ে গেল কর্তা? কি শুনে এলে?

–হয়ে যাবে এখন? ছেলের হাতের পিঠে বুঝি? তবে খুব লাভের কাণ্ড যা শুনে এলাম। যদু পাকা লোক–নইলে কি দরখাস্ত দেয়? আমি আগে বুঝতে পারি নি। মোটা লাভের ব্যবসা। ইস্টিশানের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতো মনে আছে? সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে। সে-ই বল্লে–যাত্রীরা রেলের বড় আপিসে দরখাস্ত করেছে আমাদের খাওয়ার কষ্ট। তা ছাড়া, রেল কোম্পানী এলেটিক আলো দেবে, পাখা দেবে, ঘর করে দেবে–তার দরুন কিছু নেবে না আপাতোক। রেলের বোর্ড না কি আছে, তাদের অর্ডার। যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে। যথেষ্ট লোক খাবে পদ্ম, মোটা পয়সার কাণ্ড যা বুঝে এলাম।

পদ্মঝি বলিল–জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো সিদ্ধেশ্বরীতলায়। হয়ে যেন যায়–তুমি কাল আর একবার গিয়ে ওদিগের কিছু খাইয়ে এসো—

–বলি যদু বাঁড়ুয্যে টের পেলে কি করে হ্যাঁ?

–ও সব ঘুঘু লোক। ওদের কথা ছাড়ান দ্যাও।

ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল

রেলের তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈয়ারী করিতেছে-আসবাবপত্র, আলমারি, টেবিল, চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে, সে-সব কোম্পানী দিবে।

এই সময় একদিন যদু বাঁড়ুয্যেকে হঠাৎ তাহাদের গদিঘরে আসিতে দেখিয়া বেচু ও পদ্মঝি উভয়েই আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি–কুলীন ব্রাহ্মণ, মাটিঘরার বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে-বংশের ছেলে। কখনও সে কারো দোকানে বা হোটেলে গিয়া হাউ-হাউ করিয়া বকে না–গম্ভীর মেজাজের মানুষটি।

বেচু চক্কত্তি যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

যদু বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল–তারপর এসেছি একটা কাজে, চক্কত্তি মশায়। হোটেল চলছে কেমন?

বেচু বলিল–আর তেমন নেই, বাঁড়ুয্যে মশায়। ভাবছি, তুলে দিয়ে আর কোথায়ও যাই! খদ্দেরপত্তর নেই আর–

–আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি। ইস্টিশানে হোটেল হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই। আমি একটা টেণ্ডার দিই। শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন?

–হ্যাঁ—তা—আমিও—

–বেশ। বলি, শুনুন। নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদ্বির করচে ওপরে–

তাই হয়ে যাবে। মোটা পয়সার কারবার হবে ওই হোটেলটা। আসাম মেল, শান্তিপুর, বনগাঁ, ডাউন চাটগাঁ মেল–এসব প্যাসেঞ্জার খাবে–তা ছাড়া থাউকো লোক খাবে। ভাল পয়সা হবে এতে। আষন আপনি আর আমি দু'জনে মিলে দরখাস্ত দিই যে রাণাঘাটের আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালা, আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবে হোটেল। স্থানীয় হোটেলওয়ালারা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করেছে এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের খুব।

বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়াই আজ যদু বাঁড়ুয্যে তাহার গদিতে ছুটিয়া আসিয়াছে–নতুবা ঘুঘু যদু কখনও লাভের ভাগাভাগিতে রাজী হইবার পাত্র নয়। বলিল–বেশ দরখাস্ত লিখিয়ে আনুন–আমি সই করে দেবো এখন।

যদু বাঁড়ুয্যে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল–আরে, সে কি বাকি আছে, সে অশ্বিনী উকীলকে দিয়ে মুসোবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করে এনেছি। আপনি এখানটায় সই করুন–

যদু বাঁড়ুয্যে সই লইয়া চলিয়া গেলে পদ্মঝি আসিয়া বলিল–কি গা কর্তা?

বেচু হাসিয়া বলল–কারে না পড়লে কি ঘুঘু যদু বাঁড়ুয্যে এখানে আসে কখনো? সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল। শুনবে?

পদ্ম সব শুনিয়া বলিল–তাও ভালো। বেশী যদি বিক্রী হয়, ভাগাভাগিও ভালো।

এখানে তোমার চলবেই না, যেরকম দাঁড়াচ্চে তার আর কি। হোক ইষ্টিশানে আধা বখরাই হোক।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে একদিন যদু বাঁড়ুয্যে বেচুর গদিঘরে ঢুকিয়া যে ভাবে ধপ করিয়া হতাশ ভাবে তক্তপোশের এক কোণে বসিয়া পড়িল, তাহাতে পদ্মঝি (সেখানেই ছিল) বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্য পদ্মঝি প্রস্তুত ছিল না।

যদু বলিল–শুনেছেন, চক্কত্তি মশাই! কাণ্ডটা শোনেন নি?

বেচু চক্কত্তি ওভাবে যদু বাঁড়ুয্যেকে বসিতে দেখিয়া পূর্বেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শুভ নয়। তবুও সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল–কি। কি ব্যাপার?

–ইষ্টিশানের থেকে আসছি এই মাত্তর, আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেণ্ডার মঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে–

বেচু একথার উত্তরে কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখে যদু বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

–কার হয়ে গেল জানেন?

–না–সেই ভাটিয়া ব্যাটার বুঝি

–তা হলেও তো ছিল ভাল। হল হাজারির, তোমাদের হাজারি—

বেচু ও পদ্মঝি দু'জনেই বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায়।

বেচু চক্কত্তি বলিল–দেখে এলেন?

–নিজের চোখে। ছাপা অক্ষরে। নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে–

পদ্মঝি হতবাক হইয়া যদু বাঁড়ুয্যের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল কথাটা যেন সে এখনও বিশ্বাস করে নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল–তা হলে ওরই হল!

এ কথার কোন অর্থ নাই, যদুও বুঝিল, পদ্মঝিও বুঝিল। ইহা শুধু বেচুর মনের গভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল–ওঃ, লোকটার বরাত খুবই ভাল যাচ্ছে দেখছি। ধূলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আজ একুশ বছর এই রেলবাজারে হোটেল চালাচ্ছি, আমরা গেলাম ভেসে, আর ও হাতাবেড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাত, তার কিনা–সবই বরাত–

বেচু বলিল–কেন হল, কিছু শুনলেন নাকি? টাকা ঘুষ দিয়েছিল নিশ্চয়–

–টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। হেড অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে–এখানকার ইষ্টিশান মাষ্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছিল। কোন কোন প্যাসেঞ্জার ওর নাম লিখেছে হেড অফিসে, খুব ভাল রান্না করে নাকি, এই সব।

আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্মঝি বলিল–বলি এ কি হল, হ্যাঁ কর্তা?

–তাই তো!

–মড়ুই পোড়া বামুনটা বড় বড় বাড়িয়েচে, আর তো সহ্যি হয় না—

–কি আর করবে বল। আমি ভাবছি

–কি?

–কাল একবার হাজারির হোটেলে আমি যাই

–কেন, কি দুঃখে?

–ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও, ছেলের হোটেলের অংশ কিছু

আমায় দাও–

পদ্মঝি ভাবিয়া বলিল–কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চায়?

–আমাকে খুব মানে কিনা তাই বলচি। এ না করলে আর উপায় নেই পদ্ম। হোটেল আর চালাতে পারবো না। একরাশ দেনা–খরচে আছে আর কুলোয় না। এ আমায় করতেই হবে।

পদ্মঝিয়ের মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। বলিল–যা ভাল বোঝ কর কর্তা। আমি কি বলব বল!

কিছুক্ষণ পরে যদু বাঁড়ুয্যে পুনরায় বেচুর হোটেলে আসিয়া বসিল। বেচু চক্কত্তি খাতির করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে যদু বলিল–একটা মতলব মনে এসেছে চক্কত্তি মশায়–তাই আবার এলাম।

বেচু সকৌতূহলে বলিল–কি বলুন তো?

–আমি পালচৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম। ওঁরা জমিদার, ওঁদের খাতির করে রেল কোম্পানী। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন, আপনি আর আমি কলকাতা রেল আপিসে একবার আপীল করি গিয়ে।

পদ্মঝি দোরের কাছেই ছিল, সে বলিল–তাই যান গিয়ে কর্তা, আমিও বলি যাতে কক্ষনো ও মড়ুই পোড়া বামুন হোটেল না পায় তা করাই চাই, দু'জনে তাই যান–

বেচু চক্কত্তি ভাবিয়া বলিল–কখন যেতে চান কাল?

যদু বলিল–কাল সকাল যাওয়াই ভাল। বড় বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে–পালচৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায়ই। গরফেতে বাড়ী, বড় ভাল লোক। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি।

যদু চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মকে বলিল–কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমার ওভাবে যাওয়া হয় না। ও সব টের পাবেই যে আমরা আপীল করেছি, ওকেও নোটিশ দেবে কোম্পানী। আপীলের শুনানী হবে। তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায়?

–না হয় না গেলে। ওর দরকার নেই, যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই কর।

–বেশ, যা বল।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বেচু চক্কত্তি কয়লাঘাটে রেলের বড় আপিসে যাইবে বলিয়া বাহির হইল এবং সন্ধ্যার পরে পুনরায় রাণাঘাটে ফিরিল। বেচু যখন নিজের হোটেলে ঢুকিল, তখন খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। পদ্মঝি ব্যস্তভাবে

বলিল–কি হল কর্তা।

বেচু বলিল–আর কি, মিথ্যে যাতায়াত সার হল, দুটো টাকা বেরিয়ে গেল। তারা বল্লে–এ, আমাদের হাতে নেই, টেণ্ডার মঞ্জুর হয়ে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে। এখন আর আপীল খাটবে না।

–তবে যাও কাল হাজারির কাছেই যাও–

তার দরকার নেই। বাঁড়ুয্যে মশায় আসবার সময় বল্লেন–ওঁর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সামনের মাসে ওঁর ঘরেই–

পদ্মঝি বলিল–এ কিন্তু খুব ভাল কথা। ও ছোটলোকটার কাছে না গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভাল।

.

পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল।

স্টেশনের আপ, প্ল্যাটফর্মে নূতন হিন্দু-হোটেল খোলা হইল। শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক আলো, পাখা দিয়া সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি। হোটেলের মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া

অনেকে আশ্চর্য হইয়া গেল।

আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা, বেচু চক্কত্তির পুরানো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমন একটা গুজব রেলবাজারের সর্বত্র রটিল।

সেদিন বিকালের দিকে হাজারি তাহার পুরানো অভ্যাসমত চূর্ণীর ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, এমন সময় পদ্মঝিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

হাজারিই পদ্মকে ডাকিয়া বলিল–ও পদ্মদিদি, কোথায় যাচ্ছ?

পদ্মঝি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ছোট্ট পাথরের বাটি। সম্ভবত কাছেই কোথাও পদ্মঝিয়ের বাসা।

হাজারি বলিল–বাটিতে কি পদ্মদিদি?

-একটু দম্বল, দই পাতবো বলে গোয়ালাবাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

–তারপর, ভাল আছ?

–তা মন্দ নয়। তুমি ভাল আছি ঠাকুর।

এখানে কাছেই থাকো বুঝি?

এ কথার উত্তরে পদ্মঝি যাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বলিল– এস না ঠাকুর, আমার বাড়ীতে একবার এলেই না হয়–

–তা বেশ বেশ, চলো না পদ্মদিদি।

ছোট্ট বাড়ীটা, একপাশে একটা পাতকুয়া, অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোয়াল। পদ্মঝি রোয়াকটাতে একখানা মাদূর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল। হাজারি খানিকটা অস্বস্তি ও আড়ষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল। পদ্ম যে তাহার মনিব, তাহাদেরই হোটেলে সে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাজ করিয়াছে, এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায়? এমন কি, পদ্মঝিকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে, আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

পদ্মঝি বলিল–পান সাজবো খাবে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল–তা–তা বরং একটা–

পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল– তারপর, রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম। ওখানে বসাবে কাকে?

–ওখানে বসাবো ভাবছি বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন–নরেনকে মনে আছে? সেই তাকে।

–মাইনে কত দেবে?

–সে সব কথা এখনও ঠিক হয় নি। ও তো আমার এই হোটেলে খাতাপত্র রাখে, দেখাশুনো করে, বড় ভাল ছেলেটি।

–তা ভালো।

–চক্কত্তি মশায়ের শরীর ভাল আছে? ক'দিন ওদিকে আর যেতে পারি নি। হোটেল চলছে কেমন?

–হোটেল চলছে মন্দ নয়। তবে আমি কি বলচিলাম জানো ঠাকুর, কর্তামশায়কে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখো না তুমি? তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হাজারি এ প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল–কর্ত্তা কি করে থাকবেন? ওঁর নিজের হোটেল?

–সেজন্যে ভাবনা হবে না। সে আমি দেখব। কি বল তুমি?

–এখন আমি কোন কথা দিতে পারব না পদ্মদিদি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি। রেল-কোম্পানী যখন টেণ্ডার নেয়, তখন যার নাম লেখা থাকে, তার ছাড়া আর কোন লোকের অংশটংশ থাকতে দেবে না হোটেলে। হোটেল ত

আমার নয়–হোটেল রেল-কোম্পানীর।

–ঠাকুর একটা কথা বলব? তুমি এখন বড় হোটেলওয়ালা, অনেক পয়সা রোজগার কর শুনি। কিন্তু আমি তোমায় সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি। তুমি এস আমাদের হোটেলে আবার।

হাজারি বিস্ময়ের সুরে বলিল–চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে? রাঁধতে?

সে মনে মনে ভাবিল–পদ্মদিদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলে কি?

পদ্ম ঝিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিল–সত্যি বলচি ঠাকুর। এস আমাদের ওখানে আবার।

–কেন বল তো পদ্মদিদি? একথা তুললে কেন?

–তবে বলি শোন। তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জাঁকবে।

এমন ধরনের কথা হাজারি কখনও পদ্মঝিয়ের মুখে শোনে নাই। সেই পদ্মঝি আজ কি কথা বলিতেছে তাহাকে?

হাজারি গলিয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক – পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক, তাহার মুখের একথা যেন হাজারির

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই আশায় যেন সে এতদিন রাণাঘাটের রেলবাজারে এত কষ্ট করিয়াছে।

অন্য লোকে হাজার ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বেশ মূল্যবান।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে, তাহা যে হয় না একথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে! যখন সে গোপালনগরের চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে চাকুরি লইয়াছিল– তখনও উহারা যদি তাহাকে না তাড়াইয়া দিত, তবে তো নিজ হোটেল খুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না। উহাদের হোটেলে পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে–কেন তাহাকে উহারা তাড়াইল।

এখন আর হয় না।

এখন সে নিজের মালিক নয়, কুসুমের টাকা ও অতসীমা'র টাকা হোটেলে খাটিতেছে, তাহার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অনেকগুলি প্রাণীর উন্নতি-অবনতি জড়ানো। নিজের খেয়াল খুশিতে যা-তা করা এখন আর চলিবে না।

টেঁপির ভবিষৎ দেখিতে হইবে–টেঁপি আর নরেন।

অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে–আর এখন পিছানো চলে না।

হাজারি পদ্মঝিয়ের মুখের দিকে দুঃখ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল–

–আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি। কিন্তু এখন যাওয়া হয় কি করে তুমিই বল।

পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয়, সে নিতান্ত মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। হাজারির কথার সে কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা কাপড়-জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল–পড়তে চান তো, পড়ে দেখ না?

হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয়, তবে ও কাজে সে খুব পারদর্শী নয়। তবু পদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে সে ভাল পড়িতে পারে না! পুঁটুলি খুলিয়া সে দেখিল খান কয়েক কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নাই।

পদ্মঝি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে নিজেই বলিল–ক-খানা হ্যাণ্ডনোট, তা সবসুদ্ধ সাতশ টাকার হ্যাণ্ডনোট। কর্তাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছে তখন। নিজের হাতের চুড়ি বিক্রি করি, কানের মাকড়ি বিক্রি করি–ছিল তো সব, যখন এইস্তিরি ছিলাম, দুখানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে।

হাজারি বিস্মিত হইয়া বলিল–তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি?

–দেই নি তো কার টাকায় হোটেল চলছিল এতদিন? যা কিছু ছিল সব ওর

পেছনে খুইয়েছি।

–কিছু টাকা পাও নি?

–পেটে খেয়েছি আমি, আমার বোনঝি, আমার এক দেওর-পো এই পর্যন্ত। পয়সা যে একেবারে পাই নি তা নয়–তবে কত আর হবে তা? বোনঝির বিয়েতে কর্তা-মশায় একশ টাকা দিয়েছিলেন–সে আজ সাত বছরের আগের কথা। সাতশ টাকার সুদ ধর কত হয়?

–টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে?

–আজ ন-বছরের ওপর হ'ল। ওই একশ টাকা ছাড়া একটা পয়সা পাই নি--কর্তা মশায় কেবলই বলে আসছেন একটু অবস্থা ভাল হোক হোটেলের–সব হবে, দেব।

–ওঁকে আগে থেকে জানতে নাকি, না রাণাঘাটে আলাপ?

–সে-সব অনেক কথা ঠাকুর। উনি আমাদের গাঁ ফুলে-নবলার চক্কত্তিদের বাড়ীর ছেলে। ওর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্কত্তি–বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। অবস্থাও ভাল ছিল তার–আমাদের কর্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে। লেখাপড়া তেমন শেখেন নি, বললেন রাণাঘাটে গিয়ে হোটেল করব, পদ্ম কিছু টাকা দিতে পার? দিলাম টাকা। সে আজ হয়ে গেল–

হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্ন পদ্মদিদিকে না করাই ভাল। গ্রামে এত লোক থাকিতে তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে তাহার কাছেই টাকা চাহিল কেন, সেই বা টাকা দিল কেন, রাণাঘাটে বেচুর হোটেলে তাহার ঝি-গিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ব হইতেই অবলম্বিত ব্যবস্থার ফল–এসব কথা হাজারি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না।

কিন্তু হাজারির বয়স হইয়াছে, জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয়, সে এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করিয়া বলিল–হ্যাণ্ডনোটগুলো তুলে রেখে দাও পদ্মদিদি ভাল করে। সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকাও তোমার হয়ে যাবে–এগুলো রেখে দাও।

পদ্ম ঝি রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল–ও সব তুলে রেখে কি করব ঠাকুর? ও সব কোন কালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে। পড়ে দেখ না ঠাকুর–

হাজারি অপ্রতিভ হইয়া শুধু বলিল–ও!

–যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর, সব হোটেলের পেছনে দিয়েছি–আর কি আছে এখন হাতে, ছাই বলতে রাইও না।

শেষের কথাগুলি পদ্মঝি যেন আপন মনেই বলিল, বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নহে। হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পদ্মঝির এমন অবস্থা সে কখনও দেখে নাই–ভিতরের কথা সে জানিত না, মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পদ্মদিদির

উপর।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল, সে কিছুই যখন করিতে পারিবে না আপাতত–তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি?...

বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটি অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল।

বাহিরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেঁপির গলা। সে বলিতেছে–নরেনদা, চা না খেয়ে কিছুতেই আপনি এখন যেতে পারবেন না। বসুন।

নরেন বলিতেছে–না, এবার হোটেলে যেতে হবে, তুমি বোঝ না আশা, ইষ্টিশানের হোটেল এখন তো বন্ধ–কিন্তু মামাবাবু আসবার আগে এ-হোটেলের সব দেখাশুনো আমার করতে হবে।

টেঁপির ভাল নাম যে আশালতা, হাজারি নিজেই তা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে–নরেন ইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল!

টেঁপি পুনরায় আবদারের সুরে বলিল–না ওসব কাজটাজ থাকুক, আপনি আমাকে আর মাকে টকি দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন–আজ নিয়ে যেতেই হবে।

–কি আছে আজ?

–আনব? একখানা টকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে। ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি করে যাচ্ছিল ওবেলা, খোকা একখানা এনেছে–

–যাও চট করে গিয়ে নিয়ে এস।

হাজারির ইচ্ছা ছিল না উহাদের কথাবার্তায় সে বাধা দেয়। এমন কি সে একপ্রকার নিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি টেঁপি টকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পড়িয়া গেল।

টেঁপি পাছে কোনপ্রকার লজ্জা পায়–এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল–এই যে টেঁপি। তোর মা কোথায়?

টেঁপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া গেল। মুখে বলিল–কে, বাবা! কখন এলে? টের পাই নি তো?

হাজারির কিন্তু মনে হইল টেঁপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই। যেন ভাবিতেছে, আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত।

হাজারি বুকের ভিতটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। মেয়েসন্তান, আহা বেচারী! সব কথা কি ওরা গুছিয়ে বলতে পারে, না নিজেরাই বুঝিতে পারে?

টেঁপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি?

হাজারি বলিল–আমি এখুনি হোটেলে বেরিয়ে যাব টেঁপি। বেলা পাঁচটা বেজে গিয়েছে, আর থাকলে চলবে না। এক গ্লাস জল বরং আমায় দে–

ওঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল–মামাবাবু কখন এলেন?

হাজারি যেন পূর্বে নরেনের কথাবার্তা শুনতে পায় নাই বা এখানে নরেন উপস্থিত আছে বিষয়ে কিছু জানিত না, এমন ভাব দেখাইয়া বলিল–কে নরেন? কখন এলে বাবাজী?

–অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু–চলুন, আমিও হোটেলে বেরিয়েছি—

বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হানারি বলিল–একটু জলটল খেয়ে যাও না? হোটেলে এখন ধোঁয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি? বস বস বরং। টেঁপি তোর নরেনদা’র জন্য একটু চা–

–না না থাক মামাবাবু, হোটেলে তো চা এমনিই হবে এখন।

–তা হোক, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন এখান থেকেই চা খেয়ে যাও।

বলিয়া হাজারি বাড়ীর মধ্যের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। টেঁপির মা তখনও রান্নাঘয়ের দাওয়ায় একখানা মাদুর বিছাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল। বেচারী চিরকাল খাটিয়াই মরিয়াছে এঁড়োশোলা গ্রামে–এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয় তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

হাজারি স্ত্রীকেও আগাইল না। সবাই মিলিয়া বড় কষ্ট করিয়াছে চিরকাল, এখন সুখের মুখ যখন দেখিতেছে–তখন সে তাহাতে বাদ সাধিবে না। টেঁপির মা ঘুমাইয়া থাকুক।

.

বাড়ীর বাহির হইতে যাইতেছে, নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাজুক সুরে বলিল–মামাবাবু–এই গিয়ে আশা বলচিল–মামীমাকে নিয়ে আর ওকে নিয়ে একবার টকি দেখিয়ে আনার কথা–তা আপনি কি বলেন?

টেঁপিই যে একথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে, এ-বিষয়ে হাজারির সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। ছেলেমানুষ সব, উহারা কি করে না-করে বয়োবৃদ্ধ লোকে সব বুঝিতে পারে, অথচ বেচারীরা ভাবে তাহাদের মনের খবর কেহ কিছু রাখে না।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল–তা যাবে যাও না! আজই যাবে? পয়সা-কড়ি সব তোমার মামীমার কাছে আছে, চেয়ে নাও! কখন ফিরবে?

–রাত আটটা হবে মামাবাবু–আপনি নিজে ইষ্টিশানে যদি গিয়ে বসেন একটু–

–আচ্ছা তাহোক, ইষ্টিশানে আমি যাব এখন, সে তুমি ভেবো না। তুমি ওদের নিয়ে যাও–ও টেঁপি, ডেকে দে তোর মাকে। অবেলায় পড়ে ঘুমুচ্চে, ডেকে দে। যাস যদি তবে সব তৈরি হয়ে নে–

হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। বালকবালিকাদের আমোদের পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চায় না। প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া এবেলার রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাটফর্মের হোটেলে। এখানে সে বড় একটা বসে না। নরেনই এখানকার ম্যানেজার। এ সব সাহেবী ধরনের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চাটগাঁ মেল আসিবার বেশী বিলম্ব নাই–বনগ্রামের গাড়ীও এখনি ছাড়িবে। এই সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ, ঢাকা মেল, নর্থ বেল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরের ট্রেনগুলির ভিড়। যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু, অনেকেই খায়। হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা।

স্টেশনের হোটেলে দুজন নূতন লোক রান্না করে। এখানে বেশীর ভাগ লোকে চায় ভাত আর মাংস–সেজন্য ভাল মাংস রান্না করিতে পারে এরূপ লোক বেশী বেতন দিয়া রাখিতে হইতেছে। পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর–এক-

একদিন ভিড় এত বেশী হয় যে, ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাইতে হয়।

হাজারিকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্যেরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব, নরেন ম্যানেজার মাত্র। তাহারা ইহাও ভাল জানিয়াছে যে হাজারির পদতলে বসিয়া তাহারা এখন দশ বৎসর রান্না-কাজ শিখতে পারে–সুতরাং হাজারিকে শুধু তাহারা যে মনিব বলিয়া সমীহ করে তাহা নয়, ওস্তাদ কারিগর বলিয়া শ্রদ্ধা করে।

একজন রাঁধুনীর নাম সতীশ দীঘড়ি। বাড়ী হুগলী জেলার কোনো পাড়াগাঁয়ে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খুব ভাল রান্নার কাজ জানে, পূর্বে ভাল ভাল হোটেলে মোটা মাহিনায় কাজ করিয়াছে–এমন কি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত গিয়াছিল–সেখানে এক শিখ হোটেলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছে। সতীশ নিজে ভাল রাঁধুনী বলিয়া হাজারির মর্ম খুব ভাল করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে।

হাজারি তাহাকে বলিল–কি দীঘড়ি মশাই, রান্না সব তৈরী হোল?

সতীশ বিনীত সুর বলিল–একবার দয়া করে আসুন কর্তা, মাংসটা একবার দেখুন না? .

–ও আমি আর কি দেখব, আপনি যেখানে রয়েছেন–

–অমন কথা বলবেন না কর্ত্তা, অন্য কেউ আপনাকে বোঝে না-বোঝে আমি তো আপনাকে জানি–এসে একবার দেখিয়ে যান–

হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ার মাংসের রং দেখিয়া বলিল–রং এরকম কেন দীঘড়ি মশায়?-

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাঁধুনীকে বলিল–বলেছিলাম না কার্তিক? কর্তা চোখে দেখলেই ধরে ফেলবেন? কুঁদের মুখে বাঁক থাকে কখনো? কর্তা যদি কিছু মনে না করেন, কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ।

হাজারি হাসিয়া বলিল–পরীক্ষা দিতে হবে দীঘড়ি মশাই আবার এ বয়সে? লঙ্কার বাটনা হয় নি–পুরনো লঙ্কা, তাতেই রং হয় নি। রং হবে শুধু লঙ্কার গুণে।

–কর্তা মশাই, সাধে কি আপনার পায়ের ধূলো মাথায় নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন।

হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের কড়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল–কষামাংসে যে গরম জল ঢেলেছিলেন, তা ভাল ফোটে নি। সেই জন্যে প্যাঁজা উঠেছে। এতে মাংস জঠুর হয়ে যাবে।

সতীশ অন্য পাচকের দিকে চাহিয়া বলিল–শোন কার্তিক, শোন। আমি বলচিলাম না তোমায় জল ঢালবার সময় যে এতে প্যাঁজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না?

আর কর্তা মশায় না দেখে কি করে বুঝে ফেলেচেন দ্যাখ। ওস্তাদ বটে আপনি কর্তা।

হাজারি হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বেশ ভালো ঘর। বিজলী আলো জ্বলিতেছে। মার্বেল পাথরের টেবিলে বাবু খরিদ্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া। ভীষণ ভীড় খরিদ্দারের–ওদিকে বনগাঁ লাইনের ট্রেনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, পয়সা গুনিয়া কুল করা যায় না–এই তো জীবন। বেচু চক্কত্তির হোটেলের ঘরে বসিয়া হাতাবেড়ি নাড়িতে নাড়িতে এই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনও সাহস করে নাই। এত সুখও তার অদৃষ্টে ছিল! পদ্মদিদির কত অপমান আজ সার্থক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিত কর্ম্মব্যস্ত হোটেল-জীবনের মধ্যে। আজ কাহারও প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ নাই। হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাঁটাপথে গোপালনগরে যাইবার সময় সেই ছোট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ীর বধুটির কথা। হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায়ে খাটাইয়া দিবে। সে কাল যাইবে। গরীব মেয়েটির টাকা খাটাইবার এই ভাল ক্ষেত্র। বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিল হাজারির দুঃসময়ে–সুসময়ে সেই সরল মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে। নতুবা ধর্ম্ম থাকে না।

পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল। চাকদা স্টেশন পর্যন্ত অবশ্য

ট্রেনে আসিল–বাকী পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল।

সেই রকম বড় বড় তেঁতুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিনমানেই এ পথে অন্ধকার। হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়াছিল, তখন রাণাঘাট হোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে–হাতে পয়সা নাই, পথ হাঁটিয়া এই পথে সে চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। আর আজ?

আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় হোটেলের মালিক। তার অধীনে দশ-বারো জন লোক খাটে। যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি, হাজারির সাধ্য নাই তাহার বিন্দুমাত্র প্রত্যুপকার সে করে–অতসী-মা বড়মানুষের মেয়ে, তার উপর সে বিবাহিতা–হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে?

কিন্তু তাহার বদলে যে দুটি-একটি সরলা দরিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নতুন পাড়ার গোয়ালা-বউটি ইহাদের মধ্যে একজন। নতুন পাড়া পৌঁছিতে বেলা প্রায় ন'টা বাজিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় কাহাদের একখানা গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে, তাহার উপর আসিয়া বসিল। সর্বাঙ্গে ঘাম, এক হাঁটু ধূলা–একটু জিয়াইয়া লইয়া ঘাম মরিলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকাই যুক্তিসঙ্গত।

একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পথিক যশোরের দিক হইতে আসিতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া

সে কাছে গিয়া বলিল–দেশলাই আছে?

–আছে, বসুন।

–আপনারা?

–ব্রাহ্মণ।

–প্রণাম হই, একটু পায়ের ধূলো দেন ঠাকুরমশাই।

লোকটির নাম কৃষ্ণলাল, জাতিতে শাঁখারি, বাড়ী পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে। কথাবার্তায় বেশ টান আছে পূর্ববঙ্গের। বনগ্রামে ইছামতীর ঘাটে তাহাদের শাঁখার বড় ভড় নোঙর করিয়া আছে, কৃষ্ণলাল পায়ে হাঁটিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কাজের লোক বেশীক্ষণ বসে না। একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পূর্বেই কৃষ্ণলাল উঠিতে চাহিল। হাজারি কথাবার্তায় তাহাকে বসাইয়া রাখিল। বনগাঁ হইতে সতেরো মাইল পথ হাঁটিয়া ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে যে লোক, তাহার উপর অসীম শ্রদ্ধা হইল হাজারির। ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে।

সে বলিল –গাঁজাটাজা চলে? আমার কাছে আছে—

কৃষ্ণলাল একগাল হাসিয়া বলিল–তা ঠাকুরমশায়–পেরসাদ যদি দেন দয়া করে– তবে তো ভাগ্যি।

–বোসো তবে, এক ছিলিম সাজি।

হাজারি খুব বেশী যে গাঁজা খায়, তা নয়। তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক-আধ ছিলিম খাইয়া থাকে। আজকাল রাণাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই, হোটেলের সকলে খাতির করে, তাহার উপর নরেন আছে–এই সব কারণে হোটেলে ও ব্যাপার চলে না–বাসায় তো নয়ই, সেখানে টেঁপি আছে। আবার যাহার তাহার সঙ্গেও গাঁজা খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে মান থাকে না। আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি হৃষ্টমনে ভাল করিয়া ছিলিম সাজিল। কলিকাটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল– বাপরে, আপনারা দেবতা। পেরসাদ করে দিন আগে–

কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল। কৃষ্ণলাল খুশি হইল, সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে না–নিজের চেষ্টায় যে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোলেটের মালিক, তাহার সহিত বসিয়া গাঁজা খাওয়া যায় বটে।

হাজারি বলিল–রাণাঘাটে তো যাবে, আমার হোটেলেই উঠো। রেলবাজারে আমার নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে। পয়সা দিও না কিন্তু, আমি সই দিয়ে দিচ্ছি– তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণলাল পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল–আজ্ঞে ওইটি মাপ করতে হবে কর্তা। আপনার হোটেলেই উঠবো–কিন্তু বিনি পয়সায় খেতে পারব না। ব্যবসার নিয়ম তা নয়, নেয্য নেবে, নেয্য দেবে। এ না হলে ব্যবসা চলে না। ও হুকুম করবেন না ঠাকুরমশায়।

–বেশ, তা যা ভাল বোঝো।

কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

.

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। শ্রীচরণ ঘোষ বাড়ীতেই ছিল, হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই। এসব স্থানে কালেভদ্রে লোকজন আসে–কাজেই মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন।

বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল বলেছিলেন যে দু-মাসের মধ্যে আসবেন খুড়োমশায়? দু-বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে! মনে পড়ল এতদিন পরে মেয়ে বলে?

–তা তো পড়লো মা। এস সাবিত্রীসমান হও মা, বেশ ভাল আছ?

–আপনি যেরকম রেখেছেন। আপনাদের বাড়ীর সব ভাল খুড়োমশায়?

–তা এখন একরকম ভাল।

–কুসুমদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছে?

–হ্যাঁ, ভাল আছে।

–আমার কথা বলেছিলেন?

হাজারি বিপদে পড়িল। ইহার এখান হইতে সেবার সেই যাইবার পরে গোপালনগরে চাকুরি করিল অনেক দিন, তারপর কতদিন পরে রাণাঘাটে গিয়া কুসুমের সহিত দেখা ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল?

–ইয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কিনা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় সব কথা মনে পড়ে না ছাই। বুড়োও তো হয়েছি মা–

–আহা বুড়ো হয়েছেন না আরও কিছু। আমার পিসেমশায়ের চেয়ে আপনি তো কত ছোট।

–কে গঙ্গাধর? হ্যাঁ, তা গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্ততঃ ষোল-সতেরো বছরের বড়।

–বসুন খুড়োমশায়, আমি আপনার হাত-পা ধোয়ার জল আনি–

শ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল–আপনি তো দাঠাকুর বউমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক–সব শুনেচি আমরা সেবার আপনি চলে গেলে। বউমা সব পরিচয় দেলেন।

হাজারি বলিল–সে বউটির বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক নয়, তবে তাহার পিসিমার শ্বশুরবাড়ী গ্রামের লোক বটে এবং বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহুদিন হইতে জানাশোনা আছে বটে।

শ্রীচরণ বলিল–দাঠাকুর আমরা ছোট জাত, বলতে সাহস হয় না–যখন এবার পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন দু-চার দিন এখানে এবার থাকুন না কেন? বউমারও বড্ড সাধ আপনি দুদিন থাকেন, আমায় বলতি বলেচে আপনাকে।

হাজারি এখানে কুটুম্বিতার নিমন্ত্রণ খাইতে আসে নাই, এমন কি আজ ওবেলা রওনা হইতে পারিলেই ভাল হয়। দুটি বড় হোটেলের কাজ, সে না থাকিলে সব বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে–হাজার কাজ বুঝিলেও নরেন এখনও ছেলেমানুষ। তাহার উপর দুই হোটেলের ক্যাশের দায়িত্ব রাখা ঠিক নয়।

রান্না করিবার সময় বউটিও ঠিক ওই অনুরোধ করিল। এখন দুদিন থাকিয়া যাইতে হইবে, যাইবার তাড়াতাড়ি কিসের? সেবার ভাল করিয়া সেবাযত্ন না করিতে পারিয়া উহাদের মনে কষ্ট আছে, এবার তাহা হইতে দিবে না।

হাজারি হাসিয়া বলিল–মা, সেবার দুদিন থাকলে কোনো ক্ষেতি ছিল না–কিন্তু এবার তা আর ইচ্ছে করলেও হবার জো নেই।

হাজারির কথা ভাবে বউটি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল–কেন খুড়োমশায়? এবার থাকতে পারবেন না কেন? কি হয়েছে?

–সেবার চাকুরি ছিল না বলেছিলাম মনে আছে?

–এবার চাকুরি হয়েছে, তা বুঝতে পেরেচি। ভালই তো–ভগবান ভালই করেছেন। কোথায় খুড়োমশায়?

–গোপালনগরে।

–ও! তাই এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্চেন বুঝি?

–ঠিক বুঝেচ মা। মায়ের আমার বড্ড বুদ্ধি!

বধুটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল–আহা, এর মধ্যে আবার বুদ্ধির কথা কি আছে খুড়োমশায়?

–বেশ, কিন্তু তুমি বঁটি দেখে কোটো মা। আঙুল কেটে ফেলবে। ঝিঙেগুলো ধুয়ে

ফেল এবার–

–গোপালনগরের কোথায় চাকুরি করচেন খুড়োমশায়?

–কুণ্ডুদের বাড়ী।

–খুব বড়লোক বুঝি?

–নিশ্চয়ই। নইলে রাঁধুনী রাখে কখনো পাড়াগাঁয়ে? খুব বড়লোক।

–ওদের বাড়ী পুজো হয় খুড়োমশায়?

–খুব জাঁকের পুজো হয়। মস্ত প্রতিমে। যাত্রা, পাঁচালি–

আমায় নিয়ে দেখিয়ে আনবেন এবার পুজোর সময়? আপনার কোনো হাংনামা পোয়াতে হবে না। আমাদের বাড়ীর গরুর গাড়ী আছে, তাতে উঠে বাপে-ঝিয়ে যাবো। আবার তার পরদিন দেখেশুনে ফিরবো। কেমন?

–বেশ তো।

–নিয়ে যাবেন তাহলে, কথা রইল কিন্তু। আমি কখনো কোনো জায়গায় যাই নি খুড়োমশায়, বাপের বাড়ীর গাঁ আর শ্বশুরবাড়ীর গাঁ–হয়ে গেল। আমার বড্ড

কোনো জায়গায় যেতে দেখতে ইচ্ছে করে। তা কে নিয়ে যাচ্ছে?

হাজারির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। মেয়েটিকে একটু শহর-বাজারের মুখ তাহাকে দেখাইতেই হইবে। সে বুঝাইয়া বলিল, তাহার দ্বারা যাহা হইবার তাহা সে করিবেই। পাকা কথা থাকিল।

একবার তামাক খাইয়া লইয়া বলিল–মা, সেই টাকার কথা মনে আছে?

–হ্যাঁ খুড়োমশায়। টাকা আপনার দরকার?

–কত দিতে পারবে?

–তখন ছিল আশি টাকা–এই দু-বছরে আর গোটা কুড়ি হয়েছে।

বধুটি লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া বলিল–আপনার জামাই লোক ভাল। গত সন তামাক পুঁতে দু-পয়সা লাভ করেছিল, আমায় তা থেকে কুড়িটা টাকা এনে দিয়ে বললে, ছোট বৌ রেখে দাও। এ তোমার রইল।

–বেশ, টাকাটা আমায় দিয়ে দাও সবটা।

–নিয়ে যান। আমি তো বলেছিলামই সেবার –

–ভাল মনে দিচ্ছ তো মা?

বধু জিভ কাটিয়া বলিল–অমন কথা বলবেন না খুড়োমশায়, আপনি আমার বাপের বয়সী ব্রাহ্মণ দেবতা–দুটো কানা কড়ি আপনার হাতে দিয়ে অবিশ্বাস করব, এমন মতি যেন ভগবান না দেন।

মেয়েটির সরল বিশ্বাসে হাজারির চোখে জল আসিল। বলিল–বেশ, তাই দিও। সুদ কি রকম নেবে?

— যা আপনি দেবেন। আমাদের গাঁয়ে টাকায় দু-পয়সা রেট—

–তাই পাবে আমার কাছে।

হাজারি খাইতে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছিল মাত্র এক শত টাকার মূলধনে মেয়েটিকে সে এমন কিছু বেশী লাভের অংশ দিতে পারিবে না তো। অংশীদার সে করিয়া লইবে তাহাকে নিশ্চয়ই–কিন্তু এক শত টাকায় কত আর বার্ষিক লভ্যাংশ পড়িবে। হাজারির ইচ্ছা মেয়েটিকে সে আরও কিছু বেশী করিয়া দেয়। রেলওয়ে হোটেলের অংশে যে অন্য কাহারও নাম থাকিবার উপায় নাই–নতুবা ওখানকার আয় বেশ হইত বাজারের হোটেলের চেয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হাজারি রওনা হইল–যাইবার পূর্বে বৌটি হাজারির নিকট এক শত টাকা গুণিয়া দিল। হাজারি রাণাঘাট হইতেই

একখানা হ্যাণ্ডনোট একেবারে টিকিট মারিয়া আনিয়াছিল, কেবল টাকার অঙ্কটি বসাইয়া নাম সই করিয়া দিল। হাজারির অত্যন্ত মায়া হইল মেয়েটির উপর। যাইবার সময় সে বার বার বলিস–এবার যখন আসবো, শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু মনে থাকে যেন মা।

–গোপালনগর?

–যেখানে বল তুমি।

–আবার কবে আসবেন?

–দেখি, এবার হয়তো বেশী দেরি হবে না।

.

এখান হইতে নিকটেই বেলের বাজার–ক্রোশ দুয়ের মধ্যে। হাজারির অত্যন্ত ইচ্ছা হইল বেলের বাজারে সেবার যে মুদীর দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার সহিত একবার দেখা করে। জ্যোৎস্না রাত আছে, শেষ রাত্রের দিকে বেলের বাজার হইতে বাহির হইলেও বেলা আটটার মধ্যে রাণাঘাট পৌঁছানো যাইবে।

বেলের বাজারের মুদী হাজারিকে দেখিয়া চিনিল। খুব যত্ন করিয়া থাকিবার জায়গা করিয়া দিল। তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল ফিরাইয়া হাজারির হাতে দিয়া

বলিল– ইচ্ছে করুন, ঠাকুরমশায়। তা এখন আপনার কি করা হয়? সে তো চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন–

–হ্যাঁ সেবার তো চাকুরি পেয়েওছিলাম–গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী।

–ও। তা বেশ বেশ। গোপালনগরের কুণ্ডুবাবুরা এদিগরের মধ্যে নাম-করা বড়লোক। লোকও তেনারা শুনিচি বড় ভাল। কত মাইনে দেয় ঠাকুরমশাই?

–তা দিত দশ টাকা আর খাওয়া-পরা।

–ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি? এখন গোপালনগরেই যাবেন তো?

–না, আমি আর সেখানে নেই।

মুদী দুঃখিত স্বরে বলিল–আহা! সে চাকুরি নেই? তবে এখন কি–

হাজারি বসিয়া বসিয়া তাহার হোটেলের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। দোকানী পাকা ব্যবসাদার; ইহার কাছে এ গল্প করিয়া সুখ আছে, ব্যবসা কাহাকে বলে এ বোঝে।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজিল। হাজারির গল্প শুনিয়া মুদী তাহাকে অন্য চোখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সম্ভ্রমের সহিত বলিল–ঠাকুরমশাই, রাত হয়েছে,

রসুয়ের যোগাড় করে দিই। তবে একটা কথা, আমার দোকানের জিনিসপত্তরের দাম এক পয়সা দিতে পারবেন না–

–সে কি কথা!

–না ঠাকুরমশায়, এখন তো পথ-চলতি খদ্দের নন, আমারই মত ব্যবসাদার, বন্ধু লোক। আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, আমার যা জোটে, দুটি বিদুরের খুদ খেয়ে যান। আবার রাণাঘাটে যখন আপনার হোটেলে যাব, তখন আপনি আমায় খাওয়াবেন।

হাজারি জানে এ অঞ্চলের এই রকমই নিয়ম বটে। ব্যবসাদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এই সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে আছে। রাণাঘাটের মত শহর জায়গায় রেষারেষির আবহাওয়ায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে দোকানী বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল। ঘি ময়দা আনিয়া দিল, লুচি ভাজিয়া খাইতে হইবে, হাজারির কোনো আপত্তিই টিকিল না। ছোট একটা রুই মাছ কোথা হইতে আনিয়া হাজির করিল। টাটকা পটল, বেগুন, প্রায় আধ সের ঘন দুধ, বেলের বাজারের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা সন্দেশ।

হাজারি দস্তুরমত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। এমন জানিলে সে এখানে আসিত না। মিছামিছি বেচারীর দণ্ড করা, অথচ সে-কথা বলিতে গেলে লোকটি

মহা দুঃখিত হইবে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ আতিথেয়তা শহর-বাজারে হাজারির চোখে পড়ে নাই–এই সব পল্লী-অঞ্চলেই এখনও ইহা আছে, হয়তো দু-দশ বছর পরে আর থাকিবে না।

পরদিন সকালে হাজারি দোকানীর নিকট বিদায় লইল বটে, কিন্তু রাণাঘাট না আসিয়া হাঁটাপথে গোপালনগর চলিল। তাহার পুরানো মনিব-বাড়ী, সেখানে তাহার একটা কাপড়ের পুঁটুলি আজও পড়িয়া আছে–আনি আনি করিয়া আনা আর হইয়া উঠে নাই।

.

পথে বেলা চড়িল।

পথের ধারে বনজঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটি দেখিয়া হাজারির মনে পড়িল ইহারই কাছে শ্রীনগর সিমলে গ্রাম।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেবার যাহার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া ছিল, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে যাইবে। অনেক দিন পরে যখন এ পথে আসিয়াছে, তখন তাঁহার সংবাদ লওয়াটা দরকার বটে।

বিহারী বাঁড়ুয্যে মশায় বাড়ীতেই ছিলেন। এই দুই বৎসরে চেহারা তাঁহার আরও ম্যালেরিয়াশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সম্মুখের দু-

একটি দাঁত পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যে মশায় হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, গ্রাম্য আতিথেয়তার কোনো ক্রুটি হইল না–তখনই হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং এ-বেলা অন্তত থাকিয়া আহার না করিয়া তাহার যে যাইবার উপায় নাই এ-কথাটিও হাজারিকে জানাইয়া দিলেন। বাড়ীর সম্মুখস্থ নারিকেল গাছে ডাব পাড়িবার জন্য তখনই লোক উঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

গ্রামে তখনই তোক ছিল না তত, এ দু-বছরে যেন আরও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাড়ীর উত্তর দিকের বাঁশবনের ওপারে সেবার একধর গৃহস্থ ছিল, হাজারির মনে আছে–এবার সেখানে ভিটা পড়িয়া আছে। বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন–কে, ও দুলাল তো? না ওদের আর কেউ নেই। দুলাল আর তার ভাই নেপাল এক কার্তিক মাসে মারা গেল–দুলালের বৌ বাপের বাড়ী চলে গেল, ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরে, আর নেপাল তো বিয়েই করে নি। কাজেই ভিটে সমভূম হয়ে গেল। আর গাঁ সুদ্ধ হয়েছে এই দশা। তা আপনি আসবেন বলেছিলেন আসুন না? ঐ দুলালের ভিটেতে ঘর তুলুন কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারের জমি দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের গায়ে এখন লোকের দরকার–আপনি আসুন খুব ভাল ধানের জমি দেবো আপনাকে আর আম কাঁঠালের বাগান। কত চান? বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ঘোর জঙ্গল হয়ে পূর্ব পাড়ায়। লোক নেই মশায়, কে ভোগ করবে আম-কাঁঠালের বাগান। আপনি আসুন, চারখানা বড় বড় বাগান আপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গাঁয়ের মত খাদ্যসুখ কোথাও পাবেন না, আর এত সস্তা! দুধ বলুন, ফলফুলুরি বলুন, মাছ বলুন–সব সস্তা।

হাজারি ভাবিল, জিনিস সস্তা না হইয়া উপায় কি? কিনিবার লোক কে আছে। একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিল–গাঁয়ে লোক নেই তো জিনিসপত্তর তৈরী করে কে? এই তরি-তরকারি দুধ?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন–ওই যে–আপনি বুঝতে পারলেন না। ভদ্দরলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষালোকের বাড়বাড়ন্ত খুব। সিমলে গায়ের বাইরে মাঠের মধ্যে দেখবেন একশো ঘর চাষী কাওরী আর বুনোর বাসা। ওদের মধ্যে মশায় ম্যালেরিয়া নেই, যত রোগ বালাই সব কি এই ভদ্রলোকের পাড়ায় মশায়? পাড়াকে পাড়া উজোড় করে দিলে একেবারে রোগে!

বিহারী বাঁড়ুয্যের চারিটি ছেলে, বড় ছেলেটির বছরখানেক হইল বিবাহ দিয়াছেন, বলিলেন। সে ছেলেটির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর তিন বছর এভাবে যদি ছেলেটি কাটায় তবে বাঁড়ুয্যে মশায়ের পুত্রবধুকে কপালে সিঁদুর এবং হাতের নোয়ার মায়া কাটাইতেই হইবে।

কিন্তু সে ছেলেটির বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই, জমিজমা, চাষ-আবাদের সমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয়–বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় একরূপ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বড় ছেলেটিই একমাত্র ভরসা। তাহার উপর ছেলেটি লেখাপড়া এমন কিছু জানে না যে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠাশালা পর্য্যন্ত–শুধু তাহার কেন, অন্য ছেলেগুলিরও তাই।

তবুও হাজারি বলিল–বাঁড়ুয্যেমশায় একটা কথা বলি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আপনার একটি ছেলেকে আমি রাণাঘাটে নিয়ে গিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি–ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে—

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন--ভাত-বেচা হোটেলে? না, মাপ করবেন। ও-সব আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের বংশে ও-সব কখনো–ও কাজ আমাদের নয়।

হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীনগর সিমলে হইতে বাহির হইয়া যখন সে আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখন সেবারকারের মতই সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন নিরুপদ্রব নিশ্চিত সুখ মৃত্যুর সামিল–ও সুখ তাহার সহ্য হইবে না।

গোপালনগরে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিল।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী পৌঁছিতেই হাজারি যথেষ্ট খাতির পাইল। কুণ্ডুদের বড়কর্তা খুশি হইয়া বলিলেন–আরে, হাজারি ঠাকুর যে, কোথায় ছিলেন এতদিন? আসুন–আসুন।

বাড়ীর মেয়েরাও খুশি হইল। হাজারি ঠাকুরের রান্না সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আজও তাহারা বলাবলি করে। লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ীর লোকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ইহারা হাজারির পুরানোমনিব সুতরাং সে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে

ত্রুটি করিল না। বড়বাবুর স্ত্রী বলিলেন–ঠাকুরমশায়, দু-দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন, আর দু-বছর দেখা নেই, ব্যাপার কি বলুন তো? মাইনে বাকী তাও নিলেন না। হয়েছিল কি?

ইহারা ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে, রসুইয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সম্মান প্রদর্শনের কার্পণ্য নাই। মেজকর্তার মেয়ে নির্মলার সেবার বিবাহ হইয়াছিল–সে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার সময়েই হাজারি উহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। নির্মলা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছে, সে হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–বেশ আপনি, শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই। উনি সেই বিয়ের পরদিন আপনার হাতের রান্না খেয়ে গেছলেন, আমায় বললেন–তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভাল। ওর হাতের রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না, ওমা, এসে দেখি কোথায় কে!–কোথায় ছিলেন এতদিন? সেই রকম মাংস রাঁধুন তো একদিন। এখন থাকবেন তো আমাদের বাড়ী?

হাজারির কষ্ট হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে। তবুও বলিতে হইল। নির্মলাকে বলিল–তোমায় আমি মাংস রেঁধে খাইয়ে যাব মা, দু-দিন তোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই করে খাওয়াব, তারপর যাব।

বড়কর্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন–রাণাঘাটের প্ল্যাটফর্মের সে নতুন হোটেল আপনার? বেশ, বেশ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকরি করে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে

যে কোন ব্যবসাই হোক। আপনি ভাল রাঁধেন, ওই হোটেলের ব্যবসাই আপনার ঠিকমত ব্যবসা–যেটা যে বোঝে বা জানে। উন্নতি করবেন আপনি।

আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে এক জোড়া ধুতি উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন যাহা বাকী ছিল সব চুকাইয়া দিল। হাজারি বেতন সইতে আসে নাই, কিন্তু উহা তাহার বলা সাজে না। সম্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপালনগর হইতে বিদায় লইল।

.

রাণাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল–কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু? বাড়ীসুদ্ধ সব ভেবে খুন। কাল রেলওয়ে ইন্সপেক্টর এসেছিল, আমাদের হোটেল দেখে খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভাল লিখেছে।

–টেঁপি ভাল আছে?

–হ্যাঁ, কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু। মামীমা, আমি আর আশালতা। মামীমা টকি দেখে খুব খুশি।

টেঁপির কথাটা সে মামীমার উপর দিয়াই চালাইয়া দিল।

–আর একটা কথা মামাবাবু–

–কাল পদ্মঝি এসে আপনাদের বাসায় মামীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল। আর কুসুমদিদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছে। উনিও কাল এসেছিলেন।

হাজারি বাড়ী ঢুকিতেই টেঁপি ওরফে আশালতা এবং তাহার মা দুজনেই টকির গল্পে মুখর হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম, তাহারা কখনও ও-জিনিসের কল্পনাই করে নাই–আবার একদিন দেখিতেই হইবে–এইবার কিন্তু টেঁপি বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না। কাজ তো সব সময়েই আছে, একদিনও কি সময় করিয়া যাইতে নাই?

–কি গান গাইলে! চমৎকার গান, বাবা। আমি দুটো শিখে ফেলেছি।

–কি গান রে?

–একটা হোল তোমারি পথ চেয়ে থাকব বসে চিরদিন–চমৎকার সুর বাবা। শুনবে? বেশ গাইতে পারি এটা–

–থাক এখন আর দরকার নেই। অন্য সময়...এখন একটু কাজ আছে।

টেঁপি মনক্ষুণ্ণ হইল। এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুশি হইত। তা নয়

বাবার সব সময় কেবল কাজ আর কাজ!

টেঁপির মা বলিল–ওগো, কাল পদ্ম বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ লোকটা। ওদের হোটেলে তুমি নাকি কাজ করতে!...

হাজারি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল–কি বললে পদ্মদিদি?

–গল্প করলে বসে, পান সেজে দিলাম, খেলে। ওদের সে হোটেল উঠে যাচ্ছে। আর চলে না, এই সব বলে।

হাজারি এখনও পদ্মকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। পদ্মদিদি–সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পদ্মদিদি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল বেড়াইতে– তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে–হাজারি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল--পদ্মঝি তাহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়া যেন তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

টেঁপি বলিল–বাবা, নরেনদাদাকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। নয়েন-দা বলেছে আমাকে মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তুমি মাংস এনে দাও—

হাজারি এদিকের সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ী যাইবার জন্য রওনা হইল, পথে হঠাৎ পদ্মঝিয়ের সঙ্গে দেখা। পদ্মঝিয়ের পরনে মলিন বস্ত্র। কখনও হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই।

হাজারি বলিল–হাতে কি পদ্মদিদি? যাচ্ছ কোথায়?

পদ্ম হাজারিকে দেখিয়া দাঁড়াইল, বলিল–ঠাকুরমশায়, কবে ফিরলে? হাতে তেঁতুল, একটু নিয়ে এলাম হোটেল থেকে।

হাজারি মনে মনে হাসিল। হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাস এখনও যায় নাই পদ্মদিদির!

হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পদ্ম বলিল–শোনো, দাঁড়াও না ঠাকুরমশায়! কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে! বলে নি বৌদিদি?

–হ্যাঁ হ্যাঁ বলচিল বটে।

–বৌদিদি লোক বড় ভাল, আমার সঙ্গে কত গল্প করলে। আর একদিন যাব।

–বা, যাবে বৈ কি পদ্মদিদি, তোমাদেরই বাড়ী। যখন ইচ্ছে হয় যাবে। হোটেল কেমন চলছে?

–তা মন্দ চলছে না। এককরম চলছে।

–বেশ বেশ। তাহলে এখন আসি পদ্মদিদি—

হাজারি চলিয়া গেল। ভাবিল–একরকম চলছে বললে অথচ কাল বাড়ীতে বসে গল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না, উঠে যাবে। পদ্মদিদি ভাঙে তো মচকায় না!

কুসুমের বাড়ীতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। কথায়-কথায় নতুন গাঁয়ের বধুটির কথা মনে পড়াতে হাজারি বলিল–ভাল কথা কুসুম মা চেনো? এঁড়োশোলার বনমালীর স্ত্রীর ভাইঝি–তোমাকে দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নতুন গাঁ?

কুসুম বলিল–খুব চিনি। ওর নাম তো সুবাসিনী। ওকে কি করে জানলেন জ্যাঠা মশায়?

হাজারি বধুটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, তাহার টাকা লইয়া আসা, হোটেলে তাহাকে অংশীদার করার সঙ্কল্প।

কুসুম বলিল–এ তো বড় খুশির কথা। আপনার হোটেলে টাকা খাটলে ওর ভবিষতে একটা হিল্লে হয়ে রইল।

–কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা? তখন কোথায় থাকবে হোটেল?

–ও কথা বলতে নেই যাঠামশায়–ছিঃ

কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে। হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসাবে দেখে না, হোটেলের অংশীদার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা দেয়, মাসিক লাভের অংশরূপ।

কুসুম বলিল–অমন সব কথা বলেন কেন, ওতে আমার কষ্ট হয়। আপনি ছিলেন তাই আজ রাণাঘাট শহরে মাথা তুলে বেড়াতে পারছি, ছেলেপিলে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। এই বাড়ী বাঁধা রেখে গিয়েছিলেন শশুর, আপনাকে বলি নি সে-কথা, এতদিন বাড়ী বিক্রি হয়ে যেতো দেনার দায়ে যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস। ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ করে ফেলেছি–এখন বাড়ী আমার নামে। আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশায়– আমার চোখে আপনি দেবতা।

হাজারি বলিল–উঠি আজ মা। একবার ইষ্টিশানের হোটেলটাতে যাব। একদল বড় লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে, দার্জিলিং মেলের সময় এখানে খানা পাবে। তাদের জন্যে মাংসটা নিজে রাঁধবো। তারে তাই লেখা আছে।

দার্জিলিং মেলে চার-পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারির রেলওয়ে হোটেলে খাইতে আসিল। হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল। উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া গেল–হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল–হাজারিবাবু, আপনার নাম কলকাতায় পৌঁচেছে জানেন তো? বড়ঘরে যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে, তারা জানে রাণাঘাটের হিন্দু-হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাঁধুনী। আমাদের সেইটে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আজ আপনার এখানে আসা। তারে বলাও ছিল যাতে আপনি নিজে রাঁধেন। বড় খুশি হয়েছি

খেয়ে।

.

ইহার কয়েক দিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলিকাতা হইতে। সেদিন যাহারা রেলওয়ে হোটেলে খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ওবেলা, বিশেষ জরুরী দরকার আছে। সাড়ে তিনটার কৃষ্ণনগর লোকালে দুইজন ভদ্রলোক নামিল। তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি –যে হাজারির রান্নার অত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিল। অন্য একজন বাঙালী নয়–কি জাত, হাজারি চিনিতে পারিল না।

পূর্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবাঙালী ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়া হিন্দীতে বলিল–এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এই সে হাজারি ঠাকুর।

অবাঙালী ভদ্রলোকটি হাসিমুখে হিন্দীতে কি বলিলেন, হাজারি ভাল বুঝিল না। বিনীত ভাবে বাঙালী বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দী বুঝিতে পারে না।

বাঙালী বাবুটি বলিলেন–শুনুন হাজারিবাবু, কথাটা বলি। আমার বন্ধু ইনি গুজরাটি। বড় ব্যবসাদা, ধুরন্ধর খাড্ডে কোম্পানীর বড় অংশীদার। জি. আই. পি. রেলের সব হিন্দু রেস্টোরান্টের কন্ট্রাক্ট হোল খাড্ডে কোম্পানি। ওরা আপনাকে বলতে এসেছে ওদের সব হোটেলের রান্না দেখাশুনা তদারক করবার জন্যে দেড়শো টাকা মাইনেতে আপনাকে রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেন্ট। আপনার

সব খরচ, রেলের যে কোনো জায়গায় যাওয়া-আসা, একজন চাকর ওরা দেবে। বম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে আপনাকে একটা অংশও ওরা দেবে। আপনি রাজী?

হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে। মন্দ কি? কাজকর্ম এদিকে যাহা রহিল নরেন দেখাশুনা করিতে পারে। খরচ বাদে মাসে তিনি দেড় শত টাকা কম নয়–তা ছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি। এ হাতছাড়া করা উচিত হয় না–নরেনের ইহাই মত।

হাজারি আসিয়া বলিল–আমি রাজী আছি। কবে যেতে হবে বলুন। কি একটা কথা আছে-হিন্দী তো আমি তত জানিনে! কাজ চালাব কি করে?

বাঙালী বাবু বলিলেন–সেজন্যে ভাবনা নেই। দুদিন থাকলেই হিন্দী শিখে নেবেন। সই করুন এ কাগজে। এই আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্ম, এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। দুজন সাক্ষী ডাকুন।

যদু বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া আনা হইল তাহার হোটেল হইতে, অন্য সাক্ষী নরেন। কাগজ পরে হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহারা চা-পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল। বাঙালী ভদ্রলোক বলিয়া গেল–মে মাসের পয়লা জয়েন করতে হবে আপনাকে বম্বেতে। আপনার ইন্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বম্বে পৌঁছে দেবে। তৈরী থাকবেন–আর পনেরো দিন বাকী।

.

হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল। এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে। বোম্বাই! সে বোম্বাই যাইতেছে। দেড়শো টাকা মাহিনায়! বিশ্বাস হয় না। সব যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল। টাকার জন্য নয়। টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশী ছাড়া কম রোজগার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব? পাঁচটা দেশ দেখিয়া বেড়ানো, পাঁচজনের কাছে মান-খাতির পাওয়া, নূতনতর জীবনযাত্রার আস্বাদ–এ সবই তো আসল।

পিছন হইতে যদু বাঁড়ুয্যে ডাকিল–ও হাজারি-ভায়া, হাজারি-ভায়া শোন, হাজারি-ভায়া–

হাজারি কাছে যাইতেই যদু বাঁড়ুয্যে–রাণাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে–সেই যদু বাঁড়ুয্যে স্বয়ং নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলো লইতে গেল। বলিল–ধন্যি, খুব দেখালে ভায়া, হোটেল করে তোমার মত ভাগ্যি কারো ফেরে নি। পায়ের ধূলো দাও, তুমি সাধারণ লোক নও দেখছি–

হাজারি হা-হা করিয়া উঠিল।

–কি করেন বাঁড়ুয্যেমশায়–আমার দাদার সমান আপনি—ওকি—ওকি-আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে, আপনাদের আশীর্বাদে–একরকম করে খাচ্ছি–

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—এসো না ভায়া গরীবের হোটেলে একবার এক ছিলি তামাক খেয়ে যাও–এসো।

যদু বাঁড়ুয্যের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না। যদু চা খাওয়াইল, ছানার জিলাপি খাওয়াইল, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল। স্বপ্ন না সত্য? এই যদু বাঁড়ুয্যে একদিন নিজের হোটেলে কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল! তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও!

না, যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে। ইহার বেশী আর সে কিছু চায় না। রাধাবল্লভ ঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন। আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন।

.

কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল–জ্যাঠামশায় কি ভাবেন, এই বয়সে তাঁহাকে সে অত দূরে যাইতে কখনই দিবে না। জেঠিমাকে দিয়াও বারণ করাইবে। আর টাকার দরকার নাই। সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের?

হাৰি বলিল–মা বেশীদিন থাকব না সেখানে। চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে। না গেলে ওরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করতে পারে। আর একটা উদ্দেশ্য আছে কি জান মা, বড় বড় হোটেল কি করে চালায়, একবার নিজের

চোখে দেখে আসি। আমার তো ঐ বাতিক, ব্যবসাতে যখন নেমেছি, তখন এর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব। বাধা দিও না মা, তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সাধ্যি নেই আমার।

টেঁপির মা ও টেঁপি কান্নাকাটি করিতে লাগিল। ইহাদের দুজনকে বুঝাইল নরেন। মামাবাবু কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছেন? অত কান্নাকাটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে। বম্বে তো বাড়ীর কাছে, লোকে কত দূর-দূরান্ত যাইতেছে না চাকুরির জন্য?

সেই দিন রাত্রে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল–একটা কথা আছে। আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যে বোম্বাই যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাবার আগে টেঁপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব। নরেন এখানকার কারবার দেখাশুনা করবে–রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে–ওটাতেই মোটা লাভ। এতে তোমার কি মত?

বংশীধর অনেকদিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল হাজারিদা, আমি কি বলব, বল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেলে কাজ করেছি। আমরা সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হয়ে কাটিয়েছি বহুকাল। নরেনও তোমারই আপনার ছেলে। যা বলবে তুমি, তাতে আমার অমত কি? আর ওরও তো কেউ নেই–সবই জান তুমি। যা ভাল বোঝ কর।

দেনাপাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল। হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির স্বত্ব টেঁপির নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া

উভয় হোটেল চালাইবে–তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাবমত কুসুমকে ও টেঁপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে থাকিবে।

বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

টেঁপির মা বলিল–ওগো, তোমার মেয়ে বলছে অতসীকে নেমন্তন্ন করে পাঠাতে। ওর বড় বন্ধু ছিল–তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখ না?

হাজারিও সে-কথা ভাবিয়াছে। অতসীর সঙ্গে আজ বহুদিন দেখা হয় নাই। সেই মেয়েটির অযাচিত করুণা আজ তাহাকে ও তার পরিবারবর্গকে লোকের চোখে সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অতসীর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা হাজারি জানিত না, কেবলমাত্র এইটুকু জানিত অতসীর শ্বশুর বর্ধমান জেলার মূলঘরের জমিদার। হাজারি চিঠিখানা তাহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল, কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পুনরায় পত্র লিখিবার সময় নাই।

.

বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে হাজারি শ্রীমন্ত কাঁসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতে গিয়াছে, শ্রীমন্ত বলিল–আসুন আসুন হাজারিবাবু, বসুন। ওরে বাবুকে তামাক দে রে–

হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলি পুরনো বাসনপত্র, পিতলের বালতি ইত্যাদি নূতন বাসনের দোকানে দেখিয়া বলিল–এগুলো কি হে শ্রীমন্ত? এগুলো তো পুরোনো মাল–ঢালাই করবে নাকি?

শ্রীমন্ত বলিল–ও-কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম বাবু। ও আপনাদের পুরোনো হোটেলের পদ্মঝি রেখে গেছে–হয় বন্ধক নয় বিক্রী। আপনি জানেন না কিছু? চক্কত্তি মশায়ের হোটেল যে সীল হবে আজই। মহাজন ও বাড়ীওয়ালার দেনা একরাশ, তারা নালিশ করেছিল। তা বাবু পুরোনো মালগুলো নিন না কেন? আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে–বড় ডেকচি, পেতলের বালতি, বড় গামলা। সস্তা দরে বিক্রী হবে–ও বন্ধকী মালের হ্যাংনামা কে পোয়াবে বাবু, তার চেয়ে বিক্রীই করে দেবো–

হাজারি এত কথা জানিত না। বলিল–পদ্ম নিজে এসেছিল?

শ্রীমন্ত বলিল–হ্যাঁ, ওদের হোটেলের একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে। হোটেল সীল হলে কাল একটা জিনিসও বার করা যাবে না ঘর থেকে, তাই রেখে গেল আমার এখানে। বলে গেল এগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতেই হবে; চক্কত্তি মশায়ের একেবারে নাকি অচল।

বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ মিটাইয়া হোটেলে ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একবার বেচু চক্কত্তির হোটেলে যাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

কুসুম এ কয়দিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানারকম বড়, ছোট, খুচরা কাজে সারাদিন লাগিয়া থাকে। হাজারি তাহাকে বাড়ী যাইতে দেয় না, বলে–মা, তুমি তো আমার ঘরের লোক, তুমি থাকলে আমার কত ভরসা। এখানেই থাক এ কটা দিন।

বিবাহের পূর্বদিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল। সে কৃষ্ণনগর লোকালে আসিতেছে, স্টেশনে যেন লোক থাকে।

আর কেহ অতসীকে চেনে না, কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়া আনিবে, হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল।

ইন্টার ক্লাস কামরা হইতে অতসী আর তাহার সঙ্গে একটি যুবক নামিল। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্তে মুছিয়া লেপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুর সন্মুখে।

অতসীর বিধবা বেশ।

অতসী হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল–কাকাবাবু, ভাল আছেন? ইনি কাকাবাবু–সুরেন। এ আমার ভাসুরপো। কলকাতায় পড়ে। অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

–না—মা–ইয়ে, চলো–এস।

–ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি। দিয়েছিলাম একরকম বিদেয় করে আবার এসে পড়েছে সাত বোঝা নিয়ে–এই না? বাবা-কাকারা এমন নিষ্ঠুর বটে!

হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এক প্ল্যাটফর্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যে তাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। মনের কোন স্থান যেন হঠাৎ বেদনায় টন টন করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতসীই তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল। রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরেন উহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে হাজারির দিকে চাহিয়া দেখিল হাজারি চোখ রাঙা, কেমন এক ভাব মুখে! অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়াও সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কারণ টেঁপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিল ইতিমধ্যে–সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল। অতসীদি বিধবা হইয়াছে এ কথা তো কেহ বলে নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়া অতসী টেঁপিকে লইয়া বাড়ীর ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল। দুজনে বহুকাল পরে দেখা–সেই এঁড়োশোলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি, কত কথা যে জমা হইয়া আছে।

টেঁপি চোখের জল ফেলিল বাল্যসখীর এ অবস্থা দেখিয়া। অতসী বলিল–তোরা

যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি, তা হলে কিন্তু চলে যাব ঠিক বলচি। এলাম বাপ-মায়ের কাছে বোনের কাছে একটু জুড়ুতে, না কেবল কান্না আর কেবল কান্না–সরে আয়, তোর এই দুল জোড়াটা পর তো দেখি কেমন হয়েছে–আর এই ব্রেসলেটটা, দেখি হাত–

টেঁপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল–এ তোমার ব্রেসলেট অতসী-দি, এ আমায় দিতে পারবে না–ককখনো না–

–তা হলে আমি মাথা কুটবো এই ছাদে, যদি না পরিস–সত্যি বলচি। আমার সাধ কেন মেটাতে দিবি নে?

টেঁপি আর প্রতিবাদ করি না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, ওদিকে অতসী তাহার ডান হাত ধরিয়া তখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেসলেট পরাইতেছে।

হাজারি অনেক রাত্রে তামাক খাইতেছে, অতসী আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—কাকাবাবু!

হাজারি চমকিয়া উঠিয়া বলিল–অতসী মা? এখনও শোও নি?

–না কাকাবাবু। আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয় নি, তাই এলাম।

হাজারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল–এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা। আমি কিছুই শুনি নি। কতদিন গাঁয়ে যাই নি তো! তোমার এ বেশ চোখে দেখতে কি নিয়ে এলাম মা তোমায়?

অতশী চুপ করিয়া রহিল। হাজারির স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের সান্নিধ্যের নিবিড়তায় সে যেন তাহার দুঃখের সান্ত্বনা পাইতে চায়।

হাজারি সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। পরে অতসী বলিল–কাকাবাবু, আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজেই উন্নতি হবে–মনে আছে?

–সব মনে আছে অতসী মা। তুলি নি কিছুই। আর না কিন্তু এখানকার ইষ্টাটপত্র–সব তো তোমার দয়াতেই মা–তুমি দয়া না করলে–

অতসী তিরস্কারের সুরে বলিল–ওকথা বলবেন না কাকাবাবু ছিঃ–আমি টাকা দিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টাকা বাড়তো? তিন বছরের মধ্যে এত বড় জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনাড়ি লোক? আমি কিছুই জানতুম না কাকাবাবু, এখানে এসে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ক্ষমতাবান পুরুষমানুষ কাকাবাবু।

–এখন তুমি এঁড়োশোলায় যাবে মা, না আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে?

–এঁড়োশোলাতেই যাবো। বাবা-মা দুঃখে সারা হয়ে আছেন। তাদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকব। জানেন কাকাবাবু, আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব, যাতে সাধারণের উপকার হয়। বাবার টাকা সব এখন আমিই পাব, শ্বশুরবাড়ী থেকেও টাকা পাব। কিন্তু এ টাকার আমার কোন দরকার নেই কাকাবাবু। পাঁচজনের উপকারের জন্যে খরচ করেই সুখ।

–যা ভাল বোঝ মা কয়ে। আমি তোমায় কি বলব?

–কাকাবাবু, আপনি বম্বে যাচ্ছেন নাকি?

–হ্যাঁ মা।

অতসী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল–আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? বেশ বাপেঝিয়ে থাকবো, আপনাকে রেঁধে দেব–আমার খুব ভালো লাগে দেশ বেড়াতে।

–যেও মা, এবারটা নয়। আমি তিন বছর থাকব সেখানে। দেখি কি রকম সুবিধে অসুবিধে হয়। এর পরে যেও।

–ঠিক কাকাবাবু? কেমন মনে থাকবে তো?

–ঠিক মনে থাকবে। যাও এখন শোও গিয়ে মা, অনেক কষ্ট হয়েছে গাড়িতে,

সকাল সকাল বিশ্রাম কর গিয়ে।

.

পরদিন বিবাহ। টেঁপির নরম হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ হাতে স্থাপন করিবার সময় হাজারির চোখে জল আসিল।

কতদিনের সাধ–এতদিনে ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিলেন।

বংশীধর ঠাকুর বরকর্তা সাজিয়া বিবাহ-মজলিসে বসিয়া ছিল। সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল–হাজারি-দা!

কাছাকাছি সব হোটেলের রাঁধুনী বামুনেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া যাত্রী সাজিয়া আসিয়াছে। এ বিবাহ হোটেলের জগতের, ভিন্ন জগতের কোনো লোকের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাতে। ইহাদের উচ্চ কলরব, হাসি, ঠাট্টা ও হাঁকডাকে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কনে বিদায় হইয়া গেল। বেশীদূর উহারা যাইবে না। এই রাণাঘাটেই চূর্ণীর ধারে বংশীধর একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়াছে পাঁচ দিনের জন্য। সেখানে দেশ হইতে বংশীধরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি (বংশীধরের স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন) আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে। বৌভাত সেখানেই হইবে।

.

হাজারি একবার রেলওয়ে হোটেলে কাজ দেখিতে যাইতেছে, বেলা আন্দাজ দশটা, বেচু চক্কত্তির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল। কোর্টের পিওন, বেলিফ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পালচৌধুৰী জমাদার। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্কত্তির হোটেল শীল হইতেছে।

হাজারি কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুরোনো মনিবের হোটেল, এইখানে সে দীর্ঘ সাত বৎসর সুখে-দুঃখে কাটাইয়াছে। এত দিনের হোটেলটা আজ উঠিয়া গেল! একটু পরে পদ্মঝি দু হাতে দুটি বড় বালতি লইয়া হোটেলের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিল। বেলিফ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল–এই দেখুন মশায়, ওই মেয়েলোকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, এটা বে-আইনী। আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে।

পেয়াদারা গিয়া বাধা দিয়া বলিল–বালতি রেখে যাও—

পরে আরও কাছে গিয়া হাঁক দিয়া বলিল–শুধু বালতি নয় বাবু, বালতির মধ্যে পেতল কাঁসার বাসন রয়েছে।

পদ্মঝি ততক্ষণে বালতি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল–

এ বাসন আমার নিজের–হোটেল চক্কত্তি মশায়ের, আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পেয়াদারা ছাড়িবার পাত্র নয়। অবশ্য পদ্মঝিও নয়। উভয় পক্ষে বাকবিতণ্ডা, অবশেষে টানাহেঁচড়া হইবার উপক্রম হইল। মজা দেখিবার লোক জুটিয়া গেল বিস্তর।

একজন মহাজন পাওনাদার বলিল–আমি এই সকলের সামনে বলচি, বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতের আইন অমান্য করবার জন্যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

একজন সাক্ষী বলিল –তা দেবেন কেমন করে বাপু? ওর নামে তো ডিক্রি নেই আদালতের। ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন?

বেলিফ বলিল–তা নয়, ওকে চুরির চার্জে ফেলে পুলিশে দেওয়া চলবে। এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের। তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবার রাইট কি? ওকে জিজ্ঞেস করো ও ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা–

পদ্মঝি তা দিতে রাজী নয়। সে আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছে বাতি দুটি। বেলিফ বলিল–কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে–বদমাইশ মাগী কোথাকার–ভাল কথায় কেউ নয়।

পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল। পুনরায় একচোট ধস্তাধস্তির সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল–পদ্মদিদি, বাসন ওদের দিয়ে দাও।

লজ্জায় ও অপমানে পদ্মঝিয়ের চোখে তখন জল আসিয়াছে। জনতার সামনে দাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই। এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

–এই দেখোনা ঠাকুর মশায়, তুমি তো কতদিন আমাদের হোটেলে ছিলে–এ আমার জিনিস না? বলো না তুমি, এ বালতি কার?

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল–কেঁদো না এমন করে পদ্মদিদি। এ হোল আইন-আদালতের ব্যাপার। বাসন রেখে এসো ঘরের মধ্যে, আমি দেখছি তারপর কি ব্যবস্থা করা যায়–

অবশ্য তখন কিন্তু করিবার উপায় ছিল না। সে আদালতের বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিল–কি করলে এদের হোটেল আবার বজায় থাকে?

–টাকা চুকিয়ে দিলে। এ অতি সোজা কথা মশাই। সাড়ে সাতশো টাকার দাবীতে নালিশ–এখনও ডিক্রী হয় নি। বিচারের আগে সম্পত্তি সীল না করলে দেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে, তাই সীল করা।

আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বেচু চক্কত্তিকে একবারে ডাকিয়া হাজারি বলিল–আমার সঙ্গে চলুন না কর্তা মশায় একবার ইষ্টিশনের দিকে–আসুন, কথা আছে।

রেলের হোটেলে নিজের ঘরটিতে বেচু চক্কত্তিকে বসাইয়া হাজারি বলিল–কর্তা একটু চা খাবেন?

বেচু চক্কত্তির মন খারাপ খুবই। চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই, হাজারি কিছুতেই ছাড়িল না। চা পান ও জলযোগান্তে বেচু বলিল–হাজারি, তুমি তো সাত-আট বছর আমার সঙ্গে ছিলে, জানো তো সবই, হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ। আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি –এখন কোথায় যাই আর কি করি। পৈতৃক জোতজমা ঘরদোর যা ছিল ফুলে-নবলায়, সে এখন আর কিছু নেই, ওই হোটেলই ছিল বাড়ী। এমন কষ্ট হয়েছে, এই বুড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায়? চালাই কী করে?

–এমন অবস্থা হোল কি করে কর্তা? দেনা বাধালেন কী করে?

–খরচে আয়ে এদানীং কুলোতো না হাজারি। দু-বার বাসন চুরি হয়ে গেল। ছোট হোটেল, আর কত ধাক্কা সইবার জান ছিল ওর! কাবু হয়ে পড়লো। খদ্দের কমে গেল। বাড়ীভাড়া জমতে লাগলো–এসব নানা উৎপাত–

হাজারি বেচু চক্কত্তিকে তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল–কর্তা, একটা কথা আছে বলি।

আপনি আমার পুরনো মনিব, আমার যদি টাকা এখন থাকতো, আপনার হোটেলের সীল আমি খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন অত টাকা আমার হাতে নেই। তাই বলচি, যতদিন বম্বে থেকে না ফিরি, আপনি আমার বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান। পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেবো। (হাজারি মাহিনার কথাটা মনিবকে বলিতে পারিল না।) খাবেন দাবেন হোটেলে, আর পদ্মাদিদিও ওখানে থাকবে, মাইনে পাবে, খাবে। কি বলেন আপনি?

বেচু চক্কত্তির পক্ষে ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেলবাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে। পদ্মঝিও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না, কারণ জীবনে কোনোদিন পদ্মঝি কুসুমের দোর মাড়ায় নাই।

–এসো পদ্মপিসি বসো। আমার কি ভাগ্যি। এই পিঁড়িখানতে বোসো পিসি। পান-দোক্তা খাও? বসো পিসি, সেজে পানি–

পদ্মঝি বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ-গল্প ও-গল্প করিল। পদ্ম বুঝিতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তবে চাকুরি বজায় রাখা। যদিও সে মনে মনে জানে, চাকুরি বেশী দিন তাহাকে করিতে হইবে না। আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে, তবে বিপদের দিনগুলিতে একটা কোনো আশ্রয়ে কিছুদিন মাথা গুঁজিয়া থাকা।

পরদিন পদ্মঝি হোটেলের কাজে ভর্তি হইল। বেচু চক্কত্তিও বসিল গদির ঘরে। ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভাল করিয়াই বুঝিত। তবে কথা এই যে, ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে। বেচু চক্কত্তি দেখাশোনা করিয়াই খালাস।

হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরোনো দিনের হোটেলে আবার কাজ করিতেছে, বেচু চক্কত্তি তাহার মনিব, পদ্মঝিও ছোট মনিব।

পদ্ম যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করিল--ঠাকুর মশায়, ইলিশ মাছ আনাব এবেলা না পোনা?–তখন হাজারি পূর্ব অভ্যাসমতই সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিল, যা ভাল মনে করো পদ্মদিদি। পচা না হোলে ইলিশই এনো।

বেচু চক্কতি পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশী। সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল–হাজারি, একটা কথা বলি, তোমার এখানে ফাস্ট আর সেকেন কেলাসের মধ্যে মোট চার পয়সার তফাৎ রেখেচ, এটা ভাল মনে হয় না আমার কাছে। এতে করে সেকেন কেলাসে খদ্দের কম হচ্ছে, বেশী লোক ফাস্ট কেলাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না। গত এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কিনা! নরেন বাবাজী ছেলেমানুষ, সে হিসেবের কি বোঝে?

হাজারি কথাটার সত্যতা বুঝিল। বলিল–আপনি কি বলেন কর্তা?

–আমার মত হচ্ছে এই যে ফাস্ট কেলাস হয় একদম উঠিয়ে দাও, নয়তো আমার হোটেলের মত অন্ততঃ দুআনা তফাৎ রাখো। শীতকালে যখন সব সস্তা, তখন এ থেকে যা লাভ হবে, বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফাস্ট কেলাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই লাভের খানিকটা খেয়ে গিয়েও যাতে কিছু থাকে, তা করতে হবে। বুঝলে না?

–তাই করুন কর্তা। আপনি যা বোঝেন, আমি কি আর তত বুঝি?

বেচু চক্কত্তি খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে। ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই হাজারির নম্র কথাবার্তা–যেন তিনিই মনিব, হাজারি তার চাকর। যদিও পদ্মঝি ও তিনি দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে, সবই কপালের গুণে, আসলে তাহার বুজিসুদ্ধি কিছুই নাই, তবুও দুজনেই এখন মনে ভাবে, বুদ্ধি যত খাক আর না-ই থাক–বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না–লোক হিসাবে হাজারি কিন্তু খুবই ভাল।

.

সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়টা সকলের অগোচরে সে একবার গাঁজা খাইয়া থাকে, হোটেলে গিয়া আজকাল সে-সুবিধা ঘটে না। এমন সময় অতসীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাঁজার কলিকা ও সাজসরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল।

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল–কি মা?

–কাকাবাবু, আপনি কবে বম্বে যাচ্ছেন?

–আসছে মঙ্গলবার যাব, আর চার দিন বাকি।

–আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এঁড়োশোলা যাব, আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জলখাবার এনে দেবো–যাবেন কাকাবাবু?

হাবির চোখে জল আসিল। কি তুচ্ছ সাধ! মেয়েদের মনে এই সব অতি সামান্য আশা-আকাঙ্খাই কি সব সময়ে পূর্ণ হয়? কি করিয়া সে এঁড়োশোলা যাইবে এখন? ছেলে-মানুষ, না হয় বলিয়া খালাস!

মুখে বলিল–মা, সে হয় না। কত কাজ বাকি এদিকে, সে-তো মা জান না। নরেন ছেলেমানুষ, ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিয়ে–

–আজ চলুন আমায় নিয়ে। গরুর গাড়ীতে আমরা বাপে-মেয়েতে চলে যাই–কাল বিকেলে চলে আসবেন। তা ছাড়া টেঁপিও বলছিল একবার গাঁয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে। চলুন কাকাবাবু, চলুন–

–তা নিতান্ত যদি না ছাড় মা, তবে পরশু সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পরে ফিরতে হবে। থাকবার একদম উপায় নেই–কারণ তার পরদিনই বিকেলে রওনা

হতে হবে আমায়। বোম্বাইয়ের ডাকগাড়ী রাত আটটায় ছাড়ে বলে দিয়েছে।

.

বৈকালে চূর্ণীর ধারের নিমগাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল। পাশের চুন-কয়লার আড়তে হিন্দুস্থানী কুলিরা সেই ভাবে সুর করিয়া সমস্বরে ঠেঁট হিন্দীতে গজল গাহিতেছে, চূর্ণীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে-নবলার হাটের হাটুরে লোক পারাপার হইতেছে– পুরোনো দিনের মতই সব।

সে কি আজও বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজ করিতেছে? পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া খাইয়া তাহাকে কি এখনি সদ্য আঁচ বসানো কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া ও-বেলার রান্নার ফর্দ বুঝিয়া লইতে হইবে?

সেই পদ্মদিদি ও সেই বেচু চক্কত্তির সঙ্গে সকালবেলাও তো কথাবার্তা হইয়াছিল। দাঁড়িপাল্লায় পাল্লা বদল হইয়াছে, পুরোনো দিনের সম্বন্ধগুলি ছায়াবাজির মত অন্তর্হিত হইল কোথায়? বোম্বাই...বোম্বাই কত দূরে কে জানে? টেঁপিকে লইয়া, অতসী বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত! ইহারা যে-কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলাত পর্য্যত যাইতে পারে– দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় বিনা আশঙ্কায় বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতে পারে।

তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকার মত দিন তাহার জীবনে আসিবে? নরেনকে যেদিন প্রথম দেখে সেইদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর

ছবিটি--টেঁপি লাল চেলি পরিয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দের হাসি–তখন মনে হইয়াছিল এসব দুরাশা, এও কি কখনও হয়?

সবই ঠাকুর রাধাবল্লভের দয়া। নতুবা সে আবার কবে ভাবিয়াছিল যে সে বোম্বাই যাইবে দেড়-শ টাকা মাহিনার চাকুরি লইয়া?

পরদিন অতসী আসিয়া আবার বলিল–কবে এঁড়োশোলা যাবেন কাকাবাবু? টেঁপিও যাবে বলছে, কাকীমাও বলছিলেন গাঁয়ে থেকে সেই অজি দু-বছর আড়াই বছর এসেছেন আর কখনও যান নি। ওঁরও যাবার ইচ্ছে। একদিনের জন্যেও চলুন না?

.

আবার স্বগ্রামে আসিয়া উহাদের গাড়ী ঢুকিল বহুদিন পরে। হাজারিদের বাড়ীটা বাসযোগ্য নাই, খড়ের ঘর এত দিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে–ঝড়ে খড় উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিব্যি চোখে পড়ে।

অতসী টানাটানি করিতে লাগিল তাদের বাড়ীতে সবসুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু টেঁপির মা রাজী নয়, নিজের ঘরদোরের উপর মেয়েমানুষের চিরকাল টান–ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেঁপির সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেজে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল। টেঁপিকে বলিল–তুই বস মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেয়ারাতলার ঘাটে

কতদিন নাই নি।

পুকুরের ঘাটে গিয়ে এ-পাড়ার রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধুর সঙ্গে প্রথমেই দেখা। সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেঁপির মায়ের সমান, দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল। টেঁপির মাকে দেখিয়া সে তো একেবারে অবাক–বাসন মাজা ফেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিল–ওমা, দিদি যে! কখন এলে দিদি? আর কি আমাদের কথা মনে থাকবে তোমার? এখন বড়লোক হয়ে গিয়েচ সবাই বলে। গরীবদের কথা কি মনে পড়ে?

দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধুকে সঙ্গে লইয়া টেঁপির মা ঘাট হইতে ফিরিল। মেয়েটি বাড়ী ঢুকিয়া টেঁপিকে বলিল–চিনতে পারিস মা?

–ওমা, কাকীমা যে, আসুন আসুন–

-এস মা, জন্ম-এইস্ত্রী হও, সাবিত্রীর সমান হও। হ্যাঁ গা তা তোমার কেমন আক্কেল? মেয়েকে আনলে, অমনি জামাইকেও আনতে হয় না? শুনেছি চাঁদের মত জামাই হয়েছে। এ চুড়ি কে দিয়েছে–দেখি মা। ক ভরি! একে কি বলে? পাশা? দেখি দেখি–কখনও শুনিও নি এসব নাম। তা একটা কথা বলি। তোমাদের রান্না এ-বেলা এখানে হওয়ায় উপায়ও নেই–আমাদের বাড়ীতে তোমরা সবাই এ-বেলা দুটো ডালভাত–

টেঁপি বলিল–সে হবে না কাকীমা। অতসী-দি এসেছে আমাদের সঙ্গে জানেন না? অতসীদি সবাইকে বলেছে খেতে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলছিল আমাদের–মা গেল না, জানেন তো মার সাত প্রাণ বাঁধা এই ভিটের সঙ্গে–রাণাঘাটের অমন বাড়ী, কলের জল–শহর জায়গা, সেখানে থাকতেও মা শুধু বাড়ী-বাড়ী করে–আহা বাড়ীর কি ছিরি! ফুটো খড়ের চাল, বাড়ী বললেও হয়, গোয়াল বললেও হয়–

–বাপের বাড়ীর নিন্দে করিস নে, যা যা–আজ না হয় বড়লোক শ্বশুর হয়েছে, এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মানুষ হয়েছ মা–

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই কখন কাটিয়া গেল। ইহাদের আসিবার খবর পাইয়া এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েমহলের সবাই দেখা করিতে আসিল। জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল।

টেঁপির মা বলিল–জামাইয়ের আসবার যো নেই যে! রেলের হোটেলের দেখাশুনো করেন, সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে। উপায় থাকলে আনি নে মা?

অতসীর দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্বে জানিত। গ্রামসুদ্ধ লোক তাহার অন্ত দুঃখিত। সবাই একবাক্যে বলে, অমন মেয়ে–দেবীর মত মেয়ে। আর তাই কপালে এই দুঃখ, এই কচি বয়সে।

সন্ধ্যার দেরি নাই। অতসীদের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারি

কথাবার্তা বলিতেছিল। হরিচরণবাবু কন্যার অকাল-বৈধব্যে বড় বেশী আঘাত পাইয়াছেন। হাজারির মনে হইল যেন এই আড়াই বৎসরের ব্যবধানে তাঁর দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েকে দেখিয়া আজ তবুও একটু সুস্থ হইয়াছেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন–এই দেখ তোমার বয়সে আর আমার বয়সে–খুব বেশী তফাৎ হবে না। তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে–না-হয় এক-আধ বছর বাকি। কিন্তু তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে, মনে তুমি এখনও যুবক। কাজ করবার শক্তি তোমার অনেক বেশী এখনও। এই বয়সে বম্বে যাচ্ছ, শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি। বাঙালীর মধ্যে তোমার মত লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত জাতটা ততই জাগবে। এরা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরী হয়–দেখছ না আমাদের গাঁয়ের দশা? ইহকালই দেখলি নে, ভোগ করলি নে, তোদের পরকালে কি হবে বাপু? সেখানেও সেই ভূতের ভয়। পরকালে নরকে যাবে। তুমি কি ভাবো অকর্মা, অলস, ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান?

এই সময় পুরানো দিনের মত অতসী আসিয়া উঁহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া বলিল–খান কাকাবাবু, চা আনি, বাবা তুমিও খাও, খেতে হবে। সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরি–

কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল। পিছনে আসিল টেঁপি। সেই পুরোনো দিনের মত সবই–তবুও কত তফাৎ! অতসীর মুখের দিকে চাহিলে হাজারির বুকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করে। তবুও তো মা বাপের সামনে

অতসী বিধবার বেশ যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াছে। মা বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতে-ফিরিতে পারিবে না। ইহাতে পাপ হইবে।

হরিচরণবাবু সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল–কেমন মা, তোমার সাধ যা ছিল, মিটেছে?

–নিশ্চয়ই কাকাবাবু। টেঁপি কি বলিস? কতদিন ভাবতুম গাঁয়ে তো যাবো, সেখানে টেঁপিও নেই, কাকাবাবুও নেই। কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলব?

–কাল আমার সঙ্গে রাণাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা।

–বাঃ, সে আমি বাবা-মাকে বলে রেখেছি। আপনাকে উঠিয়ে দিতে যাব না কি রকম? কাকাবাবু, টেঁপি এখন দিনকতক আমার কাছে এখানে থাক না? তাহলে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন।

নয়নের কথা বলাতে টেঁপি বাপের অলক্ষিতে অতসীকে এক রাম-চিমটি কাটিল।

–কাকাবাবু পুজোর সময় আসবেন তো! এবার আমাদের গাঁয়ে আমরা ঠাকুর পুজো করব।

–পুজোর তো অনেক দেরি এখন মা। যদি সম্ভব হয় আসবো বই কি। তবে তুমি যদি পুজো করো তবে আবার চেষ্টা করব।

টেঁপি বলিল–তোমাকে আসতেই হবে বাবা। মা বলেচে এবার প্রতিমা গড়িয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করবে। এখনও তিন-চার মাস দেরি পুজোর–সে-সময় ছুটি নিয়ে আসবে বাবা, কেমন তো?

রাধু মুখুয্যের পুত্রবধু নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে সকলকে খাইতে হইবেই। টেঁপির মা সন্ধ্যাবেলা হইতেই রাধু মূখুয্যের বাড়ী গিয়া কুটিয়াছে, মোচা কুটিয়া, দেশ কুমড়ো কুটিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। সে সরল গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের এ জীবন তাহার অনেক ভাল লাগে। সে বলিতেছিল–ভাই, শহরে-টহরে কি আমাদের পোষায়? এই যে কুমড়োর ডাঁটাটুকু, এই এক পয়সা। এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা। সে ফালি কাটতে বোধ হয় পোড়ারমুখো মিন্সেদের হাত কেটে গিয়েছে। আমার ইচ্ছে কি জান ভাই, উনি চলে গেলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে আবার গাঁয়ে আসব, পুজো পর্যন্ত এখানেই থাকব। মেয়ে-জামাই থাকল রাণাঘাটের বাসায়, ওই সব দেখানো করুক, ওদেরই জিনিস। আমার সেখানে ভাল লাগে না।

স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল–তোমার ইচ্ছে যা হয় করো–কিন্তু তার আগে ঘরখানা তো সারানো দরকার। ঘরে জল পড়ে ভেসে যায়, থাকবে কিসে?

টেঁপির মা বলিল–সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। আমি অতসীদের বাড়ী থেকে

কি ওই মুখুয্যের বাড়ী থেকে ঘর সারিয়ে নেব। জামাইকে বলে যেও খরচ যা লাগে যেন দেয়।

.

রাধু মুখুয্যের বাড়ী রাত্রে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট–খিচুড়ি, ভাজাভুজি, মাছ, ডিমের ডালনা, বড়াভাজা, টক, দই, আম, সন্দেশ। অতসীকেও খাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই। টেঁপি ডাকিতে গেলে কিন্তু অতসী বলিল, তাহার মাথা ভয়ানক ধরিয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

শেষরাত্রে দুখানা গাড়ী করিয়া সকলে আবার রাণাঘাট আসিল। দুপুরের পর হাজারি একটু ঘুমাইয়া লইল। ট্রেন নাকি সারারাত চলিবে, কখনও সে অতদূর যায় নাই, অতক্ষণ গাড়ীতেও থাকে নাই। ঘুম হইবে না কখনই। যাইবার সময়ে টেঁপির মা ও টেঁপি কাঁদিতে লাগিল। কুসুমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অতসী সকলকে বুঝাইতে লাগিলছি—ছিঃ, কাঁদে না, ওকি কাকীমা? বিদেশে যাছেন একটা মঙ্গলের কাজ, ছিঃ টেঁপি, অমন চোখের জল ফেলো না ভাই।

হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে, সামনেই পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিল–এখন এই গাড়ীতে যাবেন ঠাকুর মশায়?

–হ্যাঁ, পদ্মদিদি এবেলা খদ্দের কত?

–তা চল্লিশ জনের ওপর। সেকেন কেলাস বেশী।

–ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো?

পদ্মঝি হাসিয়া বলিল–ওমা, তা আর বলতে হবে? যতদিন বাজারে পাই, ততদিন ইলিশের বন্দোবস্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন–দেখেছিলাম তো ও হোটেলে!

–হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো? তুমি হোলে গিয়ে পুরোনো লোক। বেশ হুঁশিয়ার থেকো পদ্মদিদি। ভেবো তোমায় নিজেরই হোটেল।

পদ্মঝি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝুঁকিয়া নীচু হইয়া বলিল–দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধূলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাক, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। এ কি হইয়া গেল! পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইতেছে! এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবার দুঃসাহসও কখনো তাহার হয় নাই। কোন সৌভাগ্যটা বাকী রহিল তাহার জীবনে?

স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্মচারীরা প্রায় সকলে–তা ছাড়া অতসী, টেঁপি, নরেন। বাহিরের লোকের মধ্যে যদু বাঁড়ুয্যে। যদু বাঁড়ুয্যে সত্যই

আজকাল হাজারিকে যথেষ্ট মানিয়া চলে। তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি এখনও অনেক বেশী উন্নতি দেখাইবে, এই তো সবে শুরু।

অতসী পায়ের ধূলা লইয়া বলিল–আসবেন কিন্তু পুজোর সময় কাকাবাবু, মেয়ের বাড়ীর নেমন্তন্ন রইল। ঠিক আসবেন–

টেঁপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল–খাবারের পুঁটুলিটা ওপরের তাক থেকে নামিয়ে কাছে রাখো বাবা, নামাতে ভুলে যাবে, তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু। আর রাত্তিরেই খেও, ভুলো না যেন। কাল বাসি হয়ে যাবে, পথেঘাটে বাসি খাবার খবরদার খাবে না। মনে থাকবে? তোমার চিঠি পেলে মা বলেচে রাধাবল্লভতলায় পুজো দেবে।

চলন্ত ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতেছিল পদ্মদিদি যে আজ তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি!

ঠাকুর রাধাবল্লভ, জাগ্রত দেবতা তুমি, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। তুমিই আছ। আর কেহ নাই। থাকিলেও জানি না।

সমাপ্ত